মুকুল

[অষ্টাদশ খণ্ড]

বালকবালিকাদিগের জন্য

সচিত্র মাসিক পত্র।

কলিকাতা,

রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৯।

মূল্য দেড় টাকা।

সূচী পত্র।

মুকুল

[অষ্টাদশ খণ্ড]

বালকবালিকাদিগের জন্য

সচিত্র মাসিক পত্র।

কলিকাতা,

রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৯।

মূল্য দেড় টাকা।

সূচী পত্র।

উয়ান সি কাই

১৮শ ভাগ] বৈশাখ, ১৩১৯। | ১ম সংখ্যা

নব বর্ষ।

সাজিয়া মুকুলে ফুলে কোকিল কাকলি তুলে,
সোহাগের পুতুলির প্রায়,
বর্ষ তুমি এলে পুনরায়!

হইয়া খেলার সাথী বায়ু করে মাতামাতি
জীর্ণ পাতা চৌদিকে ছড়ায়,
মেঘের দোলার পরে দুলিয়া পুলকভরে
বিজলির পতাকা উড়ায়।

প্রয়োজন নাহি মনে উৎসবের আয়োজনে
মহানন্দ আজিকে ধরায়,
মঙ্গল কলস দ্বারে, নহবতে বারে বারে
সমাদরে স্বাগত জানায়,
প্রার্থী আজি ফিরে নাহি যায়!

অবোধ শিশুর মত সুখের খেলনা কত
বহিয়া লইয়া দুটি করে,
বর্ষ তুমি এলে হর্ষ ভরে,
আজিকার কিশলয়, হবে জীর্ণ পত্রচয়,
ধূলায় লুটাবে সবে পড়ে,

ভাঙ্গিবে ফুলের মেলা যাবে মলয়ের খেলা,
পিক সেও যাবে দেশান্তরে,
রবির কিরণ হাসি, চাঁদের অমিয়া রাশি
ঢাকিবে বরষা মেঘস্তরে,
শুধু সে তোমার প্রাণ, কালের অনন্ত দান
আনন্দের বার্ত্তা সাথে ক'রে
আবার আসিবে বর্ষ পরে!
অতীত জীর্ণতা যত করি সব অপগত
এলে যদি বরষ নূতন,
হোক তব নব উদ্বোধন!
নব তৃণ পুষ্প ভারে, সাজাইলে বসুধারে,
ফিরে দিলে কোকিল কূজন,
বাহিরের সব সাজ ফিরায়ে দিয়াছ আজ,
বসুধার তরুণ জীবন,
চির শিশু তব প্রাণ, মানবেরে কর দান
সঞ্জীবিত কর প্রাণমন,
সরল অভয় বুকে আশার প্রসন্ন মুখে
উদার হৃদয়ে আমরণ
সুখ দুঃখ করুক বরণ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সাধুর উপদেশ।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে আগ্রা সহরে বারাণসী দাস নামক এক জন জৈন সাধু বাস করিতেন। আকবর সকল ধর্ম্মেই শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলিয়া সকল ধর্ম্মাবলম্বী সাধু মাত্রই তাঁহার ভক্তির পাত্র ছিলেন। তিনি একদিন বারাণসী দাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি চাহেন, অনুগ্রহ করিয়া আমায় বলুন। আপনার পবিত্র জীবন দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আজ আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিব।"

সাধু বলিলেন, "আমি যাহা চাই, তদপেক্ষা অনেক অধিক ভগবানের কৃপায় লাভ করিয়াছি। আমার কোন অভাব নাই।" তখন আকবর বলিলেন, "না, না, অনুগ্রহ করিয়া কিছু প্রার্থনা করুন, নতুবা আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিনা।"

সাধু বলিলেন, "আমি সানুনয়ে এই প্রার্থনা করি, আপনি যেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আর কখনও রাজ প্রাসাদে আহ্বান না করেন। আমি সমস্ত সময় ঈশ্বর ধ্যানে ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে রত থাকিতে চাই।"

আকবর বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক; কিন্তু আপনার নিকট আমিও কিছু প্রার্থনা করি।"

সাধু বলিলেন, "আচ্ছা, কি চাহেন বলুন।" আকবর বলিলেন, "আমাকে এমন উপদেশ প্রদান করুন, যাহা স্মরণ রাখিয়া আমি তদনুসারে কার্য্য করিতে পারি।"

কিছুক্ষণ চিন্তার পর সাধু বলিলেন, "আপনার খাদ্যের প্রতি আপনি প্রখর দৃষ্টি রাখিবেন। আমাদের দেহ পুষ্টিকর খাদ্যেই বলশালী হয়, ঐরূপ খাদ্য সামান্য হইলেও তাহাই দেহ রক্ষার জন্য আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর।"

পুষ্টিকর পরিমিত খাদ্যই আমাদের দেহ রক্ষার জন্য আবশ্যক। আমাদের দেহ ঈশ্বরের মন্দির স্বরূপ। দেহ পবিত্র রাখিলে মনও পবিত্র হয় ও মন্দ চিন্তা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না।

ঘটনাক্রমে সেই দিন এক বাৎসরিক উৎসবের দিন ছিল। সে দিন সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া শেষ রাত্রিতে আহার করিবেন, আকবর স্থির করিয়া ছিলেন। নিরূপিত সময়ে পাচকগণ স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে নানা উপাদেয় খাদ্য সজ্জিত করিয়া আনিল। আকবর সত্বর আহার করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সেই সাধুর উপদেশ স্মরণ হওয়াতে, তিনি খাদ্য দ্রব্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, খাদ্যগুলি সুন্দর মসৃণ পাত্রে সজ্জিত ও পরিষ্কার গৃহে রক্ষিত হইলেও তাহা অসংখ্য পিপীলিকায় পূর্ণ হইয়া আহারের

উপযোগী নয়। তখন সাধুর বাক্য স্মরণ করিয়া তিনি সমস্ত খাদ্য ফিরাইয়া দিলেন।

রোমক কবি ভার্জ্জিল অনেক সময় মাঠে কাটাইতেন। হৃষ্টপুষ্ট বলবান বৃষদিগকে ভূমি কর্ষণ করিতে দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন। তাহারা ভূমি চষিবে, তবে বীজ বপন করা যাইবে; তাহা হইতে শস্য উৎপন্ন হইলে তবে প্রাণীগণ আহার করিয়া বাঁচিবে। সম্বৎসরের অধিক দিন এই বৃষদিগকে রৌদ্র, বৃষ্টি, সুদিন, দুর্দ্দিন অগ্রাহ্য করিয়া কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়। তিনি বলিতেন, বৃষগণ অতি সামান্য তৃণ ও উদ্ভিদ আহার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের দেহে কেমন বল এবং তাহারা কেমন কষ্টসহ ও পরিশ্রম সহিতে পারে।

শ্রীবাসন্তী মিত্র।

অনাথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

করুণা টাকাকড়ি, কাপড়, গহনা, খাওয়া, আমোদ আহ্লাদ অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে অনায়াসে মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ত্যাগ করেছিল, কিন্তু তার আপন মায়ের ভাই, জীবনের কত স্নেহের অবলম্বন, এই সদাশয়, প্রিয়দর্শন আত্মীয়টি তার কাছে তার বাবার মতই ভালবাসা ও সম্মানের পাত্র, আপনার মাতুল, তার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ভুলে যাওয়া তাঁর সঙ্গে পরের মত ব্যবহার করা এইটেই তার কাছে সব চেয়ে কঠিন বলে মনে হচ্ছিল। রাজাবাহাদুর তার সকল কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে তার পর বল্লেন, "তাহ'লে দেওয়ানজীর বাড়ী থাকা তোমার ভাল মনে হয়? এ বন্দোবস্ত করা কঠিন হবে না, শোভনা তোমারও কি এ বন্দোবস্ত ভাল মনে হয়?"

শোভনা হাসিমুখে বল্লে, "হ্যাঁ মামাবাবু, সে খুব ভাল হবে, তুমি বড় ভাল।" এই বলে দুই হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে কত আদর করতে লাগল।

করুণার বিষয় ভাবতে ভাবতে রাজাবাহাদুর মনে করলেন, এ মেয়েটিত বড় ভাল মনে হচ্ছে, এর কথা আর কাজ যদি এক হয়, তাহ'লেত খুবই ভাল বলতে হবে। তার পর তাদের দুজনকেই সম্বোধন করে বল্লেন, "আচ্ছা, তোমরা দুজনেই যাও, কাপড় ছেড়ে এসগে, বৃষ্টি আর পড়ছেনা, তোমাদের দুজনকে আমি সঙ্গে নিয়ে দেওয়ানজীর ওখানে যাব। গায়ে কিন্তু খুব গরম কাপড় দিও, বাহিরে বড় ঠাণ্ডা।"

এর এক ঘণ্টা পরে শোভনা ও করুণা কাপড় বদলে এসে রাজাবাহাদুরের সঙ্গে গাড়ীতে গেল, তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য্যদেব দেখা দিয়াছেন। চারিদিকে আলোর ছড়াছড়ি, গাছের ভিজে পাতা, মাঠের ভিজে ঘাস, দূরে ক্ষেতের ঢেউখেলান ঘন সবুজ ধানের উপর আলো পড়ে হীরে মুক্তো ঝক্‌মক্ করছিল। তাদের মনে হচ্ছিল, যেন কোন পরী রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। করুণার মনে হচ্ছিল, যেন রাজাবাহাদুর বড় গম্ভীর হয়ে রয়েছেন তিনি গায়ে সুন্দর শালের চোগা আর মাথায় পাগড়ী পরেছিলেন, তাঁকে যথার্থ ই রাজার মত দেখিয়েছিল। গাড়ী তিনি নিজেই হাঁকাচ্ছিলেন, দুটি প্রকাণ্ড ধূসর বর্ণের তেজী আরবি ঘোড়া, ঘাড় বাঁকিয়ে নাচতে নাচতে চলেছিল, তাদের এমন সহজে সামলে নিয়ে যাচ্ছিলেন দেখে করুণার বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছিল। সে এরি মধ্যে তাঁকে খুব ভাল বেসেছিল, একে তিনি তার আপনার মামা, তার আপন মায়ের ভাই, তাছাড়া তাঁর রাজতুল্য উজ্জ্বল গম্ভীর মূর্ত্তি, তাঁর অমায়িক ব্যবহার, তার মন ভক্তি ও সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ করেছিল। হাতের চাবুক তুলে দূরে একটি রাঙ্গা ইটের বাড়ী দেখিয়ে বল্লেন, "ঐ দেখ, দেওয়ানজীর বাড়ী।" এই সময়ে জুড়ির একটা ঘোড়া হঠাৎ কি দেখে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠ্‌লে, তাই দেখে শোভনা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে চীৎকার করে গাড়ী হতে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, করুণা আর রাজাবাহাদুর তাকে জোর করে ধরে বসিয়ে রাখলেন। এই সময় ঘোড়ার মুখের রাশ আলগা হয়ে যাওয়ায় তারা খুব লাফালাফি করতে আরম্ভ করলে, তাদের শান্ত কর্ত্তে কিছুক্ষণ সময় চলে গেল।

ঘোড়া দুটি শান্ত হলে তিনি শোভনার দিকে ফিরে গম্ভীর ও দৃঢ় স্বরে বল্লেন, "আর কখন ওরকম কোরনা শোভনা।"

শোভনা ঠোঁট ফুলিয়ে আদুরে সুরে বল্লে, "আমার যে বড় ভয় লেগেছিল, আমি তাই নেমে পড়তে চেয়েছিলাম।"

"তোমার ব্যবহার দেখে আমার লজ্জা হল, ভদ্র লোকের মেয়ে ভয় পেলেও অমন নির্ব্বোধের মত ব্যবহার করে না।" পরে বোধ হয় তাঁর মনে হল, কথাটা রূঢ় শোনাল, তা ছাড়া ভেবে দেখলেন, শোভনা কখনো এমন তেজী জুড়ি ও খোলা গাড়ীতে চড়েনি, তখন স্নিগ্ধস্বরে বল্লেন, "তোমার বোন যদি তোমার পাশে বসে না থাকত, আর তুমি যদি লাফিয়ে পড়তে, তাহলে মারা যেতে তা জান?"

শোভনা একেবারে নরম হয়ে গেল, রাজা বাহাদুরের কাছ হতে সরে এসে সে করুণার কাছে ঘেঁসে বসল, আর মনে মনে ভাবতে লাগল, "মামাবাবুর সঙ্গে না এসে সে যদি রাণী মামীর কাছে বাড়ীতে থাকত, তাহলে কত আদর পেত। তবে শোভনা কিছুই বেশীক্ষণ মনে করে রাখতে পারতনা, দেওয়ানজীর বাড়ী পৌঁছবার আগেই তার মন আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠল। দেওয়ানজীর বাড়ীটি চকমিলান সেকালের ধরণের বাড়ী, সামনে অনেকটা আম কাঁঠালের বাগান, পিছনে খিড়কির পুকুর,এ ছাড়া আশে পাশে কুল, জাম, পেয়ারা,বাতাবী লেবুর গাছ। দেওয়ানজীর স্ত্রী রাজাবাহাদুরের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া, তিনি তাঁর নাম ধরে শিবানী দিদি, শিবানী দিদি বলে ডাকতে ডাকতে বাড়ীর ভিতর গেলেন। গরমের সময় এ বাড়ীর ভিতরে খুব লুকোচুরি খেলবার সুবিধা, কত গলি ঘুঁজি, কত বাঁকাচোরা বারান্দা। আজ বর্ষায় সব অন্ধকার, বৃষ্টিতে সব সেঁত সেঁত করছে। বাড়ীর ভিতরে যে বড় ঘরে তাঁরা গেলেন, তাতে নীচু তক্তা-পোষ বিছান, তার উপর ফরাস পাতা, পাশের একটি ঘরে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অনেক কাপড় সাজান রয়েছে, ছোট ছোট টুপি লাঠি ছাতাও আছে। সে ঘরে আর কোন আসবাব নেই, দেওয়ানজী মহাশয় তখন কাছারী বাড়ীতে, শিবানী দিদিই এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। শোভনা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "মামাবাবু এঁদের কি অনেক ছেলে?" মামাবাবুও চুপি চুপি বল্লেন, "হ্যাঁ ওদের চারটি নিজের ছেলে, তাই অন্য লোকের আরও দুচারিটি এনে রেখেছেন, এঁরা ছেলে খুবই ভাল বাসেন।" করুণার শিবানী দিদিকে বড় ভাল লাগল, তাঁর সেই সেকালের ধরণের সাজ, পরণে চওড়া লাল পাড়ের শাড়ী, পায়ে দুগাছি মোটা মল, হাতে মোটা বালা আর অনন্ত, গলায় হেঁসো হার। সিঁথেয় চওড়া করে সিঁদুর পরা, কপালে মস্ত সিঁদুরের টীপ। তাঁকে দেখে মনে হল সাক্ষাৎ দেবী অন্নপূর্ণা, ক্ষুধিত, ব্যথিত পৃথিবীর দুঃখ জ্বালা দূর করবার জন্যেই যেন এসেছেন। রাজাবাহাদুরের কাছে এলে তিনি উঠে প্রণাম করলেন। শিবানী দিদি তাঁর মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন, "ভাই, তুমি এসেছ, কেন এসেছ, সে কথা আমি আগেই শুনেছি। তোমার দেওয়ান তো কাজে বাহিরে গিয়েছেন।" রাজা বাহাদুর বল্লেন, "মেয়ে দুটিকে আমি সঙ্গে করে এনেছি, এটি শোভনা, আমার ভাগ্নি, আর এই মেয়েটি এর নাম করুণা, শোভনার বোন। আমি এখন তো এদের সকলেরি ভার নেব স্থির করেছি, সে সব কথা আমি দেওয়ানজীকে বলেছি, এখন তোমার অনুমতি পেলেই ছোট মেয়ে ছেলেদের তোমার কাছে রেখে যেতে পারি। শোভনা আমাদের কাছেই থাকবে!"

শিবানী দিদি প্রশান্ত হাসিমুখে বল্লেন, জানত ভাই, মা ষষ্ঠীরকৃপায় আমাদের ঘরে কচিমুখের অভাব নেই, আমার বাছারা যেমন আছে, এরাও তেমন থাকবে, কোলের খুকি ছাড়া ঘরেত আর মেয়ে নেই, এরা এসে আমার ঘরের শোভা বেড়ে যাবে। আহা, মেয়ে নইলে কি ঘর মানায়? ছেলেরাত দৌড়ধাপ করেই ফেরে, তার পর স্কুলে যাবে, খেলবে, নাবার খাবার সময় ছাড়া তাদের নাগাল পাওয়াই ভার। মেয়ে গুলি বেশ আমার পায়ের কাছে কাছে থাকবে, তাদের চুল বেঁধে, টিপ দিয়ে, রংকরা শাড়ী পরিয়ে সাজিয়ে দেব, আমার অনেক দিনের সাধ মিটবে।"

রাজাবাহাদুর হাসতে হাসতে বল্লেন, "সাধ বুঝি এখনও মেটেনি।"

শিবানী দিদি হাসিমুখে করুণার দিকে চেয়ে বল্লেন, "দেখ বাছা, এ বাড়ীতে অনেক গুলি বেটা ছেলে, তারা দূরে দূরে স্কুলে যায়, দুষ্টুও আছে, তবে তোদের সবাই ভালবাসবে, খুকিকে তারা খুব আদর করে।"

করুণা বল্লে "বীরেনতো সঙ্গী পেয়ে খুব খুসী হবে। ছেলেদের সঙ্গে খেলতেই তার বেশী ভাল লাগে, সে মনে করে সে মস্ত বড় হয়েছে, তবে তার বয়স মোটে সাত বৎসর।" রাজাবাহাদুর বল্লেন "তাহ'লে তার সঙ্গীর আর অভাব হবেনা। সব ছোট মেয়েটির ভার নেওয়া তোমার পক্ষে কষ্টকর হবেনাত দিদি? সেত শুনেছি, একবারে শিশু। করুণা বল্লে "সেত খুব ছোট নয়, তবে বয়স ৩॥ বৎসর।"

শিবানী দিদি বল্লেন, "তাহলে ত মস্ত বড়; কোলের খুকি সবে সাত মাসের, জাজু দেড় বৎসর, আর জয়চাঁদ, আড়াই বৎসরের।"

করুণার হাস্য প্রফুল্ল মুখখানি রাজা বাহাদুরের চোখ এড়ায়নি, তিনি তাকে কাছে ডেকে বল্লেন "তাহলে তোমার এখানে থাকতে ভাল লাগবে?" করুণা হাসিমুখে বল্লে "খুবই ভাল লাগবে।"

রাজপ্রাসাদে যেখানে তাকে কেউ চায় না, তার চেয়ে এই গৃহস্থের শান্তিময় ঘর বাড়ী, এই স্নেহময়ী সন্তান-বৎসলা নারীর আশ্রয় তার কাছে শতগুণে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হ'ল।

শিবানী দিদির হাত ধরে করুণা সলজ্জ মুখে বল্লে, "মাসিমা আমি আপনার অনেক কাজের সাহায্য করতে পারব। ছোট ছেলে মেয়েদের সব কাজ আমি জানি! আমাকে কাজ করতে দেবেন, আমি খুকুর আর বীরেনের সব কাজ নিজেই করে দেবো।"

"তাত দেবেই মাণিক, এখন তুমিই তাদের মা, আমার সঙ্গেও কাজ কোর, কতবার কর্ম্ম কাজ করি, আর ভাবি, আমার যদি একটি মেয়ে থাকত, সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে কত কাজ করতে পারত। আমার পিসতুত বোনের একটি মেয়ে আমার কাছে থাকে, সে বড় লক্ষী মেয়ে, সেইত আমার ডান হাত। একালের মেয়ে, খাসা লেখাপড়া জানে, তোমাকে পড়াতে পারবে, তার পর তুমি শিখে আবার তোমার ছোট বোনটিকে শেখাতে পারবে!"

করুণার মনে হতে লাগল, তার মনের সব ভার যেন হাল্কা হয়ে গিয়েছে। রাজা বাহাদুর বল্লেন, "এখন তাদের কবে আনতে পারি, তাই বল, তোমার যদি কোন অসুবিধা না হয়, তাহলে অবিলম্বে শিবনাথ সরকারকে পাঠিয়ে দি, নিস্তার ঠাকুরাণীর ওখান হতে একেবারে এখানে নিয়ে আসবে। পুরাণ একজন দাসীও সঙ্গে যেতে পারবে। করুণা এখানে উপস্থিত থেকে তাদের অভ্যর্থনা করে নেবে, শোভনা, তুমিও সেদিন এখানে আসবে।"

শোভনা বল্লে, "আসবো বই কি?" বীরেন কি বলে কি করে সব তার দেখবার ইচ্ছে ছিল, করুণার রাজা মামা না হয়ে কেমন করে তিনি শোভনার হয়ে গেলেন।

এ রহস্য সে কি রকম করে মীমাংসা করে, সেটা জানবার জন্যে কৌতূহল হচ্ছিল, তা ছাড়া চতুর শোভনা আগে হ'তেই বুঝতে পেরেছিল, রাজা বাহাদুর বীরেনের সঙ্গে বেশী কিছু কথাবার্ত্তা কইবেন না!

শিবানী দিদি বল্লেন 'এর আবার কথা? যেদিন বল, সেই দিনই তারা আসতে পারে। ছেলে ঘরে আসবে তার আর সুবিধা অসুবিধা কি? তাদের কোন কষ্ট যাতে না হয় তা আমি দেখব। দেওয়ানজীর কথা জানইত ভাই, তিনি তোমার মন্ত্রী বটেন, এরাজত্বে রাণীও যিনি, মন্ত্রীও তিনি, দেওয়ান বাহাদুর কিছুরই মধ্যে নেই, হাঁক ডাক যত তোমার কাছারীতে, বাড়ীতে দুটি দুটি খান, আর থাকেন, ঘরকন্না সবই ত আমি মাথায় করে আছি।"

"তাহলে সব কথা ঠিক রইল। তারা যেদিন এসে পৌঁছিবে, তার আগেই তোমাকে জানাব। করুণা আর তার ভাই বোন তোমার কাছে খুব সুখেই থাকবে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তোমার বোনঝি করুণাদের পড়াতেও পারবেন, তা হলে সব বিষয়েই আমি এক রকম নিশ্চিন্ত হলাম।"

"পারবে বলেই ত মনে হয়, তবে করুণা যদি খুব বেশী শিখে এসে থাকে, তাহলে হবে না, তাহলে দেওয়ানজী পণ্ডিতি করবেন এখন।"

করুণা বল্লে, "মাসিমা, আমি বিশেষ কিছুই জানিনে, তবে বই আমি অনেক পড়েছি, বানান ভুল না করে

আমি লিখতেও পারি, আর কিছু জানিনে। "ভূগোল ইতিহাস অঙ্ক এসব কিছু জাননা বুঝি?" "খুব সামান্যই জানি।" "শোভনা, তুমি বয়সে বড়, তুমি বোধ হয়, করুণার চাইতে বেশী জান?"

শোভনা বিশেষ, কিছুই জানত না, তার অজ্ঞতার শিখর হতে সে অতি অবহেলার সঙ্গে বল্লে "ভুগোল, অঙ্ক, ওসব আমি খুবই জানি।"

করুণা শোভনার অহঙ্কারে ভীত হয়ে বিশেষতঃ কখন না জানি তার সব মিথ্যা কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশঙ্কায় ধীরে ধীরে বল্লে, "শোভনা কতকগুলি বিষয় বেশ ভাল পারে, তবে তার বয়সের পক্ষে, তার কেন সকলেরি বয়সের পক্ষে আমরা বেশী কিছু লেখাপড়া জানিনে। অনেক দিন আমরা বর্ম্মায় ছিলাম, তার পর অনেক দিন নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। শোভনার শরীর বড় সুকুমার, তাই বেশী পড়েনি। ডাক্তার বাবু তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করাতে, কি জোর করে পড়াতে মানা করেছিলেন, তাইতে বেশী শেখা হয়নি।" শিবানী দিদি গম্ভীর মুখে বল্লেন, "বাছা শোভনাকে সত্যি, বড় সুকুমার দেখতে!" শোভনার গোলাপের পাঁপড়ির মত অত সুকুমার সুকোমল গায়ের রং, বড় বড় ভাসা চোখ, দেখলেই কেমন মনে হতো, সে যেন এ পৃথিবীর নয়।

রাজা বাহাদুর শিবানী দিদির কথা শুনে একবার চিন্তিত ও ভীত দৃষ্টিতে শোভনার মুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু তার উজ্জ্বল মুখ খানি দেখে তাঁর মন নিশ্চিন্ত হ'ল। এমন যার টুক্‌টুকে মুখ, তারার মত জলজলে চোখ, তার কি কখনো কোন রোগ থাকতে পারে। বরং করুণার পাণ্ডু মুখ, সকরুণ শ্রান্ত দৃষ্টি, চোখের কোলে কালিমা দেখলে তাকেই অসুস্থ বলে মনে হয়।

"সে বর্ম্মা দেশ তো ভাল নয়, এদের শিশুকাল সেখানেই কেটেছে, তাই তেমন সুস্থ হতে পারেনি। চল এখন বাড়ী যাওয়া যাক। শোভা, তোমার শালটা ভাল করে জড়িয়ে নাও, বাহিরে বড় ঠাণ্ডা।" এই বলে অনভ্যস্ত কম্পিত হাতে অতি যত্নের সঙ্গে শাল খানি শোভনার মাথা ঢেকে পরিয়ে দিলেন। চুল সব খারাপ হয়ে গেল, আঙুরের গুচ্ছের মত কোঁকড়ান চুল সব অগোছাল হয়ে যাবে, সেটা শোভনার ভাল লাগছিল না। কি করবে তাঁকেত কিছু বলতে পারে না, তাই দুহাতে আলগা করে শাল খানি ধরে রইল।

ফিরিবার সময় তিনি ভারী চুপ করেছিলেন, গাড়ী যতক্ষণ বাড়ীর সদর দরজায় গিয়ে না পৌঁছিল, ততক্ষণ দুই মেয়েতে কি কথা বার্ত্তা বল্‌ছে, তা তাঁর কানেই যায়নি।

শোভনা করুণাকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা শিবানী ঠাকুরাণীর কাছে পড়তে তোমার ভাল লাগবে?"

করুণা বল্লে "তা কেন লাগবে না? পড়তে আমার সকলের কাছেই ভাল লাগে। আমি খুব অনেক বিদ্যা শিখতে চাই, তাহলে বড় হলে কত ভাল ভাল বই লিখতে পারব।"

"ভদ্রলোকের ছেলে মেয়ে আবার নাকি বই লেখে, ওত একটা ব্যবসা, এই যত কেরাণী, স্কুলের পণ্ডিত তারাই বই লেখে, বেচে পয়সা করে।"

রাজা বাহাদুর একটু বিদ্রূপের হাসি হাসলেন।

করুণা বল্লে, "তাই বুঝি, বিদ্যা না থাকলে বই কখন লেখা যায়? তা না হলে কত ভুল হবে, যে তার ঠিক নেই! তোমাদের যেমন গল্প বলি, অমনি বইত আমি লিখব না, আমি খুব ভাল বড় রকমের বই লিখতে চাই। তাতে কত ভাল ভাল ভাব, কত গভীর চিন্তা থাক্‌বে।"

"আচ্ছা বইয়ের কি নাম দিবি?"

আমি অনেক গুলো নাম মনে করেছি, তবে আমার সে বইয়ে এত কথা, এত ভিন্ন ভিন্ন রকমের কথা থাক্‌বে, যে কি নাম দিলে সব ঠিক বোঝা যাবে, সেটা এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। তার যদি নাম দি, "আমাদের এই পৃথিবীর বিষয় সব কথা" তাহলে চলবে বোধ হয়। তাহলে কোন বিশেষ বিষয় বলতে হবে না, সব কথা, কত রকমের কথা লিখতে পারব, সে বেশ হবে!"

"তা ভাই, তুই পড়গে, বই লিখগে, আমার তো আর

পড়তেও হবে না, কোন কাজও করতে হবে না। আমি রাণী মাসীর মত দিব্যি আরামে বসে থাকব, হাসব, গল্প করব, তাস খেলব, আর যদি ইচ্ছে হয়ত, গানও গাইব।"

হঠাৎ রাজা বাহাদুরের গম্ভীর কণ্ঠে "তা মনে কোরনা শোভনা, শুধু মিছি মিছি সময় নষ্টকরা, তা কখনই হবে না।" এই কথাগুলি শুনে দুজনেই চমকে উঠল। রাজা বাহাদুর বল্লেন, "আমি যত শীঘ্র পারি, তোমার জন্যে খুব ভাল একজন শিক্ষয়িত্রী, আর গান বাজনা, ও ছবি আঁকা শিখবার জন্যে লোক রেখে দেব। এ সব ছাড়া রান্না ও ঘরকন্নার কাজ আর সেলাই করা তোমাকে খুব ভাল করে শিখতে হবে। এতদিন যে সময় নষ্ট হয়েছে, সেটা পূরিয়ে নিতে তোমাকে খুবই পরিশ্রম করতে হবে। কথাবার্ত্তা শুনে আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার ছোট্ট ভাগিনীটি একেবারেই মুখ্যু মানুষ।"

এই কথা শুনেই শোভনার বাক্যস্রোত একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। রাজা বাহাদুর মনে করলেন, কথাটা হয়ত একটু রূঢ় হল, কেননা দেখ্‌লেন শোভনার ঠোঁট দুখানি কাঁপছে, দুটি চোখ জলে ভ'রে এসেছে, করুণা, স্নেহময়ী করুণা দুখানি হাত বাড়িয়ে শোভনাকে কাছে টেনে নিয়েছে। শোভনাকে এই আদর করা দেখে রাজাবাহাদুর একটু বিরক্ত হলেন, তবুও করুণার প্রতি তাঁর মনে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হ'ল। এই ক্ষীণ, নম্র, সুকুমার মেয়েটি লোকের চোখের তীব্র দৃষ্টি এড়াবার জন্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত, কিন্তু তবুও কাজের সময় নির্ভয়ে দৃঢ় স্বরে কথা কয়, ঘোড়া লাফিয়ে যখন গাড়ী উল্টে ফেলবার যোগাড় করেছিল, তখন তার মুখের ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়নি, লেশ মাত্র ভয়ের চিহ্ন দেখা যায়নি, বরং সে যদি জোর করে শোভনাকে না বসিয়ে রাখত, তাহলে লাফিয়ে পড়ে হয়ত সে মারাই যেত, এই মেয়েটি কখনো উত্তেজিত বা চঞ্চল হয় না, ধনী গৃহের বিলাস ঐশ্বর্য্য কিছুমাত্র তাকে বিচলিত করেনা, অথচ তার মন এমন সহানুভূতি, এমন স্ত্রী সুলভ মমতায় পূর্ণ, যে তার বোনের মৃত মাতার ছবি দেখে চোখের জল সম্বরণ করে রাখ্‌তে পারে না। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, মেয়েটি স্বভাবতঃ ভদ্র বনিয়াদি ঘরের মেয়ে যেমন হয় তাই, নম্রতা ও নির্ভীকতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ। তার সঙ্গ শোভনার পক্ষে যে শুভ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর আমাদের সুন্দর পাগলী মেয়েটি, সবাই মিলে আদর দিয়ে তার মাথাটি খেয়েছে, অমন মুখ যে সবাইকে ভুলিয়েছে, তাতে আর আশ্চর্য্য কিছু দেখছিনে। ওকে আমার মনের মত করে গড়তে হবে সত্যি, তবে এটাও মনে রাখতে হবে, ওর উপর কঠোর ব্যবহার চল্‌বে না, ও যে আমাদের স্বর্গের পারিজাত।

বৈকালে উপরে বাড়ীর ভিতরকার বসবার ঘরে এসে রাজাবাহাদুর দেখলেন, শোভনা নতুন কাপড় ও গহনায় এক খানি দেবী প্রতিমার মত সেজে তার মামীর কোলের কাছে বসে আছে, চারিদিকে হাসি গল্পের স্রোত চলেছে, এই গোলমালের মধ্যেও কিন্তু করুণা এক কোণে এক খানি প্রকাণ্ড বই নিয়ে এক মনে পড়ছে। রাজা বাহাদুর সবারি সঙ্গে একটি দুটি কথা বলে আস্তে গিয়ে করুণার পাশে বসে স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "করুণাময়ী, তুমি কি পড়ছ?" সে এক মনে পড়ছিল, চারিদিকে লোকজন আছে, সে সব কথা ভুলেই গিয়েছিল, হঠাৎ রাজাবাহাদুরের কথা শুনে সে যেন চম্‌কে আকাশ হ'তে পড়ল। তার পরে বল্লে, "আমি এই বইখানি দেখতে পেয়ে পড়তে নিয়েছি. আমি কিন্তু কারো অনুমতি না নিয়েই নিয়েছি। একটু আগে দেখলাম, বইখানি মাটীতে পড়ে রয়েছে, আসতে যেতে লোকজনের পা লাগছে, তাই মনে করলাম, আমি নিলে ক্ষতি হবে না, সবাই কথা বলছিলেন, তাই তাঁদের বাধা দিতে—"

রাজাবাহাদুর বল্লেন, "কোনই ক্ষতি হয়নি, কোন দোষই হয়নি, বইখানির নাম কি?

করুণা বল্লে, "—বংশাবলি, আমি তাই পড়ছিলাম, এ যেন ইতিহাসের মত। আমার খুব ভাল লাগছিল, মনে হচ্ছিল, এমন বংশে জন্ম হওয়া ভাল। আমি মনে কল্পনাই করতে পারিনে, এখনও এমন সব লোক বেঁচে আছেন, যাঁদের পূর্ব্বপুরুষ প্রপিতামহ, পিতামহ, কত

বড় বড় কাজ করেছেন, দেশের লোকের কত উপকার করেছেন। কতকগুলি ছবি আছে, এরি মধ্যে কার একখানি ছবি আপনার বস্‌বার ঘরেও আছে।”

রাজা বাহাদুর বইখানি নিয়ে তাতে যে সব ছবি, ছিল, তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মামার বাড়ী।

ঢ়াড়ের দেশে পাড়াগাঁয়ে মামাদের বাড়ী;
যেমন তেমন গাঁ নয়ক মস্ত এক ভারী।
গ্রামের নীচে যাচ্ছে ব'য়ে একটু খানি নদী;
পাড়ায় পাড়ায় আছে কত, দাস দত্তের গদী।
মামাদের বাড়ী সব মাটী কোঠার ঘর,
দড়ির বাঁধন, বাঁশের ছাঁদন, ছাওয়া উলো খড়।
গোবর লেপা আঙ্গনা খানি কেমন পরিপাটী,
কোন কোণে, কোন খানে নাইক ধূলা মাটী।
গোয়াল ভরা গরু আছে, গোলা ভরা ধান,
দু'সন্ধ্যা মামারা সব দুধ ভাত খান।
বাড়ীর পাশেই পুকুর ভরা রুই কাতলা মাছ,
ক্ষেত জোড়া লাউ বেগুণ, শাক সব্‌জির গাছ।
জাঁহাড়া ভরা গুড় আছে, হাঁড়ি ভরা মুড়ি,
কল্‌সী ভরা আম্‌সি আছে, দু'চার ঝুড়ি।
খাসা ধানের চিড়ে আছে, কনকচুরের খৈ,
ঘরে বসান ঘন দুধের কুটুরি ভরা দৈ।
মামীরা সব অন্নপূর্ণা, করুণার ধারা,
স্বর্গের সংগীতময়ী মন্দাকিনী পারা;
সিঁথেয় সিন্দূর, হাতে শাঁখা, মোটা সাড়ী পরা,
দেখ্‌লে পরে মনে হয়, পবিত্রতা গড়া।
গরীব দুঃখী অতিথ ফকির কেউ নাইক যার,
মামার বাড়ী তার কাছে অবারিত দ্বার।
সোনার সংসার খানি দেখ্‌লে জুড়ায় চোখ,
অন্নপূর্ণার বাড়ী ব'লে ঘোষে দেশের লোক।

শ্রীঅতুলচন্দ্র সিংহ

বাঙ্গাল রমেশ।

পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের উপর কলিকাতার ছেলেদের ততটা ভাল ভাব নাই, বরং একটু ঘৃণাই আছে। ট্রাম গাড়ী, জু, মিউজিয়ম, কলের জল যেখানে নাই, তথায় মানুষ যে কিরূপে বাস করে, তার ত ধারণাই করা যায় না, যারা সে সব দেশে থাকে, তারা একটা কিম্ভূত কিমাকার লোক! রমেশ পাড়াগেঁয়ে, তাতে আবার বাঙ্গাল; সুতরাং সে যখন তার বাপের সঙ্গে আসিয়া ক্লাসের শিক্ষক মহাশয়কে দণ্ডবৎ করিল, তখন তো ক্লাসের সব ছেলে হেসেই খুন। স্কুলের ছুটির পূর্ব্বে শিক্ষক মহাশয় একবার রেজেষ্ট্রীতে সকলের নামের কাছে একটা নম্বর দিয়া রাখেন। তাঁহার নিয়ম এই যে, ছেলে ক্লাসে কাহারও সহিত কথা বলে নাই, সে ১০ নম্বর পাইবে. তার পরে যে যেমন এই নিয়মটী পালন করে সে তদনুসারে কমবেশী নম্বর পাইবে। রমেশ নূতন আসিয়াছে মাষ্টার মহাশয় তাহাকে নিয়মটী বুঝাইয়া দিয়া সকলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন, সকলেই নাম ডাকিবামাত্র ১০ বলিল। রমেশের যখন পালা আসিল সে নিরুত্তর। শিক্ষকমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি, তুমি কি নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছ?” রমেশ উত্তর করিল, “হাঁ”। শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কতবার?” রমেশ বলিল, “সে অনেকবার।” শিক্ষক মহাশয়, “কি ঘৃণার কথা।” এই বলিয়াই রমেশকে শূন্য নম্বর দিলেন। রমেশ তাহার কাকাদের বাড়ীতে থাকে; কাকার ছেলেরা অনেক দিন হইতে কলিকাতায় আছে, রমেশ তাহাদের সঙ্গেই পড়ে। বাড়ী আসিলে পর রমেশকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ভাই, তুমি তো কখনও গোল কর না, তবে কেন নম্বর পাইলে না?” রমেশ বলিল, “কৈন, আমি তো নিয়ম জানিতাম না, সেই একজনের কাছে পেন্‌সিল চাহিলাম, সেও আমার কাছে ছুরী চাহিল; আমি আবার পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।” এই কথা বলিবামাত্র সকলে হো হো, করিয়া হাসিয়া উঠিল। “কি বোকা, কি বোকা, ও রকম তো আমরা
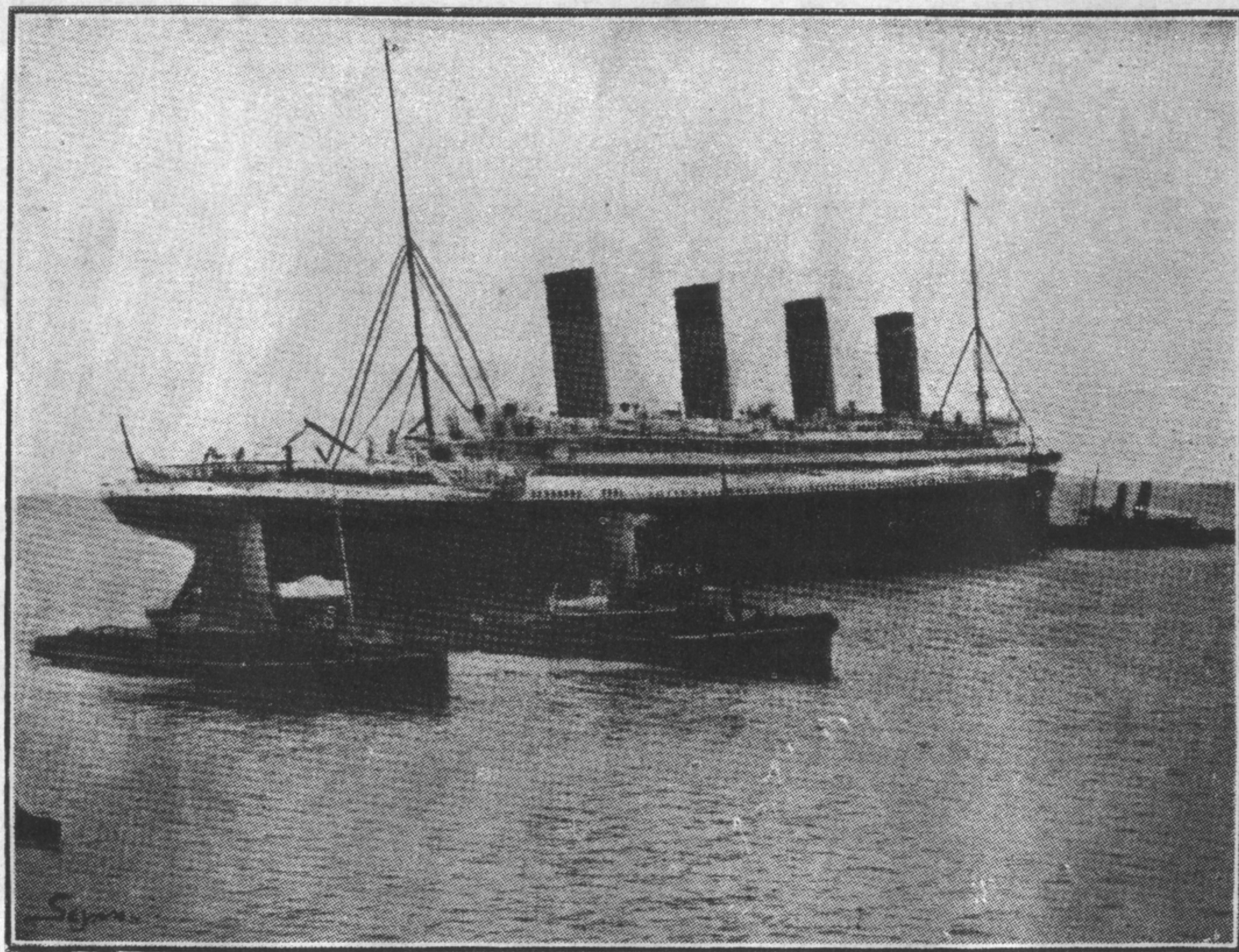
টাইট্যানিক জাহাজ।

সৰ্ব্বাই করি, তা ও কি বলুতে আছে? তা বল্লে ত এক নম্বরও কেউ পায় না।" রমেশ বলিল, "কেন ভাই, আমি মিথ্যা কথা বলিয়া শিক্ষক মহাশয়কে ঠকাইয়া নম্বর লইব, আমি বরং নম্বর নাই পাইলাম।"

মাসের পর মাস চলিয়া গেল; আজ আর রমেশকে কেহ বাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা করে না; তাহার উচ্চারণ ও তাহার ভাষা লইয়া আর ক্লাসের ছেলেরা ঠাট্টা তামাসা করে না। খেলার মাঠে রমেশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; পাঠে সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কেবল ইহাই নয়, কয়েক মাসের মধ্যে ক্লাসে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ক্লাসে পূর্ব্বাপেক্ষা গোলমাল কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু ছেলেরা কেহই পূর্ণ নম্বর পাইতেছে না। নাম ডাকিলেই কেহ বলে, ২, কেহ ৪, কেহ ৮, কিন্তু কেহ আর দশ বলিতে সাহস করে না। রমেশ কাহাকেও উপদেশ দেয় না, কিন্তু ছেলেদের উপরে তাহার আশ্চর্য্য প্রভাব। কোনও বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে, সকলে একবাক্যে রমেশকেই মধ্যস্থ মনোনীত করে; রমেশ যাহা বলে, সকলেই বেদবাক্য বলিয়া তাহা গ্রহণ করে।

আজ এক বৎসর হইয়াছে। আজ পারিতোষিক বিতরণের দিন। সকল ছাত্র বড় হলে সমবেত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "আমি আজ তোমাদিগের নিকট একটা গল্প বলিব। আমি এক দিন নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এক জন লোক আমার কাছে বেড়াইতে ছিল। আমি তাহার পরিচ্ছদে এমন কিছুই পাইলাম না, যেজন্য তাহাকে বিশেষ সম্মান করিতে পারি। শেষে জানিতে পারিলাম, তিনি দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক। পরিচ্ছদ তাঁহার সামান্য ছিল, কিন্তু সেই সামান্য কাপড়ের মধ্যে এক মহা পুরুষ ছি লন। আজ আমি এক জনকে একটী স্বর্ণ পদক পুরস্কার দিব; তাহার বেশ বিন্যাসের দ্বারা তাহাকে চেনা যাইবে না, কিন্তু সে সমস্ত বৎসর সত্যের পূজা করিয়া আসিয়াছে, বল দেখি, সে কে?" সকলে বলিয়া উঠিল, "বাঙ্গাল রমেশ।" উচ্চ করতালির মধ্যে মেডেল পরিয়া শিক্ষকের পদধূলি গ্রহণান্তর রমেশ গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

উয়ান সি কাই
বা
দ্বিতীয় ওয়াসিংটন।

কিছুদিন পূর্ব্বে তোমাদিগকে চীনদেশে নব অভ্যুদয়ের সংবাদ দিয়াছিলাম। চীন সাম্রাজ্যের কয়েকটী প্রদেশের অধিবাসীরা সে সময়ে বিদ্রোহী হইয়া প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিল। তখন পর্য্যন্ত সত্যসত্যই যে বহু প্রাচীন চীনসাম্রাজ্য প্রজাতন্ত্রে পর্য্যবসিত হইবে, ইহা আশা করিতে পারা যায় নাই; কিন্তু বিগত কয়েক মাসে ঘটনা স্রোত প্রবল গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। কালের তরঙ্গে বহু প্রাচীন চীনসাম্রাজ্যের সিংহাসন ভাসিয়া গিয়াছে। সত্যসত্যই চীনদেশে প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র চীনজাতি মহা আনন্দ এবং উৎসাহে প্রজাতন্ত্র প্রথা গ্রহণ করিয়াছে; প্রাচীন সম্রাটবংশ এ পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বিদেশীয় জাতি সকলও পূর্ব্বদেশের এই নব প্রজাতন্ত্রকে সাদরে অভিবাদন করিয়া লইয়াছে। পৃথিবীর প্রধান দুইটী প্রজাতন্ত্র, আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং ফরাসী দেশের পার্শ্বে এখন চীনদেশ তৃতীয় বৃহৎ প্রজাতন্ত্র হইল।

চীনদেশে যে প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এক বৎসর পূর্ব্বে একথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার, অসাধ্য সাধন। চীনদেশ স্থিতিশীলতার জন্য বিখ্যাত। চীনের সভ্যতা এবং জাতীয় জীবন রাজভক্তির ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। সম্রাটের আদেশই চীনদেশের আইন; সম্রাট সর্ব্বেসর্ব্বা, জনসাধারণের অধিকার বলিয়া কোনও পদার্থ এত দিন চীনদেশে ছিল না। সেই চীনদেশে এক কথায় প্রাচীন সিংহাসন অপসারিত হওয়া এবং তাহার স্থলে প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠা হওয়া স্বপ্নের মত মনে হয়। পৃথিবীতে যে সকল স্থানে প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে কত দিনের চেষ্টা ও সংগ্রাম ছিল। ফরাসী দেশে বহু বৎসরের বিপুল চেষ্টা এবং অজস্র রক্তপাতের

পর প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। সে তুলনায় চীন দেশের প্রজাতন্ত্র প্রণালী স্থাপন অতি সহজ ব্যাপার বলিতে হইবে। এখানে অপেক্ষাকৃত সামান্য রক্তপাত হইয়াছে। কোনও গুরুতর যুদ্ধ হয় নাই বলা যাইতে পারে। অবশ্য চীনের প্রজাতন্ত্র এখনও নিরাপদ নহে। এখনও ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে না। যদি আর কোনও দুর্ঘটনা না হয়, এবং বর্ত্তমান শাসন প্রণালী বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা হইলে চীনদেশকে সৌভাগ্যশালী মনে করা যাইবে, এবং চীনের বর্ত্তমান দেশপতি উয়ান সি কাই বিংশ শতাব্দীর এক জন শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া গণ্য হইবেন।

উয়ান সি কাই একজন অসাধারণ লোক। দুঃখের বিষয়, চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এখন পর্য্যন্ত ভালরূপে জানা যায় না। সেখানকার প্রসিদ্ধ লোকদেরও জীবন সম্বন্ধে অতি অল্প সংবাদই বাহিরে যায়। কিন্তু উয়ান সি কাই যে একজন অতি অসাধারণ প্রকৃতির লোক, তাহা ইহাতেই প্রমাণ, যে চীনের বর্ত্তমান বিভ্রাটের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি তাঁহার উপরে পড়িয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন চীনে বিপ্লবের সুত্রপাত হয়, তখন তৎকালীন শাসনকর্ত্তাদের দৃষ্টি তাঁহারই উপরে পড়িয়াছিল। তাঁহারা অবিলম্বে উয়ান সি কাইকে রাজকীয় সৈন্যদলের সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, যে এ বিপদে যদি কেহ রক্ষা করিতে পারেন, তবে সে উয়ান সি কাই। অপরদিকে বিদ্রোহী দলও প্রথম হইতেই উয়ান সি কাইকে আপনাদের নেতা হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। চীনে প্রজাতন্ত্র প্রণালী ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবকারিগণের নেতারা উয়ান-সি-কাইকে প্রজাতন্ত্রের দেশপতি হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এরূপ বিসম্বাদী দলের উভয় পক্ষই এক জন লোককে আপনাদের সহায় এবং নেতারূপে বরণ করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। যে লোক এই ভাবে সকলের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারেন, নিশ্চয়ই তাঁহাতে কোনও অসাধারণ শক্তি ও গুণ আছে।

উয়ান সি-কাই অনেকদিন পর্য্যন্ত কোনও পক্ষই গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। বিপ্লবের প্রারম্ভে সেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বালক সম্রাটের নামে যখন তাঁহাকে আহ্বান করা হইল, তখন তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত সে ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। অবশেষে অনেক অনুরোধ ও উপরোধের পরে তিনি সেনাপতি এবং প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তিনি কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া সম্রাটকে শাসন প্রণালী সংস্কারের জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে সম্রাট জনসাধারণকে শাসন বিষয়ে অনেক অধিকার প্রদান করিতে প্রস্তুত হন। অপরদিকে বিপ্লবের নেতৃগণ প্রথম হইতেই তাঁহাকে চীনে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহার দেশপতির পদ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছিলেন। উয়ান সি কাই অনেকদিন পর্য্যন্ত একথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি প্রথমতঃ প্রচলিত শাসন প্রণালীর সংস্কার করিয়া চীনে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষের লোকের একটী মন্ত্রণা সভা করিয়া যাহাতে সহজে বিবাদ মিটিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, যে বিপ্লবকারিগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইলনা, তাহারা প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর এবং দেশের অধিকাংশ লোকই তাহাদের পক্ষে, তখন তিনি সম্রাটকে স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। সম্রাটের সৈন্যদলের অধিকাংশই বিপ্লবের সহানুভূতিকারী, রাজকোষ অর্থশূন্য, এরূপ অবস্থায় গত্যন্তর না দেখিয়া সম্রাট এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই বিপ্লবকারিগণ আপনাদের অধিকৃত অংশে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিয়া ডাক্তার সুন-জেৎ-সেনকে তাহার দেশপতি মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু সুন-জেৎ-সেন এবং বিপ্লবকারিগণ সমগ্র দেশের অল্প অংশই অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। চীন সাম্রাজ্যের সমগ্র উত্তর অংশ উয়ান সি কাই এর অধীনে ছিল। বিপ্লবকারিগণ সমগ্র দেশে প্রজাতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করিয়া উয়ান সি কাইকে তাহার প্রথম দেশপতি হইবার জন্য আবার সনির্ব্বন্ধ

অনুরোধ করিলেন। উয়ান সি শাই ভিন্ন আর কেহই সমস্ত দেশকে একত্রিত এবং বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নয় বলিয়া সকলই অনুভব করিতে লাগিলেন। উয়ান সি কাই এর উপরে বিদেশীয়গণের বিশ্বাস আছে এবং দেশের লোকেরাও তাঁহাকে ভয় এবং সম্ভ্রম করে। ডাক্তার সুন-জেৎ-সেন দেশের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করেন, এজন্য তিনি স্বয়ং দেশপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া উয়ান-সি-কাইকে দেশপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। বিভিন্নপ্রদেশের প্রতিনিধি লইয়া যে জাতীয় সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহা বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সর্ব্বসম্মতিক্রমে উয়ান-সি কাইকে দেশপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলে যেমন সুপ্রসিদ্ধ জর্জ্জ ওয়াসিংটন সর্ব্বসম্মতিক্রমে দেশপতি মনোনীত হইয়াছিলেন, উয়ান-সি-কাইও সেইরূপ সর্ব্বসম্মতিক্রমে দেশপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এইজন্য তিনি ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় ওয়াসিংটন নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু ওয়াসিংটন অপেক্ষা উয়ান-সি-কাইএর কার্য্য কঠিনতর। জর্জ্জ ওয়াসিংটনকে যে সকল বাধা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া যুক্তরাজ্যের প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিতে হইয়াছিল, উয়ান-সি-কাইএর সম্মুখে তাহা অপেক্ষা অধিক গুরুতর বাধা এবং প্রতিকূলতা আছে। এই সকল দূর করিয়া তিনি যদি চীনদেশে প্রজাতন্ত্র প্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে জগতের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দুঃখের বিষয়, উয়ানসিকাইএর জীবন সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত বেশী কিছু জানা যায় নাই। ষোল বৎসর পূর্ব্বে উয়ানসিসাইএর নাম কেহ জানিতনা। যখন জাপানের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ হয়, সেই সময় এক দল সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া তাঁহাকে শীতপ্রধান চীনদেশের উত্তর সীমায় পাঠান হয়। তাহাদের না ছিল উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র, না ছিল শীতবস্ত্র, সৈন্য অপেক্ষা হইত। উয়ানসিকাইও ইতিপূর্ব্বে কোনও যুদ্ধক্ষেত্র দেখেন নাই। কেবল তিনি কিছু দিন কোরিয়াতে চীনের রাজদূত ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু তিনি জেনারেল গর্ডনের কীর্ত্তির কথা জানিতেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে উপযুক্ত বেতন দিলে চীনেরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৈন্যদিগের সমকক্ষ হইতে পারে। তদনুসারে তিনি আপনার অধীনস্থ ক্ষুদ্র সৈন্যদিগকে ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিতে এবং যথাসময়ে তাহাদের প্রাপ্য বেতন দিতে লাগিলেন, এই সৈন্যদল ক্রমে তাঁহার প্রতি নিরতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িল। একদিকে তিনি যেমন তাহাদিগকে কঠোর শাসনে রাখিতেন, অপর দিকে তাহাদের কোনও ন্যায্য দাবী তিনি অগ্রাহ্য করিতেন না।

১৮৯৮ সালে চীনদেশে এক অন্তর্বিপ্লব হয়। উক্ত বৎসর ২২এ সেপ্টেম্বর বিধবা বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী তৎকালীন সম্রাট কোয়াংশুর হস্ত হইতে সমুদয় শক্তি কাড়িয়া লইয়া স্বয়ং শাসন দণ্ড পরিচালিত করিতে আরম্ভ করেন। বিবাদের সময় উয়ানসিকাই এবং তাঁহার সুশিক্ষিত পাঁচ সহস্র সৈন্যদলের উপর চীনসম্রাজ্যের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছিল। বিধবা সম্রাজ্ঞী এবং সম্রাট কোয়াংশু উভয়েই উয়ান সি-কাইএর সাহায্য লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি যে পক্ষে যোগ দিবেন, জয় তাঁহারই নিশ্চিত। সম্রাট কোয়াংশু আপনার ক্ষমতা এবং স্বাধীনতার রক্ষার জন্য তাঁহার উপরই নির্ভর করিতেছিলেন; কিন্তু উয়ান সি কাই সম্রাটের দুর্ব্বলতা জানিতেন, সেইজন্য তিনি সম্রাজ্ঞীর পক্ষই অবলম্বন করিতেছিলেন। সেই সময় হইতে সম্রাজ্ঞী উয়ান-সি-কাইএর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন।

১৯০০ সালের বিদ্রোহের সময়ও উয়ান-সি-কাই চীনদেশকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সে সময়ে পিকিন ও টিনমিনের বিদেশীগণের জীবন উয়ান-সি-কাই এবং তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদলের হস্তে ছিল। উয়ান-সি-সাই টিনমিনে গিয়া তত্রত্য বিদেশীয়

ছিলেন। তিনি দেখিলেন, উভয় দিকেই বিপদ। যদি আদেশ পালন করেন, তাহা হইলে শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, বিদেশীয়দিগের হস্তে কঠিন শাস্তি অবশ্যম্ভাবী; আর আদেশ না পালন করিলে বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর ক্রোধভাজন হইতে হয়। এই উভয় সঙ্কটে উয়ান-সি-কাই আপনার চতুরতায় রক্ষা পাইয়াছিলেন; সম্রাজ্ঞীর আদেশ অনুসারে তিনি টিনমিন অভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু এত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, যে ইতিমধ্যে বিদেশীয়গণের সাহায্যার্থ নূতন সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহারা নিরাপদ হইল। পরে বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী উয়ান-সি কাইএর বিচক্ষণতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি অধিকতর প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

বিদ্রোহ শান্তির পরে উয়ান-সি-কাইএর হস্তে দেশের শাসন ভার অনেক পরিমাণে আইসে। চারি বৎসর কাল তিনি অতিশয় বিচক্ষণতা সহকারে রাজকার্য্য চালাইয়াছিলেন এবং অল্পসময়ের মধ্যে দেশের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি সৈন্যবিভাগের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে উচ্চশ্রেণীর লোকে সৈনিকবৃত্তি হীন কার্য্য মনে করিত; উয়ান-সিং-কাই এই ভ্রান্ত সংস্কার দূর করেন। এখন চীনের সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানেরাও সৈনিক বিভাগে প্রবেশ লাভ মহাগৌরবজনক মনে করেন। উয়ান-সি কাই প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার স্থানে বর্ত্তমান সময়ের পুস্তক এবং পরীক্ষা প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিনি আপনার শাসন সময়ে পিকিনের রাজপথ সকলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার চেষ্টায় পিকিন সহরের অনেক উন্নতি হইয়াছে। রাজকীয় কার্য্যের জন্য তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বিদেশীয়গণের হস্ত হইতে শুল্কবিভাগের কর্ত্তৃত্ব উঠাইয়া লইয়া তিনি আপনার দেশীয় বিশ্বস্ত লোকের হস্তে সে ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। রুষ জাপান যুদ্ধের পরবর্ত্তী বন্দোবস্তের সময় তিনি অতিশয় দক্ষতার সহিত চীনের স্বার্থ এবং গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে তিব্বত সম্বন্ধীয় সন্ধি স্থাপনও তাঁহার কার্য্য। আপনার শাসনকালে উয়ান-সি-কাই চীনে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর ভিত্তি স্থাপন করেন।

উয়ান-সিং-কাইএর শাসন সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, অহিফেন-নিবারণ বিষয়ক ঘোষণা। উয়ান-সি-কাই অহিফেন সেবনের ঘোর বিরোধী। অহিফেনসেবীদিগকে তিনি আপনার ত্রিসীমায় আসিতে দেন না। তাঁহার অধীনস্থ কোনও সৈনিক বা রাজকর্ম্মচারী আফিং খায় জানিতে পারিলেই তিনি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিতেন। এইরূপ দৃঢ়হস্তে উয়ান-সি কাই চীন সাম্রাজ্যের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছিলেন। কিন্তু চারি বৎসর পরে ক্ষমতাপ্রিয় সন্দিগ্ধচিত্ত বৃদ্ধা সাম্রাজ্ঞী উয়ান-সিং-কাই অতিশয় শক্তিশালী হইতেছেন ভাবিয়া তাঁহাকে উত্তর চীনের সেনাপতি পদ হইতে অবসৃত করেন। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তিনি একপ্রকার নির্ব্বাসনেই ছিলেন। ঘটনাচক্র আবার তাঁহাকে চীন সম্রাজ্যের শীর্ষস্থানে আনিয়াছে। সম্রাটের অধীনে তিনি জাতীয় উন্নতির জন্য যে সমুদয় সংস্কারের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, আশা করা যায়, চীনপ্রজাতন্ত্রের দেশপতি হইয়া তিনি সেগুলি পূর্ণ করিবার অবসর পাইবেন। যদি এই কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে চীনবাসিগণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে এবং জগতের ইতিহাসে উয়ান-সি-কাইএর নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইবে। তাঁহার দ্বিতীয় ওয়াসিংটন নাম সার্থক ও গৌরবান্বিত হইবে।

অলৌকিক বীরত্ব।

কয়েক মাস হইল, ইংলণ্ডে টাইট্যানিক নামক এক খানি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাণী মেরী এই জাহাজের ভাসান ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই জাহাজের নির্ম্মাণ চাতুরী দেখিয়া সকলে বলিয়াছিল, "সোনার জলে ডুবিয়া যাওয়া সম্ভব, কিন্তু ইহার জলে

নিমজ্জিত হওয়া কখনও সম্ভব নয়।" এই জাহাজ দৈর্ঘ্যে ৫৮৮ হাত ও প্রস্থে ৬২ হাত ছিল। আরোহী ও নাবিকদের লইয়া সাড়ে তিন হাজার লোক ইহাতে বাস করিতে পারিতেন। প্রথম শ্রেণীর ৫৫০, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৪০০ ও তৃতীয় শ্রেণীর ৫০০ আরোহী একই সময়ে আহারে বসিতে পারিতেন, জাহাজে এমন প্রশস্ত স্থান ছিল। জাহাজের প্রথম ও দ্বিতীয় তলে ভ্রমণের পথ ছিল, এই পথ দুই মাইল দীর্ঘ। যে কোন আরোহী অবাধে এই দুই মাইল ভ্রমণ করিতে পারিতেন। জাহাজের মধ্যে এক বৃহৎ ব্যায়ামশালা, তাহাতে ব্যায়ামের সর্ব্বপ্রকার উপকরণ ও সজ্জা ছিল। তদ্ভিন্ন স্কোয়াস খেলিবার জন্য অন্য এক বৃহৎ গৃহ ছিল। জাহাজের মধ্যে স্নানের বিবিধ বন্দোবস্ত, কেহ টারকিস্ স্নান, কেহ তাড়িৎস্নান, কেহবা সন্তরণ বা অবগাহন স্নান করিতেন। স্নানাগারে উষ্ণ ও শীতল উভয় প্রকার জলের আধার। এই স্থানে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত উৎস হইতে অবিরাম জলধারা উৎসারিত হইত। স্নান করিয়া আরোহিগণ ভোজনাগারে যাইতেন, সে গৃহ অতি বৃহৎ ও সুন্দর এবং আবশ্যক সকল গৃহ সজ্জায় পূর্ণ। পৃথিবীতে যেখানে যত উৎকৃষ্ট ফল ও আহার সামগ্রী, সমুদয়ই আরোহিদিগের জন্য ভাণ্ডারে পূর্ণ ছিল। আহারান্তে আরোহিগণের তাম্রকূট সেবনের জন্য এক পৃথক গৃহ, তাহা মেহেগনি কাষ্ঠে নির্ম্মিত। জাহাজের বারান্দায় দাঁড়াইয়া অনন্ত সমুদ্রের সুনীল শোভা দেখা যাইত, বারান্দার রেলিং শোভন লতায় আচ্ছাদিত, তাহাতে কত সুন্দর ফুল ফুটিত। তাহার পর আরোহিগণ বৈঠকখানায় গিয়া পরস্পরের সহিত কথা কহিতেন। তাঁহাদের জন্য পাঠ ও লিখিবার গৃহ ছিল, তথায় নানা পুস্তক ও সংবাদ পত্র থাকিত ; বিনা তারে পৃথিবীর নানা দেশের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া জাহাজেই সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইত। পাঠ ও লিখিবার গৃহের বাতায়ন গুলি বৃহৎ, তাহার মধ্য দিয়া নীলসমুদ্রের অতুলন সৌন্দর্য্য নেত্রপথে পতিত হইত। ইহা ভিন্ন দরবারগৃহ, পরিচ্ছদাগার, শয়নাগার ছিল, যে দেশের যাহা সুন্দর, মনোরম ও তৃপ্তিকর, নিপুণ হস্তে তিলে তিলে সংগ্রহ করিয়া শিল্পিগণ এই অতুলনীয় অর্ণব প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ধনীদের সুখ, সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা সমুদয়ই এই জাহাজের আরোহিগণের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। গত ৪ঠা এপ্রিল টাইট্যানিক যাত্রীদের লইয়া যাত্রা করিবে বলিয়া প্রথম বাহির হইয়া যখন সাউদামটনের বন্দরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন নববধূ গৃহে আসিলে তাহাকে দেখিতে যেমন বন্ধুদিগের সমাগম হয়, তেমনি ইহাকে দেখিতে সমুদ্রতীরে শত সহস্র লোক সমাগত হইল। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু লোক এই জাহাজে চড়িয়া আমেরিকা বেড়াইয়া আসিতে ব্যস্ত হইলেন। সকলেরই প্রাণের ইচ্ছা, পৃথিবীর এই অদ্বিতীয় জাহাজের প্রথম যাত্রাতে তাহার আরোহী হইয়া অতি অল্প দিনে নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া ইতিহাসে এই বিখ্যাত যাত্রা স্মরণীয় করেন। তাঁহারা যে অর্থে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, সে অর্থে না হউক, অপর এক উন্নত মহত্তর ও হৃদয়-বিদারক শোচনীয় অর্থে টাইট্যানিকের এই মহাযাত্রা ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়াছে। গত ১০ই এপ্রিল বুধবার এই বিপুল অর্ণবপোত ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা অভিমুখে প্রথম যাত্রা করে এবং ১৪ই তারিখ অর্থাৎ গত ১লা বৈশাখ রাত্রি দুইটার সময়ে তুষার স্তূপের সহিত সংঘর্ষে ১৫৯৫ আরোহী ও নাবিকসহ আটলাণ্টিকের অতল জলে ডুবিয়া যায়। এমন বিপুলকায়, এমন দ্রুতগামী, এমন সুখস্বাচ্ছন্দ্যোপূর্ণ তরী পৃথিবীতে আর হয় নাই। ইহার নির্ম্মাণে প্রায় দুই কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল। আশা ছিল, ১৭ই এপ্রিল এই জাহাজ আমেরিকায় উপনীত হইবে, কিন্তু ১৪ই রাত্রি দুই ঘটিকার সময় প্রায় ষোলশত লোক লইয়া উহা সমুদ্রগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ও উন্নত দেশ, ইংলণ্ড ও আমেরিকা, কিন্তু ইহাদের মধ্যে এক অকূল মহাসমুদ্র থাকায় পরস্পরের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা দূর করিবার জন্য

নিত্য নূতন উন্নত প্রণালীর জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছে এবং নূতন নূতন গন্তব্য পথও বাহির হইতেছে। সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা কে আগে যাইতে পারে। এপ্রিল, মে ও জুন মাসে ইয়োরোপ ও আমেরিকার অনেক লোক দেশ ভ্রমণে বাহির হন এবং এই সময়ে দ্রুতগামী জাহাজ সকলও শীঘ্র যাইবার জন্য আটলাণ্টিকের উত্তর দিকের পথ দিয়া যাতায়াত করে। বসন্তকালে আটলাণ্টিকের যে সকল প্রসিদ্ধ যাত্রীজাহাজ গমনাগমন করে, তাহাদের মধ্যে কে আগে যাইতে পারে, তাহা লইয়া ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়। যে সকল প্রসিদ্ধ জাহাজ কোম্পানী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে প্রতিযোগিতা করেন, তাহাদের মধ্যে কানার্ড, হোয়াইট ষ্টার ও হাম্বার্গ আমেরিকা লাইন প্রধান। ইহাদের প্রত্যেকের এই পথের জন্য দুই খানা করিয়া জাহাজ আছে। হোয়াইট ষ্টারের অলিম্পিক ও টাইট্যানিক আর সকলকে পরাস্ত করিয়াছে। এবারে আমেরিকার অনেক ধনকুবের এই জাহাজে চড়িয়া বাটী ফিরিবেন বলিয়া ইংলণ্ডে বসিয়াছিলেন। হোয়াইট ষ্টার লাইনের চেয়ারম্যান মিঃ ইসমে স্বয়ং ঐই প্রথম যাত্রায় এই জাহাজে করিয়া আমেরিকা যাইতেছিলেন, তিনি স্বয়ং জাহাজের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সীমা ছাড়াইয়া আটলাণ্টিকের মধ্য দিয়া ক্রমে জাহাজ উত্তর পথ দিয়া ধাবিত হইল। রবিবার কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথি, সমুদ্র শান্ত, ঊর্দ্ধে অগণ্যনক্ষত্রখচিত আকাশ, নিম্নে আটলাণ্টিকের স্থির বারিরাশি দর্পণের মত প্রসারিত। রাত্রে আহারের পর আরোহিগণ যে যাহার কক্ষে গিয়াছিলেন, কেহবা ধূমপান করিতেছিলেন, কেহ তাস খেলিতেছিলেন, কেহবা সঙ্গীত করিতেছিলেন। জাহাজ দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। কাপ্তেন মিঃ স্মিথ ও মিঃ ইসমে স্থির করিয়াছিলেন, ১৭ই জাহাজ নিউইয়ার্কে পৌঁছাইয়া দিবেন। উত্তর মেরুতে যে সকল বরফ পুঞ্জীভূত হয়, সেই সকল বরফস্তূপ ভাঙ্গিয়া উত্তর মহাসাগরে পতিত হয় এবং ভাসিতে ভাসিতে দক্ষিণে আসিতে থাকে, পরে উষ্ণ মণ্ডলে আসিয়া তথায় গলিয়া যায়।

টাইট্যানিকের অগ্রগামী কোনও জাহাজ অপরাপর জাহাজকে সতর্ক করিবার জন্য বিনা তারে এই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, যে নিকটে দুইটী প্রকাণ্ড বরফ স্তূপ ভাসিয়া আসিতেছে। এই সংবাদ পাইয়াই টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী কাপ্তেনকে জানাইলেন, কাপ্তেনও একজন লোককে মাস্তলের উপর হইতে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন, কিন্তু সে যখন বরফস্তূপ দেখিতে পাইল, তখন আর জাহাজ থামাইবার সময় ছিল না। চলিতে চলিতে রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় কিসে ধাক্কা লাগিল, ইহার প্রায় দশ মিনিট পরে জাহাজের ইঞ্জিন প্রভৃতি সমুদয় বন্ধ হইয়া গেল। তাহার কতক ক্ষণ পরে জাহাজে বিপদের ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিল। সকলে তাহা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তাহার পর কাপ্তেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি কহিলেন, "আরোহিগণ, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তোমরা সকলে কোমরবন্ধ পরিয়া ডেকের উপরে আইস।" তখন যিনি যেভাবে ছিলেন কোমরবন্ধ পরিয়া ডেকের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বরফস্তূপের সহিত ধাক্কা লাগিয়া জাহাজের তলদেশ ফাটিয়া প্রবল বেগে জাহাজে জল উঠিতেছিল এবং সেই শীতল জল ইঞ্জিনের বয়লারের সংস্পর্শে আসিয়া সমুদয় বয়লার ফাটিয়া গেল এবং জাহাজ খানি ২ই খণ্ড হইয়া গেল।

জাহাজের এই বিপন্ন অবস্থার কথা মার্কনী যন্ত্রের সাহায্যে চারিদিকে প্রেরিত হইতে লাগিল এবং ঘন ঘন হাউই ছোঁড়া হইতে লাগিল। আশা এই, যদি কোন সমুদ্রগামী জাহাজ সংবাদ পায়, তবে উদ্ধার করিতে আসিবে। কাপ্তান নাবিকদিগকে একে একে জালি নৌকাগুলি নামাইতে বলিলেন। জাহাজে আরোহী ও নাবিক সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৪০ ছিল, কিন্তু যে সংখ্যায় নৌকা ছিল, তাহাতে ৯০০ জনের অধিক লোক ধরেনা। সুতরাং সকলের প্রাণ রক্ষার উপায় ছিলনা। সকলে ডেকের উপরে সমবেত হইলে কাপ্তেন আদেশ করিলেন, "যাঁহারা পুরুষ, তাঁহারা পশ্চাতে সরিয়া যাউন, সর্ব্বাগ্রে শিশু ও

নারীদিগের বাঁচাইতে হইবে।" তখন স্ত্রীলোক ও শিশুদের তাড়াতাড়ী কিছু খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। ইহারা জালিনৌকায় অকূল সমুদ্রে ভাসিবে, তরঙ্গবেগে যে দিকে যায়, সেই দিকেই ভাসিতে ভাসিতে যাইবে। নৌকায় মানুষ যাইবার স্থান নাই, খাদ্য দ্রব্য কোথায় লইবে? এক একখানি জালিনৌকায় শিশু ও স্ত্রীলোকদের পূরিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হইল। স্বামী হইতে স্ত্রীকে, পিতা হইতে কন্যাকে, ভাই হইতে ভগিনীকে, পুত্র হইতে মাতাকে ছিনাইয়া লওয়া হইল। অনেক স্ত্রীলোক কিছুতেই স্বামীকে ছাড়িয়া নৌকায় উঠিলেন না। তাঁহারা পতির সহিত সহমৃতা হইবেন পণ করিয়া দৃঢ় ভাবে রহিলেন, নাবিকেরা কিছুতেই তাঁহাদিগকে পতির পার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। ১৮৫২ খৃ অব্দে ২৫এ ফেব্রুয়ারী উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে একখানি যুদ্ধপোত জলমগ্ন পর্ব্বতের সংঘর্ষে আসিয়া ডুবিয়া যায়। তাহাতে কর্ণেল সিটন প্রমুখ ৪:৮ জন যুদ্ধ কর্ম্মচারী সৈন্য ও নাবিকা জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। জলমগ্ন হইবার সময় ইহাদের প্রকান্ড গাম্ভীর্য্য ও অক্ষুব্ধ সাহস ইহাদিগকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

এই ভীষণ বিপদের সময় টাইট্যানিকের কাপ্তেন, নাবিক, কর্ম্মচারিগণ যে অলৌকিক বীরত্ব. অপরিসীম ধৈর্য্য, অকুণ্ঠ সাহস ও অমানুষ কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা জগতের বন্দনীয় হইয়া অমরলোকে প্রবেশ করিয়াছেন। কাপ্তেন স্মিথ যখন বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই, অদূরে মৃত্যুর ভৈরব হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের সকলকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তখন তিনি ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন না। কিন্তু নিমেষে আপনার কর্ত্তব্য বুঝিয়া ধীর ও স্থির ভাবে তাহা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। আরও আশ্চর্য্যের কথা এই, এই মহা মুহূর্ত্তে, এই জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে একজন আরোহীও আপনার জীবন বাঁচাইতে লজ্জাকর ব্যবহার করেন নাই। এই জাহাজে বহু ধনকুবের ছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় ধনী কর্ণেল অ্যাষ্টর প্রভৃতি আমেরিকার অনেক কোটী পতি ছিলেন। ইচ্ছা করিলে অগণ্য ধনরত্ন দিয়া তাঁহারা আপনাদের প্রাণ বাঁচাইতে পারিতেন, কিন্তু ধন্য তাঁহাদের চিত্তের মহাসম্পদ, মৃত্যুকে সম্মুখীন দেখিয়াও তাঁহারা বিচলিত হইলেন না, ঘৃণিতরূপে আপনাদের বাঁচাইতে চাহিলেন না।

আমেরিকার ধনকুবের কর্ণেল অ্যাষ্টর এবং যুক্ত রাজ্যের সভাপতি মিঃ টাফটের এডিকং মেজর বাট এই দুইজনে অনেক স্ত্রীলোককে নৌকায় উঠাইয়া দিলেন। অ্যাষ্টর আপন পত্নীকে ও অনেক পীড়িতা ও ভয়কাতরা দরিদ্র নারীকে নৌকায় উঠাইয়া দিলেন এবং শেষ পর্যান্ত অসীম উৎসাহে এই রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। কিন্তু আপনার প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিলেন না। একজন স্ত্রীলোক কিছুতেই স্বামীকে ছাড়িয়া যাইবেন না। স্বামী তখন বলিলেন, "বাড়ীতে আমাদের অসহায় সন্তানেরা রহিয়াছে, তাহাদের মুখ মনে করিয়া তুমি আপনাকে বাঁচাও।" তখন সন্তানের কথা ভাবিয়া মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে নৌকায় উঠিলেন। সত্তর জন স্ত্রীলোক স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া নৌকায় উঠিলেন, তাঁহাদের স্বামীরা তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, নিমেষ মধ্যে সত্তর জন স্ত্রীলোক বিধবা হইলেন। জাহাজ ডুবিতে আরম্ভ হইলে কাপ্তেন স্মিথ মিঃ ফিলিপ নামক এক যুবককে মার্কনী যন্ত্রে চারিদিকে সংবাদ প্রেরণ করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যুবক আপনার ক্যাবিনে বসিয়া একাগ্রমনে কাপ্তেনের আদেশ পালন করিতেছিলেন, জাহাজ ক্রমে ডুবিয়া আসিল। এই সময়ের বহু দূরে কার্পেথিয়া নামক জাহাজ সংবাদ পাঠাইল, "তোমাদের উদ্ধারের জন্য আসিতেছি।" যুবক যন্ত্র ছাড়িয়া যাইবার আদেশ পান নাই, সুতরাং স্থিরভাবে বসিয়া আপনার কার্য্য করিতে লাগিলেন। যুবকের ক্যাবিনে জল আসিল, কাপ্তেন আসিয়া বলিলেন, "যুবক, তোমার কর্ত্তব্য করিয়াছ, এখন প্রাণ রক্ষা কর।" ইঁহার প্রাণ রক্ষা

হয় নাই। তোমরা অনেকে ইংরাজ বালক কাসাবায়েঙ্কার কর্ত্তব্য নিষ্ঠার কথা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছ, আমরা এই দুর্ঘটনায় আর এক কাসাবায়েঙ্কা দেখিয়া লইলাম। কেবল এক জন নহে, নাবিক ও জাহাজের সকল কর্ম্মচারী যাহার যেখানে যে কাজ, সে তথায় দাঁড়াইয়া অটল সাহসে আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে, তাহার পর অক্ষুব্ধচিত্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এবং প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। কেবল নাবিক কাপ্তেন ও জাহাজের কর্ম্মচারী সকলে নয়, জাহাজের আরোহিগণের মধ্যে কোটিপতি হইতে ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত কেহই বাঁচিবার জন্য লজ্জাকর কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। বিলাস, সুখ ও ঐশ্বর্য্যে বর্দ্ধিত হইলে মানব মনের মহৎ গুণগুলি বিলুপ্ত হইয়া যায়, একথা আমরা বাল্যাবধি শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু সেই কোটিপতি কর্ণেল আষ্টার ধন্য, যিনি আপনি বাঁচিবার চেষ্টা না করিয়া অনেক দরিদ্র লোকদের বাঁচাইবার উপায় করিয়া দিয়া শেষে আপনি মরিলেন।

আর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। জাহাজ ডুবিয়া গেলে যাহারা সাঁতার জানিত, সাঁতরাইয়া বোটের নিকটে আসিল, যাহারা বোটে ছিল, তাহারা প্রাণপণে অনেককে টানিয়া তুলিল এবং যতক্ষণ মানুষ ধরে, ততক্ষণ মজ্জমান ব্যক্তিদের উঠাইতে লাগিল; শেষে যখন আর স্থান নাই তখন মজ্জমান ব্যক্তিরা হাত তুলিয়া বলিল, "আর নয়,আর তোমাদের বিপন্ন করিব না,ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুন, আমাদের বিদায় দাও।" বোটে ও ভেলায় যাহারা ভাসিয়াছিল, তাহারা পিঠে পিঠ দিয়া ঠেসাঠেসি হইয়া বসিয়াছিল। রাত্রি প্রভাতে যখন কার্পেথিয়া জাহাজ ইহাদের উদ্ধার করিতে আসিল, তখন ইহারা কেহ মুখ ফিরাইয়া সে জাহাজের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে নাই, পাছে মুখ ফিরাইলে নৌকা উল্টাইয়া যায়। স্মিথের একজন সহকর্ম্মচারী স্ত্রীলোকদিগকে শেষ নৌকায় তুলিয়া দিয়া সেই নৌকার নাবিককে বলিলেন, "আমার স্ত্রীকে গিয়া বলিও, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়া মরিয়াছি।" সকল কর্ত্তব্য যখন শেষ হইল, তখন কাপ্তেন স্মিথ জাহাজের মাস্তুলের নিকটে যে সেতু, তাহার উপর দাঁড়াইয়া নাবিকদিগকে একত্র করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কাপ্তেন ঈশ্বরের চরণে শেষ প্রার্থনা করিলেন, নাবিকগণ বাদ্যযন্ত্র যোগে Mrs. Adamsএর সুবিখ্যাত সঙ্গীত Nearer My God to Thee গাহিতে লাগিল। তাহার কয়েক চরণের অর্থ এই "দিনের আলোক সম্পূর্ণ নিবিয়া গেলে সীমাহীন প্রান্তরে পথহারা হইয়া যদি আমায় কেবল শিলাতলে শয়ন করিতে হয় এবং নিশার অন্ধকার আসিয়া আমায় আচ্ছন্ন করে, তথাপি স্বপ্নাবস্থাতেও হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকিব। তথায় অমরলোকে যাইবার সোপানশ্রেণী প্রকাশিত হউক এবং এত দিন দয়া করিয়া তুমি আমায় যাহা যাহা প্রেরণ করিয়াছ, সেই সকল তোমার নিকটে, আরও নিকটে অগ্রসর করিবার পক্ষে দেবদূত হইয়া আমাকে সঙ্কেত করুক। আর যদি পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া আমি অনন্ত গগনে উত্থিত হই এবং সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা সকলই ভুলিয়া অসীম ঊর্দ্ধে উড্ডীন হই, তথাপি হে ঈশ্বর, তোমার নিকটে, আরও নিকটে এই গীতই আমার উত্থিত হইবে।"

নক্ষত্রখচিত অনন্ত অম্বরতলে সেই কৃষ্ণ পক্ষের গভীর নিশীথে দশদিক মথিত এবং শত শত প্রাণ আলোড়িত ও উদ্বেলিত করিয়া এই মহা সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। সেই মহারজনীতে ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ তাহার অগণ্য তারা লইয়া আর নিম্নে অনন্ত অকূল সিন্ধু নিস্তব্ধ হইয়া প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে এই মহা গাথা শুনিল। জগতে এমন ভীষণ মুহূর্ত্তে এই মহাসঙ্গীত আর গীত হয় নাই, আর হইবেওনা। দিক্ সকল শত শত তারকা চক্ষু মেলিয়া এই পবিত্র দৃশ্য দেখিল, তাহার পর অর্ণব পোত এই মহাপ্রাণ মানবদের লইয়া আটলাণ্টিকের সেই অংশকে জগতের মহাতীর্থে পরিণত করিয়া চিরতরে বিলুপ্ত হইল।

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিয়ে দেওয়া গেল।

১। M.

২। মেঘ।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,—

শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতির্ভূষণ দত্ত, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীজ্যোতিন্দ্রনাথ বসু, শ্রীরণধীরকৃষ্ণ রায় দস্তিদার, শ্রীহরিপদ পাল, শ্রীদেবপ্রসাদ দত্ত, শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী, শ্রীমতী শৈলবালা চন্দ, শ্রীঅমিয়কান্ত চৌধুরী, শ্রীমতী স্নেহসুধা গুপ্ত, শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, শ্রীবিনোদলাল নন্দী, শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র বসু, শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীঅশ্বিনীকান্ত বসু, শ্রীমতী ইন্দুময়ী বসু, শ্রীমতী মুক্তকেশী সিংহ, শ্রীমতী মৃণালিনী দত্ত, শ্রীঅমলেন্দু গুহ, শ্রীসুধানলিনীকান্ত দে, শ্রীআকতার উদ্দিন আহম্মদ, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীকাজি তৈয়ের আলি, শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতুষাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, The students of the 2nd class, Sir R. C. Mittra's School, Bishnupur. কুমারী সুষমা বসু, শ্রীব্রজেন্দ্রলাল দত্ত, শ্রীসুপ্রিয়কুমার ধর, শ্রীতারকদাস ঘোষ, শ্রীদেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র খাঁ, শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ, শ্রীরমেশচন্দ্র মাইতি, শ্রীপ্রেমনীহার রায়, শ্রীমতী হেমনলিনী মজুমদার, শ্রীপুলিনবিহারী গুপ্ত, শ্রীমতী নুরমাহাল বেগাম, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, I. S. Ghaznaui, Esqr. শ্রীপরিমল গোস্বামী, শ্রীদেবব্রত সেন, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সেন, শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ, শ্রীহিরণ চন্দ্র রায়, শ্রীগিরিশচন্দ্র দে, শ্রীধরণীধর চৌধুরী, শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, R. K. Dutta, Esqr. মুকুল, শ্রীমতী অমিয়বালা সিকদার, শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ, শ্রীরাধাচরণ দাস, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার সাহা, The students of third Class, Mathabhanga H. E. School, শ্রীনিখিলনাথ রায়, শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ, শ্রীগিরীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীমতী বনকুল দত্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ শাসমল, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দাস, শ্রীহিমাদ্রিকুমার শর্ম্মা, শ্রীজিতেন্দ্রকুমার চন্দ্র, শ্রীসূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী আশা সরকার, শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীনরেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীগোপালচন্দ্র বস, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীদেবেন্দ্র মোহন লাহিড়ী, শ্রীখলিলুর রহমান সরকার, শ্রীশিশির কুমার দত্ত, শ্রীনলিনকুমার বসু, শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে, শ্রীপ্রীতিন্দ্র কুমার হালদার শ্রীপ্রদোষ চন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীকেদার চন্দ্র দাস, শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী, শ্রীমনন কুমার মিত্র, শ্রীমিহির কুমার মৈত্র, শ্রীবঙ্কিমবিহারী বসু, শ্রীনীরজনাথ ঘটক, শ্রীমনুজনাথ ঘটক, শ্রীহরপ্রসাদ বাগচী, শ্রীসরোজনাথ ঘটক, শ্রীকুমার প্রমোদেন্দ্র নারায়ণ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীমতী অবলী সান্যাল, শ্রীঅনিলবিহারী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী রেণুকা দত্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নূতন ধাঁধার সহিত উত্তর না পাঠাইলে সে ধাঁধা প্রকাশিত হয় না।

নূতন ধাঁধা।

১ হইতে ৪৯ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলিকে এক কোঠাকে সাজাও যে ১টি সংখ্যা দুইবার লিখিত হইবে না এবং প্রত্যেক দিকের যোগফল সমান হইবে।

নিজভূমিতে রাজ্য করে নাম তার রাজা
সৈন্য সামন্ত আছে নাহি তার প্রজা।
যুদ্ধেতে নিপুণ বড় অস্ত্র নাহি ধরে
দেহ আছে প্রাণ নাই কি কারণ মরে?

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেবালয়।

(দেবালয়-সমিতির নিজস্ব একখানি চৌতল বাটী আছে)।

উদ্দেশ্য ও বিশেষত্ব।

ধর্ম্মানুশীলন এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দেশ হিতৈষণা ও দান-ধর্ম্ম চর্চ্চা করা দেবালয় সমিতির উদ্দেশ্য। এই দেবালয়ে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সাধু ও ভক্ত মাত্রেরই বক্তৃতা করার ও উপদেশাদি প্রদান করিবার অধিকার আছে।

'দেবালয়' সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মিলন-মন্দির। সকল সম্প্রদায়ের সাধু ভক্তেরাই—'দেবালয়'কে নির্ব্বিরোধে তাঁহাদের নিজের নিজের সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন কোন একটী বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় কখনও এই 'দেবালয়'কে কেবল তাঁহাদের নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে বা অধিকার করিতে পারিতেছেন না।

এই "দেবালয়ের পূজা অর্চ্চনা," বক্তৃতা, আলোচনা বা উপদেশাদিতে এবং আলাপ ইত্যাদিতেও কেহ কখনও কোন ধর্ম্ম, ধর্ম্মমত, ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অথবা কোন সমাজ বা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া নিন্দা, বিদ্রূপ, ঠাট্টা ও উপহাসাদি এবং কখনও কাহারও প্রতি বিদ্বেষাত্মক বা অবসানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিবেন না এই 'দেবালয়ে'র সভা-সমিতিতে কখনও রাজনৈতিক বক্তৃতা ও আলোচনা হইবে না। 'দেবালয়ে'র উদ্দেশ্যের সহিত যাঁহার সহানুভূতি আছে, তাঁহারা সভ্য হইতে পারেন। সভ্য হইতে হইলে নিজের নিজের ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিতে হয় না। বার্ষিক চাঁদা ১।০ সিকা।

পাঠকগণ দেখিবেন দেবালয়ের একটু বিশেষত্ব আছে। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি স্বনাম ধন্য ব্যক্তিগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক।

দেবালয়-সভ্য-পদ গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক দেবালয় কর্ম্মস্থানে পত্র লিখিবেন। বার্ষিক চাঁদা ১।০ সিকা। "দেবালয় হইতে "দেবালয়" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। দেশের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ ইহার নিয়মিত লেখক। দেবালয় সমিতির সভ্য মাত্রই বিনামূল্যে এই পত্রিকাখানি পাইয়া থাকেন।"

দেবালয় কর্ম্মস্থান,
২১০।৩।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গল্প-লহরী।

সরযূবালা।

"ছাপা পরিষ্কার, মলাটে সোণালী অক্ষরের নামটি সুন্দর। এখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ; গল্পচ্ছলে নীতি উপদেশ। ভাষা সরল ও শুদ্ধ, গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক।"—প্রবাসী।

সিটিবুক সোসাইটি,
৬২ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকতা।

বঙ্গদর্শন।

মাসিকপত্র ও সমালোচন ১৩১১ সালের বৈশাখ হইতে ১২শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অগ্রিম বার্ষিক সর্ব্বত্র ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা।

মজুমদার লাইব্রেরী,
২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মুকুলের নিয়মাবলী।

১। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকে মুকুল পাঠান হয় না। ইচ্ছা করিলে প্রথম সংখ্যা কাগজ ভিপিতে পাঠাইয়া মূল্য আদায় করা যাইতে পারে। নমুনার জন্য ৵৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়

২। বৈশাখ মাস হইতে মুকুলের বৎসর আরম্ভ; বৎসরের মধ্যে যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে বৈশাখ হইতে কাগজ পাঠান হয়।

৩। বাঙ্গালা মাসের শেষ সপ্তাহে মুকুল বাহির হয়। কোনও মাসের কাগজ পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানান প্রয়োজন এক মাসের মধ্যে না জানাইলে অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য ৵০ আনা দাম লাগে।

৪। উত্তরের জন্য টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড পাঠাইতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন বা অন্য কোনও প্রয়োজনে পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করা প্রয়োজন

৫। অগ্রাহ্য রচনা ফেরত দেওয়া হয় না, যাঁহারা প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরৎ চান, তাঁহারা প্রবন্ধ প্রেরণের সময় তাহা লিখিবেন এবং ডাক মাশুল পাঠাইবেন।

স্বর্গীয় গৌরগোবিন্দ রায়।

১৮শ ভাগ]   জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।   [২য় সংখ্যা।

ইপিক্‌টেটাস্‌।

চৈত্র মাসের মুকুলে তোমরা এক জন রোমীয় সম্রাটের সংক্ষিপ্ত জীবনের কথা পড়িয়াছ, যিনি সাধনাগুণে অতি উচ্চ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। অদ্য আমরা আর এক জন রোমীয় সাধুর জীবনের কথা তোগাদের বলিব, যিনি অতি দরিদ্র ও শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াও স্বীয় চেষ্টায় উচ্চ জীবনের দুর্লভ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনুমান ৫০ খৃষ্টাব্দে ফেরিজিয়ার অন্তর্গত হিরাপোলিস নগরে ইপিক্টেটাস্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার জীবনের কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ইপিকৃটেটাস কথার অর্থ ক্রীত, অর্থাৎ যাহাকে কিনিয়া আনা হইয়াছে। ইঁহার জনক জননী ঘোর দরিদ্র ছিলেন, তাঁহারা অর্থের জন্য রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ পুত্রকে রোমীয় সম্রাট নিরোর এক সভাসদের নিকটে বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই প্রভুর গৃহে ইপিকৃটেটাস্ বহু ক্লেশে বাস করিতেন। সে সময়ের রোমান প্রভুগণ অতিশয় ক্রূর প্রকৃতি ছিলেন। এরূপ কথিত আছে, যে এক বার তাঁহার প্রভু লৌহনির্ম্মিত যন্ত্র বিশেষ দ্বারা তাঁহার এক খানি পদ পেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই অসহ্য যাতনায়

পড়িয়া ইপিক্‌টেটাস্ ধীর ও প্রশান্তভাবে কেবল কহিলেন, "এরূপ করিলে আমার পা খানি ভাঙ্গিয়া যাইবে।" প্রভু নিরস্ত হইলেননা, অবশেষে চরণখানি সত্যসত্যই ভাঙ্গিয়া গেল। ইপিক্‌টেটাস্ পূর্ব্বের মত ধীরভাবে কহিলেন, "আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম।"

এইরূপ শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও ইপিক্‌টেটাস্ ঈশ্বর প্রসাদে উন্নত জীবনের আলোক লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখনকার রোমান ধনাঢ্যগণ আপনাদের জ্ঞান কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য বুদ্ধিমান দাসদিগকে অর্থ ব্যয় করিয়া নানা শাস্ত্রে পারদর্শী করিতেন। ইপিক্‌টেটাস্ বিকলাঙ্গ ও খঞ্জ ছিলেন বলিয়া শারীরিক শ্রম করিতে পারিতেন না। এইজন্য তাঁহার প্রভু ষ্টোইক দর্শন শাস্ত্রে পারদর্শী করিতে তাঁহাকে এক উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে পাঠাইয়া দেন।

এই শিক্ষক অতি উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে যে সকল উপদেশ দিতেন, আপনার জীবনেও তাহা পালন করিতে সর্ব্বদা উৎসুক ছিলেন। এই উন্নতমনা তত্ত্বজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষাধীনে ইপিক্‌টেটাসের চিত্তের উন্নত বৃত্তি সকল বিকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার মনে নিত্য উন্নত চিন্তা আবির্ভূত হইয়া তাহাকে রাজোচিত সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছিল। তিনি প্রভুর গৃহে প্রচুর সম্পদ ও তাহার চির সহচর সুখাসক্তি এবং অন্যান্য দোষের পূর্ণ বিকাশ সর্ব্বদা দেখিতেন, এই জন্য অল্প বয়সেই পার্থিব সুখ ও সম্পদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা জন্মে। তাঁহার মন সর্ব্বদাই সংসারের পশ্চাতে যে জীবন প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার দিকে ধাবিত হইত এবং শরীর দাসত্বে বদ্ধ থাকিলেও মন মুক্তপক্ষ পক্ষীর মত তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চ আকাশে নিত্য বিহার করিত।

উত্তর জীবনে ইপিক্‌টেটাস্ দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কি কারণে ও কি উপায়ে তাঁহার মুক্তি ঘটে, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; কারণ তিনি শারীরিক শ্রম করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না এবং বাল্যাবধি পরাধীন থাকিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা সংগ্রহের শক্তিও তাঁহার ছিল না, এই জন্য বন্ধুগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে জীবন ধারণ করিতে হইত, কিন্তু তাঁহার অভাব যেরূপ যৎসামান্য ছিল, তাহাতে পরের মুখাপেক্ষী হওয়াতে তাঁহার লজ্জিত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না।

এক খানি যৎসামান্য কুটীরে ইপিক্‌টেটাস বাস করিতেন, তাহার কোন অর্গল ছিল না। এক খানি খড়ের বিছানা ও একটি মৃৎপ্রদীপ ইহাই তাঁহার তৈজসসামগ্রী ও ঐহিক সম্বল ছিল। একবার ইপিক্‌টেটাস একটি লৌহ প্রদীপ ক্রয় করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার গৃহ বিগ্রহের সম্মুখভাগে জ্বলিত। একদিন রাত্রে চোর আসিয়া প্রদীপটী চুরি করিয়া লইয়া গেল। পরদিন এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইপিক্‌টেটাস তাঁহার বন্ধুদিগকে সহাস্যমুখে কহিলেন, "এবার চোর আসিলে বড় অপ্রস্তত হইয়া ফিরিয়া যাইবে, কারণ এবার লোহার প্রদীপের পরিবর্ত্তে মাটির প্রদীপ কিনিয়া আনিয়াছি।" এইরূপ ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিলেও ইপিক্‌টেটাসের মনে বৈরাগ্য দেখাইবার ইচ্ছা বা সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি বলিয়া অভিমান ছিল না। এক শ্রেণীর সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন থাকিয়া মনে করেন, নিস্পৃহতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলাম; কিন্তু ইপিক্‌টেটাস সে প্রকৃতির ছিলেন না, তিনি শিষ্যদিগকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, যাহারা অপরের পক্ষে পীড়াদায়ক হইবে বলিয়াও দেহ পরিষ্কার রাখিতে প্রস্তুত নয়, লোকালয় তাহাদের জন্য নহে, তাহারা হয় বনে, নতুবা নির্জ্জনে আপনাকে লইয়া থাকুক।"

ইপিক্‌টেটাসের সময়ে শিশুহত্যা প্রচলিত ছিল। তাঁহার পরিচিত এক ব্যক্তি তাহার নবজাত শিশুকে প্রান্তরে ফেলিয়া দিয়া যায়। ইপিকটেটাস তাঁহার সমসাময়িক দার্শনিকদিগের মত শুষ্ক হৃদয় ছিলেননা; তিনি সেই শিশুকে সযত্নে গৃহে আনিয়া এক বৃদ্ধা নারীকে তাহার লালন পালনে নিযুক্ত করেন।

ইপিক্‌টেটাসের জীবন চরিত সম্বন্ধে আর কিছু

জানা যায়না। তাঁহার শিষ্য আরিয়ান তাঁহার একখানি জীবন চরিত লিখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা নাই। সম্রাট ডেমিসিয়ান এক আদেশ বাহির করেন, যে কোন দার্শনিক ইটালীতে থাকিতে পারিবেননা; তদনুসারে তাঁহাকে স্বদেশ ত্যাগ করিতে হয়। রাজাজ্ঞা পাইয়া তিনি ইপাইরসের অন্তঃপাতী নিকোপোলিস নগরে গিয়া বাস করেন, তথা হইতে আর রোমে প্রবেশ করিতে পাইয়াছিলেন কি না, জানা যায় না; কিন্তু শেষ জীবনে অনেক বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনৈতিক পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধা প্রীতি ও বন্ধুত্ব এবং সম্রাট হাড্রিয়ানের নিকট সম্মান এবং অনুগত ও অনুরক্ত শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার দিন যে সুখে কাটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মৌমাছির গান।

বনে বনে বেড়াই মোরা
ক'রে মধু পান,
ফুলে ফুলে শুনাই কত
প্রাণ জুড়ান গান।
মনের সুখে আকাশ পানে
যাই সব উড়ে,
ছোট্ট পানা ধরা খান
দেখি কেমন দূরে!
নাইক সেথা কেমন আহা
কোনই গণ্ডগোল
অত দূরে উঠে নাক
মানুষের রোল।
মুক্ত পথে বহে কিবা
মধুর সমীরণ
ভবের শোভা দেখে আহা
জুড়ায় প্রাণমন॥

শ্রীঅতুলচন্দ্র সিংহ

অনাথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"দিদি তাই তোর জন্যে আমার দুক্খু হত।" এই বলে বীরেন দুহাত দিয়ে করুণাকে জড়িয়ে ধরলে। আজ দুদিন হল তারা দুই ভাই বোনে দেওয়ানজীর বাড়ী এসে পৌঁছেছে, মোক্ষদা দিদির আদর যত্নে একেবারে ঘরের ছেলে হয়ে গিয়েছে। দেওয়ানজী মহাশয়, মোক্ষদা দিদির বোন ঝি সুকুমারী কারো সঙ্গে আর ভাব হতে বাকী নেই। ছেলেদের সঙ্গে এখনও ভাল করে আলাপ পরিচয়ের সুবিধা হয়নি, তারা অধিকাংশ সময় পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে আর পাঠশালায় কাটায়, বাড়ী ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়, তখন আর তেমন খেলা জমেনা।

শোভনা ভাই বোনদের দেখতে এখনও আসতে পারেনি, তার সর্দ্দি লেগেছিল' তাই রাণী মামী তাকে আসতে দেননি। কিন্তু করুণা যখন চলে আসে, শোভনা তার গলা ধরে এত কাতর হয়ে কেঁদেছিল, যে তা দেখে রাজামামার চোখ জলে ভরে এসেছিল।

বীরেন ও করুণা দেওয়ানজীর বৈঠকখানার একটা বড় চৌকিতে একত্রে বসেছিল। মোটা মোটা হাত দুখানি দিয়ে করুণাকে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর মাথা রেখে বীরেন মহা সুখে বসেছিল, করুণা তার মাথায় আর মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, আর ভাবছিল, ছোট এক মাত্র এই ভাইটি তার কত আদরের। একটু পরে বীরেন বল্লে "দিদি, মেজদিকে ভাল বলতে হবে, তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে, আমাদের কাছে আসতে দিয়ে, নিজে দুষ্টু মামার কাছে আছে। আমি ভাবিনি মেজদিদি এত ভাল হতে পারে, আর তাকে স্বার্থপর বলব না।"

"সত্যি মাণিক, আর বোলনা, তবে মামাত দুষ্টু নন, তিনি খুব ভাল, খুব দয়ালু; তাঁরা শোভনাকে বেশী ভাল বাসলেন, সব দিকেই ভাল হ'ল, তবে এসব কথা তুমি যেন কিছু ব'ল না!"

"কেন বলব না, বল ভাই।"

করুণা একটু থতমত খেয়ে গেল। এর আগে কোন

কথা বলতে হলে, বীরেনকে সে খুঁটী নাটি করে সব বুঝিয়ে দিত, এখন যে কিছু বলতে পারবে না, একটা মিথ্যার ভান করতে হবে, এই কথাটা কাঁটার মত তার মনে বিঁধতে লাগল। করুণাকে কিছু বলতে হল না, বীরেনই বল্‌তে লাগল, তাহলে আমাদের তো ভালই হল, তোমাকে ছেড়ে মেজ দিদিকে কে চায়। তবে রাজা বাবুত তাকে জানেন না, আমি বেশ জানি, মেজ দিদি কিন্তু এক এক সময় খুব ভালও হতে পারে। দিদু, আমি একটা কাণে কাণে কথা বলব, তুমি কাউকে বলবে না?" কি কথা"—করুণা জানত বীরেনের সব গোপন কথা হচ্ছে, সে কি নতুন কল কারখানা তৈয়ারি করবে, কোন্ অদ্ভুত বুদ্ধি তার মাথায় জাগছে তারি বিষয় হবে।

বীরেন বল্লে, "মাসিমা আমাকে খাবার সময় কি বলেছিলেন শুনেছিলে? আমিও রাম দাদাদের মত ছোট বাগান তৈয়ারি করতে পারি?" "তাত হ'ল তাই কি?" "বীজ হতে মস্ত গাছ হয়, তাত জান? বট ফলের দাম কিছু নয়, কুড়িয়ে আনলেই হ'ল। আমি রাম দাদার সঙ্গে কথা বলছিলাম, সে আমার চেয়ে বড়, তার বয়স সাড়ে আট বৎসর। এই বট ফল যদি আমরা কুড়িয়ে এনে গাছ লাগাই, অনেক গাছ হবে, আর সে গুলি বিক্রী করে অনেক টাকা বাবাকে দিতে পারব।" "বীরভদ্র তুই কি করবি বলনা," "আমি—আমি অনেক কুড়িয়ে এনে আমার বাগানে লাগাব, জল দেব, যত্ন করব, তার পর বড় হয়ে মস্ত জঙ্গল হবে, তাতে কিন্তু বাঘ থাক্‌বে না, তোমাতে আমাতে বেড়াব। আমি যখন বড় হব, তখন তারি পাশে বাড়ী করে দুজনে বেশ মজা করে থাকব, কেমন দিদি?" করুণা অনেক কষ্টে হাসি সম্বরণ করে বল্লে, "সে অতি চমৎকার হবে। বীর বাবু, এত বুদ্ধি তোমার মাথায় গজ গজ করছে, তা কে জান্‌ত বল!" বলে বীরেনের মাথাটা এক বার নাড়িয়ে দিলে!

"দিদি আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে। আমি কি দাদাদের সঙ্গে স্কুল যেতে পাবনা? স্কুলে পড়তে কি অনেক খরচ লাগবে?"

"আমার বোধ হয় রাজা বাবু খরচের জন্যে কিছু মনে করবেন না। কিন্তু বীর বাবু, স্কুলে যাবার পক্ষে তুমি যে এখনও বড় ছোট, লক্ষ্মণ সাত বৎসরের তাও মাসিমা তার স্কুল যাওয়া ঠিক মনে করেন না।"

"আমি কোথায় ছোট? আমি পড়া শিখতে চাই। তবে খোকাবাবু আর টুনির মত কে স্কুদিদির কাছে পড়বে? ও আমার ভাল লাগে না। লক্ষ্মণের আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে, আমি মা জননীর কথা সব তাকে বলেছি, তার খুব দুঃখ হয়েছে। ওরা আমাকে একেবারে বোকাবাবু ভেবেছিল, এখন কিন্তু বুঝতে পেরেছে!"

"হ্যাঁ ছেলেরা ভাল, বড় হুড়োহুড়ি করে, ওদের জুতার বড় ক্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ হয়, তোকে আশা করি, অমন জুতো কখনো পরতে হবেনা। জানত, মা জননী চাইতেন, তুমি সব বিষয়ে ভদ্র নম্র ভাল হবে, অমন লাফালাফি করা দোষ, জানালায় চড়ে লাফান, চীৎকার করে কথা বলা, তুমি কখনো করবে না, বাবা কি অমন করেন?"

"তাই বলে আমাকে ওরা আহ্লাদে গোপাল, ননীর পুতুল বলে ডাকবে, তুমি তাই চাও? তবে আমি চেঁচামেচি করব না, একটু আগে লক্ষ্মণ আমার হাতে এমন জোরে চিমটি দিলে, আমি কিছু করেছি?"

ওদের স্কুলের ফুটবল খেলার সর্দ্দার শ্যামাপদ বাবুকে দেখত, অবাক হয়ে যাও। তিনি আমায় হাত ধরে উঠিয়ে ঘুরপাক দিলেন, আমি, কি কাঁদলাম? কিছু না, তিনি তাই আমাকে বল্লেন এটা একটা মানুষ।" "তোমার শ্যামাপদ বাবু ত বড় বীর, তোমার মত ছোট ছেলেকে কষ্ট দিলে, আমার শুনে ভারী রাগ হচ্ছে!"

বীরেন বুক ফুলিয়ে বল্লে "পরোয়া কি, আমি বুঝি ভীতুরাম কাঁদুবাবু? ঐ দেখ, খাবার জন্যে ডাকতে আসছে, চল' দিদি ভাই, চল।"

দেওয়ানজীর ছেলেরা লাফাত, ঝাঁপাত, চেঁচাত, সত্যি, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন নীচতা ছিল না। দুদিনেই এই নতুন অতিথিদের আপন ভাইবোনের মত করে নিয়েছিল। খাবার জিনিস পেলে ভাগ করে খেত, ভাল
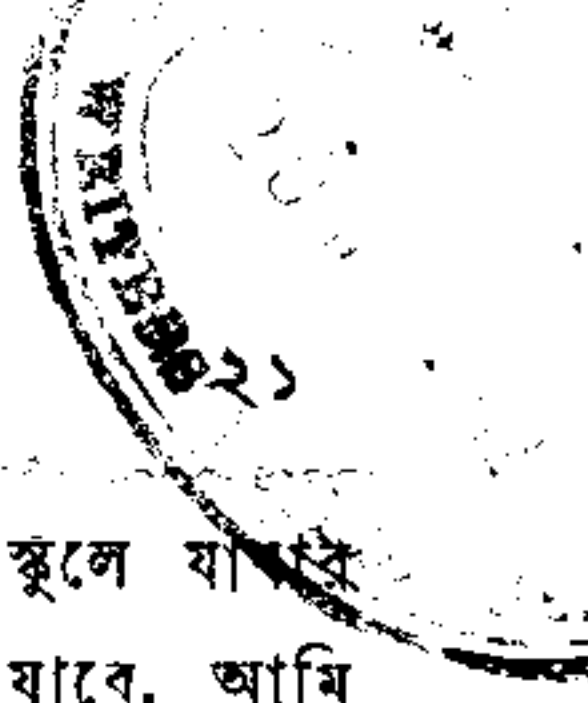
জায়গাটি, বড় পাথর খানি ওদের জন্যে ছেড়ে দিত, আর বীরেন, খুকুকে সবাই খুব আদর করত।

সকালে ছেলেরা সবাই দুধ আর ঘরে তৈয়ারি মোহন ভোগ খেত। দেওয়ানজী মহাশয়, মোক্ষদা দিদি সবাই উপস্থিত থাকতেন, খেতে বসবার আগে সকলের সমবেত প্রার্থনা হত, তার পর খাওয়া। এগারটি ছেলেকে থাইয়ে পরিয়ে লিখিয়ে প'ড়িয়ে মানুষ করাতো সহজ কথা নয়, তবে দেওয়ানজীর বাড়ীতে সবই খুব সাদা সিধে ভাবে চলত। ঘরের গরুর দুধ, বাগানের তরকারী ফল, পুকুরের মাছ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সবাই খেতে পেত। ছেলেরা বাগানময় খেলা করে বেড়াত। সবাইকে বাগানের কাজ করতে হ'ত, ফল তরকারী দেখে শুনে উঠিয়ে আনতে হত। ভবিষ্যতে ছেলেরা যাতে সুস্থ, সৎস্বভাব হয়, সেই বিষয়ে দেওয়ানজী মহাশয়ের খুব দৃষ্টি ছিল। আর তাঁর সদানন্দ প্রকৃতি, উদার স্বভাব, প্রতিদিনের কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ছেলেদের পক্ষে খুবই ভাল দৃষ্টান্ত ছিল। প্রার্থনার পর সবাই আপনার ছোট ছোট কুশাসনে বসলে মোক্ষদা দিদি বাটীতে দুধ, সুকুমারী ছোট ছোট রেকাবী করে মোহন ভোগ দিয়ে গেলেন।

দেওয়ানজী, বল্লেন "রাজা বাহাদুর যদি মত করেন, তাহলে বীরেনের স্কুলে পড়তে যাবার ঠিক্ করব। বীরেনবাবু, সুকুমারী দিদি আরো পরীক্ষা করে দেখবেন, তুমি কতদূর কি জান, তার পর স্কুল যাওয়া!"

বীরেন ভদ্র নম্র অথচ স্পষ্টস্বরে বল্লে, "আমি কিন্তু কালই যেতে চাই।" বড় ছেলেদের মধ্যে এক জন বল্লে, "একবার গিয়ে দেখ, তার পর আর যাবার অত তাড়াতাড়ি থাকবে না।" বিশেষ, যদি একবার মাষ্টার মহাশয়ের বেতের সঙ্গে পরিচয় হয়!"

দেওয়ানজী হেসে বল্লেন "গুরুনিন্দা মহাপাপ।" "বাবা, বেত কি মাষ্টার মহাশয়?" সবাই হেসে উঠিল!

দেওয়ানজী বল্লেন "বীরবাবু, যদি সুকুমারীর অঞ্চল আশ্রয় করতে এত নারাজ হয়, তাহলে সুকুমারী খুব দুঃখিত হবে তা মনে হয়না, কি বল সুকু?" ""হ্যাঁ মেসমশায় বীরেন গেলেও' আমার কাজের অভাব হবেনা। মোক্ষদা দিদি বল্লেন, "বীরেনের স্কুলে যাবার কাপড় তৈরি হয়ে আসুক, তবে ত যাবে, আমি দরওয়ানকে বলে দিয়েছি, অখিল দর্জ্জিকে একবার ডেকে আনবে।" লক্ষ্মণ বল্লে, "অমন ফুলবাবু বরটি সেজে গেলে ছেলেরা নাকালের এক শেষ করবে।"

করুণা বসে বসে ভাবতে লাগল, তার আদরের ছোট ভাইটি, দুদিন পরে কি দেওয়ানজীর ছেলেদের মত অম্নি গোঁয়ার গোবিন্দ হয়ে উঠবে নাকি? অম্নি মোটা নাগরা, হেঁটো ধুতি, খাট কুর্ত্তা পরে হুড়োহুড়ি করে বেড়াবে? একথা কল্পনা করতেও স্নেহময়ী দিদির চোখ জলে ভরে এল।

মোক্ষদা দিদি করুণার দিকে চেয়ে, তার মনের কষ্ট বুঝতে পারলেন, স্নিগ্ধ স্বরে বল্লেন. "বীরেন এখনও বড় ছোট, জল, ঝড়, রোদে, কাদায়, অত দূর পাঠশালায় আনা গোনা করতে পেরে উঠবে কি? কখনত কষ্ট করেনি, গ্রীষ্ম বর্ষা কেটে যাক. শীতের প্রথমে স্কুল গেলেই হবে।" করুণা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে মনে কর্ত্তে লাগল, এই সময় রাজা মামা যদি একবার বীরেনকে দেখতেন. তাহলে তিনি তাকে কখনই না ভাল বেসে থাকৃতে পারতেন না। এরপর আর স্কুল যাবার কথা কিছু দিন ওঠেনি। সুকুমারী পরীক্ষা করে দেখলেন, বীরেনের অক্ষর পরিচয় সম্পূর্ণ হয়নি, অঙ্কে শূন্য ছাড়া আর কিছু সে রাখতে পারে না, স্বরবর্ণের দুএকটি অক্ষর ছাড়া কিছুই লিখ্তে জানেনা। তবুও সুকুমারী এই অজ্ঞ ছাত্রটিকে অধিক পরিশ্রম ও যত্নে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। বীরেনকে যা বলে দিতেন, সে কখন ভুলে যেতনা, প্রতিদিন নিয়মিত সময় বই শ্লেট পেন্সিল গুছিয়ে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় স্থির হয়ে বসে মনোযোগের সঙ্গে পড়া করত, ছুটির জন্যে বিরক্ত করতনা, কিম্বা ছুটির সময় হলেও বেঞ্চি চৌকি উল্টে, খাতা পত্র লণ্ড ভণ্ড করে দৌড়ে পালাতনা। বরং তাকে মনে করিয়ে দিতে হত, যে ছুটী হয়েছে, আর কত বার লিখবার খাতা তার হাত হতে কেড়ে নিয়ে তাকে উঠিয়ে দিতে হত। ছেলেদের সকলের পড়া হয়ে

গেলে তিনি করুণাকে পড়াতেন। দুএকদিন পরে সুকুমারী মোক্ষদা দিদিকে বল্লেন, "করুণা যতদূর শিখেছে, তাকে আর বেশী দিন তিনি পড়াতে পারবেন না, কেননা কতকগুলি বিষয় করুণা তাঁর সমানই জানত। করুণার বুদ্ধি, ধারণা, স্মরণ শক্তি ও মনোযোগের প্রশংসা করে, বল্লেন, যদি ভাল পণ্ডিত মাষ্টার দিয়ে পড়ান হয়, তাহলে কালে করুণা যে বিদুষী মেয়ে হয়ে উঠবে, তার সন্দেহ মাত্র নেই।"

মোক্ষদা দিদি রাজা বাহাদুরকে বলে যাতে করুণার ভাল পড়ার বন্দোবস্ত হয় তার চেষ্টা করবেন, বল্লেন। করুণার বুদ্ধি ও চেষ্টার কথা শুনলে, তিনি যে ওকে ভাল স্কুলে পাঠিয়ে দিতে রাজী হবেন, তা মোক্ষদা দিদি জানতেন; কিন্তু করুণা ছোট ভাই বোনদের ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী হবে কিনা, সে বিষয় বিশেষ সন্দেহ ছিল। এর দিন কত পরে শোভনাকে সঙ্গে করে রাণী মামী এক দিন দেখা করতে এলেন। শোভনা আর করুণা যে ভয় করেছিল, বীরেন সব বলে ফেলবে, সে ভয়ের কোন ভিত্তি ছিলনা, সরল বীরেনের মনে কোন গোলই ছিলনা, সে কল্পনাই করতে পারতনা, যে করুণা না থেকে শোভনা যে রাজবাড়ীতে আছে এর মধ্যে কোন গোলযোগ থাকৃতে পারে। তার ভয় ছিল, করুণাকে রাজা মামা পাছে নিয়ে যান, যখন দেখলে শোভনা গেছে, করুণা তাদের কাছেই আছে, তখন তার সব ভয় দূর হয়ে গিয়ে, সে বড় মনের সুখে দিন কাটাতে লাগ্‌ল। এই কয় দিনে করুণাও এক রকম ভুলে গিয়েছিল, যে শোভনা তারি স্থান অধিকার করেছে। সে যে তার ভাই বোনদের কাছে থেকে তাদের আদর যত্ন করতে পারছে, মোক্ষদা দিদি আর সুকুমারীর কাজের সাহায্য করছে, এইটেই এমন স্বাভাবিক ব্যাপার মনে হচ্ছিল, যে অন্য রকম হলেই তার কষ্ট হ'ত। রাজ বাড়ীতে নিষ্কর্ম্মা হয়ে সারাটা দিন কাটান, তার পক্ষে কত কষ্টকর হত, সে কথা সে কল্পনা করবারও চেষ্টা করেনি। এই সামান্য এক সপ্তাহে শোভনার অনেক বদল হয়েছিল। তার জরির জামা, বেনারসী শাড়ী, গাভরা গয়না দেখে, খুকুত প্রথমে তাকে চিন্‌তেই পারেনি। করুণা আধ ময়লা শাড়ী, সাদা জামাটি পরে প্রথমটা শোভনার কাছে এগোতে একটু যেন সঙ্কোচ বোধ করছিল। সকলেই লজ্জা করে, বিশেষ কিন্তু বলতে পারলনা। চারিদিকে চেয়ে দেখে শোভনা বল্লে "ভাই, ঘরটাত ভারী মজার দেখতে। এই খানে বুঝি তুমি আর খুকু শোও! এ জায়গা তোমার ভাল লাগে? আমাকে মনে পড়ে? দিদি, সত্যি, তোর জন্যে রাতে আমার কান্না পায়, ইচ্ছে করে তোর সঙ্গে গল্প করি। রাতে আমি একা শুয়ে থাকি। আমার দাসী পাশের ঘরে শোয়। মাঝের দরজা খোলা থাকে, ঘরে আলো থাকে, তবু আমার মন খারাপ হয়ে যায়, ভাল ঘুম হয় না। দাসীটার নাম কি জান? ইন্দ্রাণী, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন দাসী হলেন ইন্দ্রাণী।" আমি কিন্তু ইন্দ্রাণীকে টের পাইয়ে দি, কত ফরমাস করি, শুনে মামীমা হাসেন! মামীমা আমায় খুব ভাল বাসেন, আমার তাঁকে ভাললাগে, কিন্তু মামাকে আমার পছন্দ হয় না ভাই। আমার পড়াবার জন্যে মাষ্টার, গানের জন্যে ওস্তাদ, বাজনার জন্যে সেতার কত কি আসছে। যাদের এত টাকা কড়ি, সোণা দানা তাদের আবার পড়া কেন? চাকর দাসী রাত দিন হাজির, হুকুম করলেই হল। আমি অনেক কেঁদে কেটে মামীকে দিয়ে বলিয়ে এক সপ্তাহের জন্যে রেহাই নিয়েছি।

"মামার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়না, মুখটা হাঁড়ি করে রাতদিন পড়ার ঘর আর কাছারীতেই থাকেন। মামীমার বন্ধু যাঁরা এসে ছিলেন, সবাই চলে গিয়েছেন, হঠাৎ দুএকদিনের জন্যে কেউ আসেন। দিন পরিষ্কার থাকৃলে মামীমা আমাকে অনেক দূর খোলা গাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে যান। রাতে তিনি যখন খাবার জন্যে কাপড় ছাড়েন, তখন আমি সেখানে বসে বসে সব দেখি। কত সুন্দর সুন্দর শাড়ী, কেমন হীরে মুক্তার চমৎকার গহনা। মামীরা রাতে আমাদের মতই টেবিলে খান, আমি খাবার পর গিয়ে ফল মিষ্টি তাঁদের সঙ্গে খাই। মামা বাবু সেটা ভালবাসেননা, বলেন, ছোট মেয়েদের

অত রাত জাগা ভাল নয়। দেখ ভাই, মামা আমাকে কেমন সুন্দর ছোট চুনিমণি ঘড়ি দিয়েছেন, একটি বোতামের চেয়ে বড় নয়, একটা লকেটের মত হারের সঙ্গে গলায়ও পরা যায়!"

শোভামণি, "তুমি তবে সুখেই আছ?" ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে করুণা তাকে জিজ্ঞাসা করলে; কথার স্রোত আর টাকা কড়ির বর্ণনায় সে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

শোভনা বল্লে "পড়তে, যদি নাহত, তা হলে কোন ভাবনাই থাকত না, তাতো হবার যো নেই, সংস্কৃতের জন্যে পণ্ডিত মহাশয়, ইংরাজী বাংলা অঙ্ক ভূগোল ইতিহাসের জন্যে মাষ্টার মহাশয়, তিনি আবার এম, এ পাস, গান বাজনার ওস্তাদ জী, ছবি আঁকা শিখিবার জন্যে এক জন পোটো বাবুও এসেছেন, শুনছি!"

"শোভনা ছবি আঁকতে শিখতে তোমার আনন্দ হচ্ছে না আমার হলেত খুব ভাল লাগত!" সুন্দর দৃশ্য সুন্দর বর্ণ করুণাকে একেবারে মোহিত করত!

সে কথার কোন উত্তর না দিয়েই শোভনা করুণার হাত ধরে নাড়া দিয়ে মুখ নাড়িয়ে বল্লে, "আমি তোকে কত ছবি এঁকে দেব, এই ঘুপসি ঘরটায় টাঙিয়ে রাখিস, দেখতে ভাল হবে। দেখ্ দিদিমণি, নিস্তার পিসিমা এক খানা চিঠি লিখেছে, মনে করেই লিখেছে মামাবাবুকে দেখাতে গেলাম দেখ্‌লেন না বল্লেন, আমি যদি তোর মত হতে পারতাম, তা হলে ভাল হত।

মামা তার প্রশংসা করেছেন শুনে করুণার ভারি আনন্দ হল। শোভনা আবার বল্লে, "মামাত সারাদিনই তোর প্রশংসা করেন, আর বলেন আমি যদি তোর মত হতে পারতাম তাহলে ভালই হত। মামীমা কিন্তু আমার বদল চাননা, তিনি বলেন, আমি যেমনটি আছি এম্নি তাঁর বেশী ভাল লাগে।"

পিসিমার চিঠির জবাব দিয়েছ কি?"

"হ্যাঁ দিয়েছি। মামীর কাছে একজন আধা বয়সী ভদ্র স্ত্রীলোক থাকেন, তিনিই আমাকে যেমন বলে দিলেন তেম্নি লিখেছি।"

"আচ্ছা শোভা, পিসিমা খুকু আর বীরের কথা লেখেননি"?

ঠিক পিসিমার মতই মনে করা, চিঠির পুনশ্চে লিখেছেন, আশা করি তোমার ছোট বোনরা ভাল আছে। আর বীরেন্দ্রনাথের যেমন বুদ্ধি আছে, সে তাহা চালনা করিবার সুযোগ পাইবে।" করুণা কাতর স্বরে বল্লে "শোভা, এসব প্রতারণার কথা মনে করে আমার রাতে ঘুম হয় না, মনে হয় একি করলাম।"

"দিদি ঠিক্ বলেছ আমার মনও খারাপ হয়ে, ঘুম আসে না, আমি মনে ভাবি ওসব কথা ভাবব না, কিন্তু কিন্তু সারাদিনই ঐকথাটাই মনের মধ্যে ঘোরে, কিছুতে ভুলে থাক্‌তে পারিনে; বাবা শুন্‌লে কি বলবেন না জানি?"

করুণা বল্লে "বাবার কথা আমি ভাবিনে, তিনি ঠিক্ ভাবেই বুঝবেন, তিনি ত তোমার উপর রাগ করবেন না, তা ছাড়া আমি যে কেন এমন করলাম তাও তিনি ঠিক বুঝবেন, আমার কেবল রাজা মামার জন্যে ভয় হয়। তিনি কখনই বাবার মত সহজ ভাবে বুঝবেন না, যখন জানবেন, তখন ক্ষমা করবেন বলেও মনে হয় না।" শোভনা বল্লে, "আমি মামাকে কেয়ার করিনে, বাবা আর মামীমা যদি আমার পক্ষ নেন তাহলে কোন গোলই হবে না, আর তাঁরা নিশ্চয়ই আমার দিক্ হয়ে বলবেন। বাবার চিঠি যদি আমি এখানে নিয়ে এসে লিখি, তাহলে এখন ভয়ের কারণ নেই, কতদিনে তিনি ফিরবেন কে জানে, ততদিনে আমি বড় হয়ে যাব, মামীমার মত বিয়ে হয়ে যাবে, হয়ত আমিও এক জন রাণী হ'ব, তখন আর আমাকে কে বক্‌বে?"

"রাজা মামাকে যদি অতদিন ধরে প্রতারণা করি, তাহলে তিনি কখনই ভুলতে পারবেন না, কখনই ক্ষমা করবেন না, যদিও তিনি আমার আপন মামা, তবুও আমাকে তাহলে কি আর কখনো ভাল বাসবেন?"

"নাই বা বাসলেন তাতে আর তোর কি হবে দিদি?"

করুণা বিষণ্ণ মুখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে, সে কি করে

বোঝাবে, মামাবাবুর ভালবাসা তার কাছে কত মূল্যবান। সে স্নেহ হতে বঞ্চিত হলে তার জীবন আরো কত কষ্টজনক হবে।

শোভনা বল্লে "চল ভাই নীচে যাই।"

করুণা বল্লে, "শোভা আর একটু থাক মাণিক, আমার মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে কোন কথাই বলা হলনা, তোমার জন্যে আমার মনটা বড় কাঁদে! তোমার জন্যে আমার বড় খালি লাগে তবে তুমি সুখে আছ, মণি, তাই ভেবে আমি মন ভাল রাখি।" শোভনা ঘরের চারিদিকে একবার ভাল করে দেখে বল্লে, এখানে কিন্তু আমি একদিনও থাকতে পারতাম না, কতককেলে তাকে জানে, আয়নাখানার কলাই উঠে গেছে মুখই দেখা যায়না! তবু দিদি তোর জন্যে আমার কষ্ট হয়, তোকে আমি পৃথিবীর সব চেয়ে বেশী ভাল বাস্‌ব, তুই কিন্তু খুকুকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাস্‌তে পারবিনে, কখনো না!"

করুণা শোভনার গলা জড়িয়ে ধরে মুখের উপর মুখ রেখে স্নেহ বিগলিত স্বরে বল্লে "কখনো না কখনোই না।"

শোভনা বল্লে, "দিদু, আমার যখন রাতে ঘুম হয় না, ভয় লাগে, আমি আস্তে আস্তে তোর নাম ধরে ডাকি, মনে হয়, তুই যেন আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস, তোকে ছাড়া আমার যে এত একা হবে, তা আমি আরো একদিনও ভাবিনি। দিদি তুইও রাজবাড়ীতে আয় না কেন?"

করুণা বল্লে, "তাকি হয় মণি? খুকু আর বীরেনকে কে দেখবে, বড়মা পর্য্যন্ত এখানে নেই। বীরেন এদের ছেলেদের মত চেঁচামেচি হুড়োহুড়ি শিখবে মনে করে আমার ভয় হয়, এখানকার ছেলেরা দুষ্টু কি খারাপ নয়, তবে তাদের ধরণ ধারণ, শোভা, তুমি যে এখানে নেই সে ভালই হয়েছে। তোমার যে শরীর, একটুতে নেতিয়ে পড়ে, এই গরমে পাখা ছাড়া থাকৃতে হলে অসুখে পড়ে যেতে। মোক্ষদা মাসীমা বুঝতেই পারেন না, খুকু তাঁর ছেলে মেয়েদের মত শক্ত নয়, রোদে বৃষ্টিতে লাফালাফি করলে ব্যামোয় পড়ে যাবে। বীরেনকে তিনি এসব কিছু মানা করতে দেন না, বলেন "পুরুষ বাছা, নাড়ুগোপাল বানিও না।" আমি পড়ি, কাজ শিখি আমার দিন বেশ কাটে, তবে এখানে তোমার পোষাতনা।" "তবে দিদি এর পর যেন বোলনা, আমি শুধু আমার জন্যেই সবাইকে ঠকাচ্ছি। আমিও স্বার্থপর নই; আমি ঠিক্ করেছি, পূজার সময় তোদের সবাইকে নিয়ে যাব। আর রাজবাড়ীতে একটা মস্ত ঘর আছে, তেতলার উপরে, সেখানে ছেলেবেলা রাজাবাবু ও তোর মা থাকৃতেন, খেলা করতেন, সেই ঘরে আমরা সবাই মিলে খেলা করব। এবারে আমি অনেক নতুন খেলা ঠিক্ করে রেখেছি। আর শুতে যাবার আগে বাবা যে গানটা ভালবাস্‌তেন, "পুরাণ সে দিনের কথা" সেইটা আমরা সবাই মিলে গাইব, বেশ মজা হবে। পুরাণ কিছুই আমি ভুলে যাইনে, আমার ভুলতে ভাল লাগেনা, মামী আমার পুরাণ পুতুলটি বদলে একটি খুব ভাল পুতুল নতুন দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি নিলাম না। আমার খেঁদি পুতুলটাকে আমি কত ভালবাসি, তাকে বদল করব কেন?

দুজনে নীচে গিয়ে দেখে বৈঠকখানা ঘরে রাণী মামী বসে আছেন, দেওয়ানজী মশায়ের ছেলে মেয়েরা মোক্ষদামাসী সুকুমারী খুকু বীরেন সবাই সভা উজ্জ্বল করে বসে আছেন। খুকুকে রাণী মামী কোলে তুলে নিয়ে বলছেন, "মোক্ষদা ঠাকুরঝি, এত মেয়ে নয় এযে স্বর্গের পরী, এমন দুধে আলতায় রং এমন নাক মুখের গড়ন, এমন কালো রেশমের গুচ্ছের মত কোঁকড়ান চুল এমনটিত আর দেখিনি।" ছোট ছেলে মেয়ের মুখের উপর তাদের চেহারার প্রশংসা করা তাঁর ভাল বলে মনে হলনা, মোক্ষদা দিদি বল্লেন, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী আর এমন বুদ্ধি—"

রাণীমামী বল্লেন, "বুদ্ধির কথা থাক, এমন চেহারা আমি ত আর কোথাও দেখিনি. এ যেন আমাদেরই শোভনা।"

খুকুর আদর দেখে করুণার বড় আহ্লাদ হল, সে

জ্যাক ফিলিপস্ ।

তাড়াতাড়ি বল্লে, "সত্যি রাণী মামী, খুকু বড় সুন্দর নয়? আমরা যখন একবার কলকাতায় ছিলাম, তখন বাবার এক জন বন্ধু খুকুর ছবি এঁকে প্রদর্শনীতে দিয়েছিলেন, খুব প্রশংসা হয়েছিল, সে ছবির নাম দিয়েছিলেন, "স্বর্গের পরী।"

মামী হেসে, স্নেহস্বরে বল্লেন, "তা এমন মুখের যদি আদর না হয়, তবে কিসের আদর হবে বল, এত সত্যি স্বর্গের সামগ্রী, এর নাম কি?" খুকু নিজেই বল্লে, "আমার নাম উলমিলা (উর্ম্মিলা)" "উর্ম্মিলামণি, তুমি আমার বাড়ী যাবে?"

"যাব বই কি।"

"তাইতো যাবে বই কি আমার চাঁদ, আমি তোমায় কোলে করে নিয়ে যাব।"

খুকু ঠিক কিছু বুঝতে পারছিলনা, এক বার রাণী মামীর দিকে একবার মোক্ষদা মাসিমাকে চেয়ে দেখে তার কি যেন মনে হল, সে রাণীমামীর মুখের কাছে মুখ ধরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কি আমার মা জননী নিতে এসেছ?" রাণীমার চোখে জল ভরে এল, তিনি খুকুকে চুম খেয়ে বল্লেন, "তুমি আমায় মামী বলে ডেক।"

খুকু কাঁদ কাঁদ সুরে বল্লে, "শুধু মামীমা, মা জননী নয়? আমি ভাবচি, তুমি পরী হয়ে এসেছ, আমার মা জননীর কাছে নিয়ে যাবে।" খুকু কাঁদবার উপক্রম করছে দেখে তিনি তাড়াতাড়ি বল্লেন, "তোমায় আমি একটা খুব ভাল পুতুল কিনে দোবো, নেবে?" খুকু বল্লে, "দিদিকে তুমি যে বড় পুতুল দিয়েছিলে, সেটা দিদি আমায় দিয়েছে, আর চাইনে।" করুণা শোভনা ভয়ে ভয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগল। এ পুতুল রাজা বাহাদুর করুণারে পাঠিয়ে ছিলেন, করুণা শোভনাকে নিয়ে প্রথম বার রাজ বাড়ীতে যাবার সময় সান্ত্বনার জন্যে খুকুকে পুতুলটি দিয়ে গিয়েছিল। রাণীমামী মনে করলেন শোভনার পুতুল করুণা দিলে এত বেশ মজা, তবে তাতে তাঁর কিছু মনে হলনা। বীরেন তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লো "আমাকেও একটা খুব ভাল লিখিবার বাক্স দিয়ে দিদি বলেছিল, কাশীর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার হতে এসেছে। আপনি সেই অন্নপূর্ণা। এখনও আমি সেটা ব্যবহার করিনে, খুব ভাল কিনা তাই। দিদি রেখে দিয়েছে, বড় হলে দেবে।"

করুণা বীরেনকে চুপি চুপি বল্লে, "যাও, রাণীমামীকে নমস্কার করে বল, ডেস্কটি খুব সুন্দর, আর তুমি পেয়ে খুব খুসী হয়েছ!" বীরেন বল্লে, "রাম দাদারা তো কেউ নমস্কার করছেনা!" করুণা আবার বল্লে, "বীরেন, জানত মা জননী তোমাকে এই রকম শিখিয়েছিলেন, এরি মধ্যে ভুলে যাচ্ছ?"

বীরেন আর দ্বিরুক্তি না করে তখনই রাণীমামীর কাছে গিয়ে নমস্কার করে বল্লে, "আপনি যে আমায় লিখিবার বাক্সটি দিয়েছেন, আমার পেয়ে খুব আনন্দ হয়েছে, বাক্সটি খুব সুন্দর দেখতে।"

রাণীমামী বীরেনের মোটা মোটা হাত দুখানি ধরে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, "বাক্সটি তোমার ভাল লেগেছে শুনে আমি খুব খুসী হলাম। তুমি বড় ভদ্র লক্ষ্মী ছেলে, রাজা বাহাদুরকে এক দিন নিয়ে আসব। তিনি তোমায় দেখে খুসী হবেন।"

বীরেন গম্ভীর ভাবে বল্লে, "রাজাবাহাদুর না আসুন, আপনি এলে আমি খুসী হব, আপনাকে ভাল লাগে, দিদি বলেছেন, শোভা দিদিকে নিয়ে গেলেন তাই বলে রাজা বাহাদুর কিছু মন্দ লোক ন'ন।" রাণী মামী কিছু না বলে একটু হাসলেন।

একটু পরেই তাঁদের প্রকাণ্ড বেরুষ গাড়ী এল, তেজী ঘোড়া দুটি স্থির হয়ে দাঁড়াতে চায় না. রাণী মামী ও শোভনা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে বসলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাড়ীতে যেতে যেতে রাণী মামী বল্লেন "ছেলে মেয়ে দুটি দেখতে যেমন সুন্দর, তেম্নি মিষ্ট স্বভাব, এমন ছেলে মেয়ে আমিত আগে আর কখনো দেখিনি। আশ্চর্য্য, করুণা ওদের মত কিছুই দেখতে নয়। তোমার সঙ্গেই ওদের বেশী মিল আছে। করুণা মেয়েটী কিন্তু বড় লক্ষ্মী, ছোট ভাই বোনদের কত ভালবাসে। তোমার রাজা মামাকে শীঘ্রই একদিন বীরেন আর উর্ম্মিলাকে দেখ্‌তে পাঠাতে হচ্ছে।"

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সাধু জীবন।

ভারতবর্ষ প্রাচীন কাল হইতে সরল জীবন এবং উচ্চ চিন্তার জন্য প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে বহুসংখ্যক লোক ধন মান ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া সারা জীবন জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। নগরের কোলাহল হইতে দূরে পর্ণকুটিরে বনজাত ফলমূল বা শাকান্নে জীবন ধারণ করিয়া ভারতের ঋষিগণ মহৎ বিষয়ের চিন্তায় জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাদের সেই চিন্তার ফলেই বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি অমূল্য রত্ন সকলের জন্ম হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে জীবনের এইরূপ উচ্চ আদর্শ বিরল হইয়া গেলেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এখনও স্থানে স্থানে দুই এক জন সাধু পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা প্রাচীন কালের ঋষিদের মত সংসারের কোলাহল হইতে দূরে সামান্য অবস্থায় থাকিয়া উচ্চ চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। সম্প্রতি এই শ্রেণীর এক জন সাধু ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের নানা আড়ম্বর ও উদ্দাম সাংসারিকতার মধ্যে ইনি জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনায় ধীরভাবে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে কোনও প্রকার আড়ম্বর ছিল না; নিতান্ত দীনভাবে জীবন যাপন করিয়া সর্ব্বদাই তিনি মহৎ বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

এই সাধু পুরুষের নাম গৌরগোবিন্দ রায়। তাঁহার নাম সাধারণ লোকের নিকট পরিচিত ছিল না। কারণ, তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিতেই ভাল বাসিতেন, কিন্তু যাহাতে মানব জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব, তিনি স্বীয় চেষ্টায় তাহা প্রচুর পরিমাণে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৭৬২ শকে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের নিকটস্থ এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি যৌবনের প্রারম্ভে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই বটে, কিন্তু সামান্য ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিবারে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলিত ছিল; বাল্যকাল হইতেই তাঁহারও সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁহার এক আত্মীয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পুলিসের একটি সামান্য চাকরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার জন্য ভগবান অন্য কাজের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন; ঘটনাসূত্রে অল্প কাল পরেই তিনি পুলিসের কাজ ছাড়িয়া দেন। ধীর শান্ত, নিরীহ, দুর্ব্বলকায় পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়কে পুলিসের কর্ম্মচারীর পদে কল্পনা করিতেও কৌতুক বোধ হয়। যে অল্প সময় তিনি পুলিসের কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সময়টি সম্ভবতঃ তাঁহার নিকট বড় অপ্রীতিকর হইয়াছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আপনার জীবনের প্রকৃত কার্য্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

তিনি যখন পুলিসের কার্য্য করিতেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক পরলোকগত সাধু অঘোর নাথ সেই অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিত গৌর গোবিন্দ রায় তাঁহার উপদেশাদি শুনিবামাত্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণ ছিল; নিষ্ঠাবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বাল্যকাল হইতেই তিনি গভীর ভাবে ধর্ম্মচিন্তা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। শুনা যায়, বাল্যকালে ভগবদ্‌গীতা পড়িতে পড়িতেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার সংশয় জন্মে। গীতাতে একটি শ্লোক আছে, যে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকটে দ্বিজ শূদ্র গরু কুকুরের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই; সকল মানুষেই ভগবান আছেন। এই শ্লোক পড়িয়া তাঁহার মনে হয়, যে আমাদের দেশে যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, তবে তাহা ঠিক নহে। যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনের নূতন চিন্তা দূরীভূত হইল তিনি অবিলম্বে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

অল্প দিন পরেই গৌরগোবিন্দ রায় কলিকাতায় আসিলেন। সেখানে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংস্পর্শে তাঁহার ধর্ম্মভাব দিন দিন গভীর ও জীবন্ত হইতে লাগিল। তিনি আপনার সমুদয় শক্তি ব্রাহ্ম সমাজের সেবায় অর্পণ করিলেন। তদবধি মৃত্যুর দিন

পর্য্যন্ত তিনি যে ত্যাগ, নিষ্ঠা, এবং দৃঢ়তার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেও মন উন্নত হয়। সেই যে সংসারের দিক হইতে মুখ ফিরাইলেন, আর একবারও ধন মান ঐশ্বর্য্যের দিকে ফিরিয়াও চাহেন নাই; এমন কি, আপনার এবং পরিবারের উদরান্নের সংস্থান কিরূপে হইবে সে চিন্তাও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ঈশ্বরের করুণায় নির্ভর করিয়া তিনি আপনার শরীর মনের সমুদয় শক্তি তাঁহার সেবায় অর্পণ করিয়াছিলেন। বিশ্বাস ছিল, যে ভগবান তাঁহার সেবকের সকল অভাব পূর্ণ করিবেন। দারিদ্র্য, দুঃখ ও অভাবের মধ্যে এক দিনও এবিশ্বাস হইতে বিচলিত হন নাই। ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য কি দারুণ পরিশ্রমই করিতেন এবং কত কষ্টই সহ্য করিয়াছিলেন। মানুষ যখন কোনও মহৎ কার্য্যের জন্য আপনার সুখ, সম্পদ, স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, তাহাতেই তাহার গৌরব। পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় এই অর্থে অতি উচ্চ শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আপনার বলিয়া কিছু রাখেন নাই। যৌবনের প্রথম হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান ছিল। ইহার জন্য দারিদ্র্য, দুঃখ, নির্য্যাতন অম্লানবদনে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘজীবনে কতদিন গিয়াছে, যে দিনান্তে আহার জোটে নাই, কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিলনা; অনাহারে অনিদ্রায় দারুণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যে তাঁহার প্রথম জীবনে এক দিন দ্বিপ্রহরে তিনি গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর তাঁহার মুখ শুষ্ক দেখিয়া রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহার হইয়াছে ত?" তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সে কথায় কাজ কি?" অনেক পীড়াপীড়ির পর ীকার করিলেন, সেদিন আহার জোটে নাই। শাস্ত্রী মহাশয় তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ব্ব দিন আহার হইয়াছে কি?" রায় মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, হইয়াছে।" কিন্তু পরে জানিতে পারিলেন, যে পূর্ব্ব দিন এক পয়সার মুড়ি খাইয়াছিলেন। এ কেবল এক দিনের কথা নহে। গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়কে চির জীবন ঘোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। একজন বন্ধুকে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "সপরিবারে ছয় পয়সায় দিন যাপন করিয়াছি। কিন্তু সেই জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের দিন ছিল।" কিন্তু এই ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি সর্ব্বদাই উচ্চ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন। বৃদ্ধ বয়সে বেশী নড়া চড়া করিতে পারিতেন না; কিন্তু যখন যাইতাম, তখনই দেখিতাম, হয় পড়িতেছেন, না হয় লিখিতেছেন। প্রথম জীবনে তিনি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পান নাই; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পর নিজের চেষ্টায় অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে সংস্কৃতের দিকে তাঁহার অনুরাগ ছিল। উত্তরকালে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে মহা পণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং বেদান্ত, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের গভীর গবেষণাপূর্ণ ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। অনেকের ধারণা আছে, যে পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেই পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি ইংরাজী ভাষায় ক্যাণ্ট, হেগেল, মিল প্রভৃতি আধুনিক দার্শনিকদিগের পুস্তকও পাঠ করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে plain living and high thinking বলে, তাহার পূর্ণ বিকাশ ইঁহার জীবনে দেখিয়াছি। খর্ব্বাকৃতি, ক্ষীণকায় মানুষ ছিলেন; সাধারণতঃ এক খানি সাদা ধুতি, একটী গেঞ্জি ও এক জোড়া চটী জুতা পায় দিয়া থাকিতেন, দেখিয়া নিতান্ত সামান্য লোক বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দেহে যে গভীর জ্ঞান, যে উচ্চ ধর্ম্মভাব ছিল, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। শরীর জীর্ণ হইলেও জ্ঞানস্পৃহার তিলমাত্র হ্রাস হয় নাই। শেষ বয়সে যখন অনেকক্ষণ সোজা হইয়া বসিতে পারিতেন না, এক খানি আরাম চৌকীতে হেলান দিয়া বসিয়া কাঠের তক্তার উপরে কাগজ রাখিয়া মাঝে মাঝে অল্প অল্প বিশ্রাম করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখিয়া যাইতেন। প্রায়

চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তদ্ভিন্ন অনেক গভীর চিন্তাপূর্ণ পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। তাঁহার বেদান্ত ও গীতার সমন্বয় ভাষ্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। আমরা তাঁহার গ্রন্থ অপেক্ষা তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত অধিক মূল্যবান মনে করি। এই বিলাসিতা, আড়ম্বর এবং লঘুচিত্ততার দিনে সরলতা ও মহৎ চিন্তার প্রতিমূর্ত্তি সেই মহৎজীবন দেশের লোকের সম্মুখে, বিশেষতঃ নূতন বংশের সম্মুখে চির জীবিত থাকে, এই ইচ্ছা হয়।

বীর বালক।

(১)

জার্ম্মানীর সমুদ্র তীরে এক ধীবর পল্লী; অশ্রান্ত সমুদ্র গর্জ্জনের ধ্বনিতে এই পল্লীটী সর্ব্বদা আকুল থাকিত।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা আকাশে মেঘ জমিতেছিল দেখা গেল। সারারাত্রি আকাশে মেঘ গুলি আরও ঘন হইয়া গেল।

চারিদিকে অন্ধকার, আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না; থাকিয়া থাকিয়া বাতাস প্রবল বেগে বহিতেছিল এবং বজ্রের গর্জ্জনে আকাশ পাতাল কাঁপিতেছিল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের চমকে পৃথিবীর কাতর অবস্থা দেখা যাইতেছিল।

সেই রাত্রে ধীবরদের মন নানা আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। ভীষণ ঝটিকার ভয়ে পাখীগুলি সারারাত্রি কলরব করিতেছিল।

সেই রাত্রে ধীবরদের কাহারও ঘুম হয় নাই; শেষ রাত্রে তাহাদের যখন একটু তন্দ্রা আসিল, অমনি হঠাৎ কামানের গর্জ্জনে সমস্ত পল্লী জাগিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সমুদ্রে বোধ হয় কোন জাহাজ বিপদে পড়িয়াছে, এই ত্রাসে সকলই আতঙ্কিত হইয়া উঠিল!

ঐ পল্লীতে এক দল ধীবর বালক ছিল। তাহারা সমুদ্রের বিপন্ন লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিত। তাহারা সমুদ্র তীরে আসিয়া দেখিল, প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, উষার অর্দ্ধ স্ফুট আলোকে প্রায় এক মাইল দূরে এক খানি জাহাজ দেখা যাইতেছে।

জাহাজ খানি সমুদ্রের জলমগ্ন এক শৈলে ঠেকিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে; আরোহীরা কেহ মাস্তলের উপর উঠিয়া, কেহ বা মাস্তলের ছিন্ন ভিন্ন রজ্জু ধরিয়া প্রাণপণে আর্ত্তনাদ করিতেছে! সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গ হুঙ্কার ও ঝঞ্ঝা বায়ুর শন্ শন্ শব্দে তাহাদের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিল।

(২)

সেই ধীবর বালকেরা তাড়াতাড়ি একটা নৌকা সাজাইল; কিন্তু তখনও তাহাদের দলপতি হ্যারো আসিয়া পৌঁছে নাই! এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা চলে না। তাই সকলে প্রাণপণে নৌকা বাহিয়া সেই জাহাজের দিকে ধাবিত হইল।

তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ কেবল আট জন, কিন্তু তখন তাহাদের প্রাণের উৎসাহ শত জনেরও অধিক; তাহাদের আনন্দ দেখে কে? সমুদ্রের পর্ব্বতাকার তরঙ্গমালা তাহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তাহাদের সেদিকে তিল মাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই; সকলেরই দৃষ্টি সেই মজ্জমান জাহাজখানির প্রতি আবদ্ধ।

কিছু ক্ষণ পরে তাহাদের নৌকা জাহাজে আসিয়া লাগিল; জাহাজের বিপন্ন আরোহীদের একে একে নৌকায় উঠান হইল। কিন্তু একটি বালক একেবারে মাস্তলের আগায় রশিতে জড়াইয়া ছিল। দারুণ শীত ও বাতাসে তাহার শরীর হিম হইয়া গিয়াছে, তাহার সংজ্ঞা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

এমন সময় প্রবল বায়ুবেগে এবং তরঙ্গের তাড়নায় নৌকাখানি মোচার খোলার মত জাহাজ হইতে ২০০ গজ দূরে ছুটিয়া গেল! অচিরে আবার তুফান আরম্ভ হইবে এই আশঙ্কায় ধীবর বালকেরা সেই বালকটিকে আনিতে পারিল না! নৌকাতেও আর তিল মাত্র স্থান ছিল না!

(৩)

নৌকা আসিয়া তীরে লাগিলে তাহাদের দলপতি হ্যারো আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহার সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "সকলকে বাঁচাইয়াছ?" তাহারা বলিল,

"না, কেবল এক জন বালককে পারি নাই! আর সকলে রক্ষা পাইয়াছে।"

"কি? বালকটিকে ফেলিয়া আসিয়াছ?"

এই বলিয়া হ্যারো তাহার সঙ্গীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "আমি চলিলাম, তোমরা কেহ আমার সঙ্গে আসিবে?

তাহারা বলিল, "না ভাই, যে ঝড় আরম্ভ হইয়াছে, এই ঝড়ের মধ্যে সেখানে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

এই কথা শুনিয়া হ্যারো বলিল, "যাইও না। আমি একাই যাইব।" বলিয়াই সে নৌকায় গিয়া উঠিল।

হ্যারোর পশ্চাতে তাহার মাতা আসিয়াছিলেন; তিনি পুত্রের এই দুঃসাহস দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এমন বিপদে তুই যাস্‌না! তোর বাবা সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছেন। তোর ছোট ভাই ইউ জাহাজের কাজ শিখিতে কতদিন চলিয়া গিয়াছে। এই তিন বৎসর তাহার সংবাদ নাই; সেও হয়ত আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে! এই শেষ বয়সে আমায় ছাড়িয়া তুই যাস্‌না।"

হ্যারো বলিল, "মা, তুমি ভয় পাইও না। আমি এখনই ফিরিব; কোন ভয় নাই; আহা ছেলেটি মাস্তুলের উপর কি অসহায় অবস্থায় আছে! সে মরিলে কি কেহ কাঁদিবে না?"

(৪)

হ্যারোর মাতা প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষুর জল চক্ষুর কোণেই রহিল! তিনি উর্দ্ধে চাহিয়া বলিলেন "ভগবান, আমার সন্তানকে বিপদ হইতে রক্ষা করিও!"

হ্যারো একা গেল না। তাহার উৎসাহ ও দৃঢ়তায় আকৃষ্ট হইয়া তাহার দলের আরও চারি জন বালক সেই উন্মত্ত সমুদ্রের তরঙ্গের উপর দিয়া জাহাজের দিকে ছুটিল; তরঙ্গের বেগে সহজে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মানুষের মনের দৃঢ়তার কাছে সকলই পরাজিত হয়; মনই পুরুষ, মনই শক্তি, যাহার মন দৃঢ়, সে সর্ব্বত্রই জয়ী হইয়া থাকে।

অনেক কষ্টে তাহারা সেই নিমজ্জিত প্রায় জাহাজের নিকট গেল। হ্যারো মাস্তুলের উপর উঠিয়া স্কন্ধে করিয়া বালকটিকে নামাইয়া আনিল।

হ্যারোর মা এতক্ষণ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া নৌকাখানি দেখিতে ছিলেন।

নৌকা আসিয়া তীরে লাগিলে, হ্যারো নৌকা হইতে নামিয়া টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সঙ্গীদিগকে চীৎকার করিয়া বলিল, "মাকে বল, আজ আমার ছোট ভাই ইউকে বাঁচাইয়াছি।"

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র দেববর্ম্মা।

মৃত্যুর সম্মুখে।

গত মাসে আমরা তোমাদিগকে টাইটানিক জাহাজ ধ্বংসের সংবাদ দিয়াছি। তখন কেবল সেই দুর্ঘটনার সংবাদ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। সমগ্র সভ্য জগত এক অব্যক্ত গভীর বিষাদ ও শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। লোকে তখনও বিশ্বাসই করিতে পারিতেছিলনা, যে সত্য সত্যই সেই প্রকাণ্ড জাহাজ এত গুলি লোক লইয়া সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবেনা। বিপদের আকস্মিকতা যত চলিয়া যাইতেছে, ততই সকলে প্রকৃত ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে। প্রথম শোকাবেগ উপশমের সঙ্গে সঙ্গে মানুষে যে এমন বীরত্ব, এমন ধৈর্য্য এবং এমন আত্মত্যাগ আছে, তাহা ভাবিয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে জগতের সকলেই এই শোকের মধ্যেও এক গভীর আত্মপ্রসাদ এবং গৌরব অনুভব করিতেছেন। পৃথিবীর নানা জাতির ইতিহাসে অমানুষিক বীরত্ব এবং স্বর্গীয় আত্মত্যাগের যে সকল দৃষ্টান্ত আছে, টাইটানিকের নাবিক এবং আরোহিগণের কীর্ত্তি তাহারই পার্শ্বে স্থান পাইবে। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারা যে অকুতোভয়তা এবং ত্যাগশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, জগতের সকল দেশে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বরফস্তূপের সহিত সংঘর্ষের মুহূর্ত্ত হইতে শেষ পর্য্যন্ত নাবিক এবং আরোহী, পুরুষ এবং নারী যাঁহারা বাঁচিয়াছেন এবং যাঁহারা মরিয়াছেন সকলেই যে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার

প্রত্যেক কথা তোমাদিগকে জানাইতে ইচ্ছা করে। দুঃখের বিষয়, সে দৃশ্য ও সে কাহিনী সম্যকরূপে জানিবার উপায় এখন আর নাই। যাঁহারা বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে বিবরণ শুনিয়া অভিজ্ঞ শিল্পীরা নিমজ্জমান টাইটানিকের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা আজ তাহার প্রতিলিপি মুকুলের পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি। বরফস্তূপের সহিত সংঘর্ষের পর প্রায় চারি ঘণ্টার মধ্যে টাইটানিক অতলে অদৃশ্য হইয়া যায়। প্রথম ১৫।২০ মিনিট পর্য্যন্ত কাহারও মনে আশঙ্কাও হয় নাই, যে জাহাজ ডুবিবে। জাহাজ এত প্রকাণ্ড, যে যদিও সংঘর্ষের বেগে দুই স্তরে বিভক্ত তলদেশ এবং তাহার আবরণ লোহার চাদর বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তবু জাহাজের লোকেরা সামান্য একটু ধাক্কার অধিক আর কিছু অনুভব করিতে পারে নাই। জাহাজ যখন ডুবিতেছে, তখনও অনেকে মনে করিতেছিল, যে টাইটানিক কখনও ডুবিতে পারে না। এই অন্ধ বিশ্বাসের জন্যই এত অধিক লোক বিনষ্ট হইয়াছে; নতুবা আরও কতকগুলি লোক জালিবোটে উঠিয়া বাঁচিতে পারিত। টাইটানিকের নির্ম্মাণ সময়ে তাহাকে সকল প্রকার দুর্ঘটনায় নিরাপদ করিবার জন্য এত চেষ্টা করা হইয়াছিল, যে জাহাজস্থ অনেকেরই মনে আশা ছিল, যে জাহাজ ডুবিবেনা। যিনি এই জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি যখন তাহার ধ্বংসের সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাঁহার মনের অবস্থা কি হইয়াছিল, অনুভব করিতে পার! তাঁহার নাম মাননীয় এ, এম, কারলাইল। টাইটানিক ধ্বংসের দিনের পরবর্ত্তী শুক্রবারে লণ্ডনের সেণ্ট পলস্ কেথিড্রেলে মৃত ব্যক্তিদের জন্য উপাসনা হইয়াছিল। মাননীয় কারলাইল তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু উপাসনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি মনের ব্যাকুলতায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে হয়।

সংঘর্ষের অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, যে টাইটানিকের অগ্রভাগ ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছে। তখনই বুঝা গেল, যে সম্মুখের খোলে প্রবল বেগে জল প্রবেশ করিতেছে! চারি ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত অগ্রভাগ সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হইয়া গেল এবং পশ্চাৎভাগ তাহার উপরিভাগ ছাড়াইয়া উঠিল। জাহাজ খানি এই ভাবে প্রায় পাঁচ মিনিট ছিল; প্রকাণ্ড জাহাজের পশ্চাতের ১০ ফুট জলের উপরে আকাশের দিকে প্রায় সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়া একটা প্রকাণ্ড দানবের মত দেখাইতে লাগিল। দূর হইতে জালিবোটের লোকেরা সে দৃশ্য দেখিয়া আতঙ্কে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার পরে এক বিকট শব্দ করিয়া জাহাজ খানি যখন ডুবিয়া গেল, তখন যে ব্যাপার ঘটিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। যাঁহারা সে শব্দ শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, যে এমন ভয়ঙ্কর বিভীষিকা কল্পনা করা যায় না। জগতের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর যেন না হয়!

টাইটানিক জাহাজে আরোহী ও নাবিক লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ২২০৬ জন লোক ছিল। তাহার মধ্যে ৭০৩ জনের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। এই যে ৭০৩ জন লোক বাঁচিয়াছে, তাহার জন্য প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ টাইটানিকের তারবিহীন টেলিগ্রাফের সিগনেলার জ্যাক ফিলিপ্‌সকে ধন্যবাদ দিতে হয়। টাইটানিকের ধ্বংসের সময়ে অনেকে বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে জ্যাক ফিলিপসেরই উল্লেখ করিব। এই যুবক যদি সেই বিপদের সময়ে ধীরভাবে আপনার কাজ না করিয়া যাইত, তাহা হইলে হয়ত এক জন লোকও বাঁচিত না। জ্যাক ফিলিপস্ সারাদিন কাজ করিয়া রাত্রি ১০টার পর শুইতে যাইতেছিল, এমন সময় জাহাজ খানা একটু নড়িয়া উঠিল। অল্প ক্ষণ পরে কাপ্তেন নামিয়া আসিয়া বলিলেন, বরফস্তূপের সঙ্গে আমাদের জাহাজের ধাক্কা লাগিয়াছে; হয়ত বিপদের সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে, তুমি প্রস্তুত থাক; কিন্তু আমি না বলিলে সংবাদ প্রেরণ করিও না।" খানিক ক্ষণ পরে কাপ্তেন আসিয়া বলিলেন, "বিপদের সংবাদ প্রেরণ কর; আমরা সাহায্য চাই।" ফিলিপস্ চারিদিকে সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে ফ্রাঙ্কফর্ট নামক এক খানি জাহাজ সে সংবাদ পাইল; কিন্তু তাহা সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইবার আগ্রহ দেখাইল না। ফিলিপস্ আবার চারিদিকে সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে জাহাজ ক্রমে জলমগ্ন হইতেছে। জাহাজের লোকেরা যে যেমন পারে আপনাদের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ফিলিপের সেদিকে দৃষ্টিই নাই। তাঁহার সহকারী সংঘর্ষের সময় ঘুমাইতেছিল; সে লোক জনের গোলমাল শুনিয়া উঠিয়া তার ঘরে আসিয়া ব্যাপার কি বুঝিল। দেখিল, ফিলিপস্ আপনার বিপদের কথা ভুলিয়া সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন। তখন সে ফিলিপস্‌কে একটী জীবনরক্ষক কোমরবন্ধ পরাইয়া দিল। ওদিকে কার্পেথিয়া জাহাজ ফিলিপ্‌সের প্রেরিত সংবাদ পাইয়া দ্রুতবেগে সেদিকে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাপ্তেন আসিয়া বলিয়া গেলেন, "তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য উপযুক্তরূপেই সম্পন্ন করিয়াছ; এখন নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা কর।" কিন্তু ফিলিপস্ তখনও তার ধরিয়া কার্পেথিয়াকে টাইটানিকের অবস্থিতি স্থান প্রভৃতি আবশ্যক সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার সহকারী আসিয়া বলিল, "শেষ জালিবোট চলিয়া যাইতেছে।" কিন্তু ফিলিপ্‌স্ তখনও আপনার স্থান হইতে উঠিলেন না। সহকারী নিরুপায় হইয়া চলিয়া গিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িল; অনেকক্ষণ সন্তরণের পর শেষ জালিবোটখানি তাহাকে তুলিয়া লইল। তাহার প্রাণরক্ষা হইল; কিন্তু জ্যাক ফিলিপ্‌স্ বাঁচেন নাই, নিজের জীবন দিয়া সাত শত তিন জন সহযাত্রীকে বাঁচাইয়া গিয়াছেন।

অখিল শরণ।

প্রভু তুমি অবিনাশী পর্ব্বত মালার,
অধিপতি অপার সিন্ধুর,
অদৃষ্ট-আঘাত সহ হৃদয় সবার
কর নাথ, বিশ্বাসে মধুর।

নিষ্ঠুরা প্রকৃতি যবে চামুণ্ডার মত
ছিন্ন করে মানব জীবন,
মানবের জন্মদাতা হইও নিয়ত
সহায় সম্বল অনুক্ষণ।

অন্ধশক্তি নিষ্করুণা হৃদয় বিহীন,
রোধে যবে এ ক্ষণ নিশ্বাস,
হে নিশ্চল ধ্রুবতারা, দীপ্ত চির দিন
মরণ তিমির কর নাশ!

শব্দহীন সমুদ্রের তরঙ্গের তলে
সমাহিত শ্রেষ্ঠ বীরগণ,
দাও দিব্য অনুভূতি বুঝিব তাহলে
আজি তারা অমর জীবন;

তোমার সন্তান মোরা দুর্ব্বল কাতর
দীনহীন মাটির গঠন,
শান্ত কর, ভগ্নপ্রায় ব্যথিত অন্তর
প্রভু, পিতা, অখিল শরণ!

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

বালিকার রচনা।

সমুদ্র।

সাগর তোমার কোথায় শেষ?
কোথায় তুমি শেষ হয়েছ, লয়ে তোমার
সুনীল বেশ।

বড় বড় ঢেউগুলি সব নিয়ে,
কোথা তুমি যাচ্চ বেয়ে বেয়ে,
হাজার হাজার মুক্তা প্রবাল রাঙ্গা,
কত শত জাহাজ ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
কত রকম ঝিনুক ভরা তপ্ত বালুচর,
এ সব নিয়ে কোথায় তুমি চলেছ সাগর।

শ্রীমতী অমলা দেবী।
বয়স ৮ বৎসর।

ভাই বোন।

শিশির পারুল তারা
দুটী ভাই বোন,
পিতার নয়ন মণি
আদরের ধন।
দুটী ভাই বোনে তা'রা
সদা হাসে খেলে,
কেহ না ছাড়িবে কারে'
কভু কোথা গেলে।

একটী ছবির বই
পড়িছে উভয়,
বিবাদ বিহীন দোঁহে
বড় মধুময়।
মাঝে মাঝে পাঠ শুনি
পিতা দুজনার,
নূতন নূতন বই
দেন উপহার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থানাভাবে ধাঁধার উত্তর ও নূতন ধাঁধা প্রকাশিত হইল না।

২১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কাপ্তেন স্মিথের শেষ আদেশ।
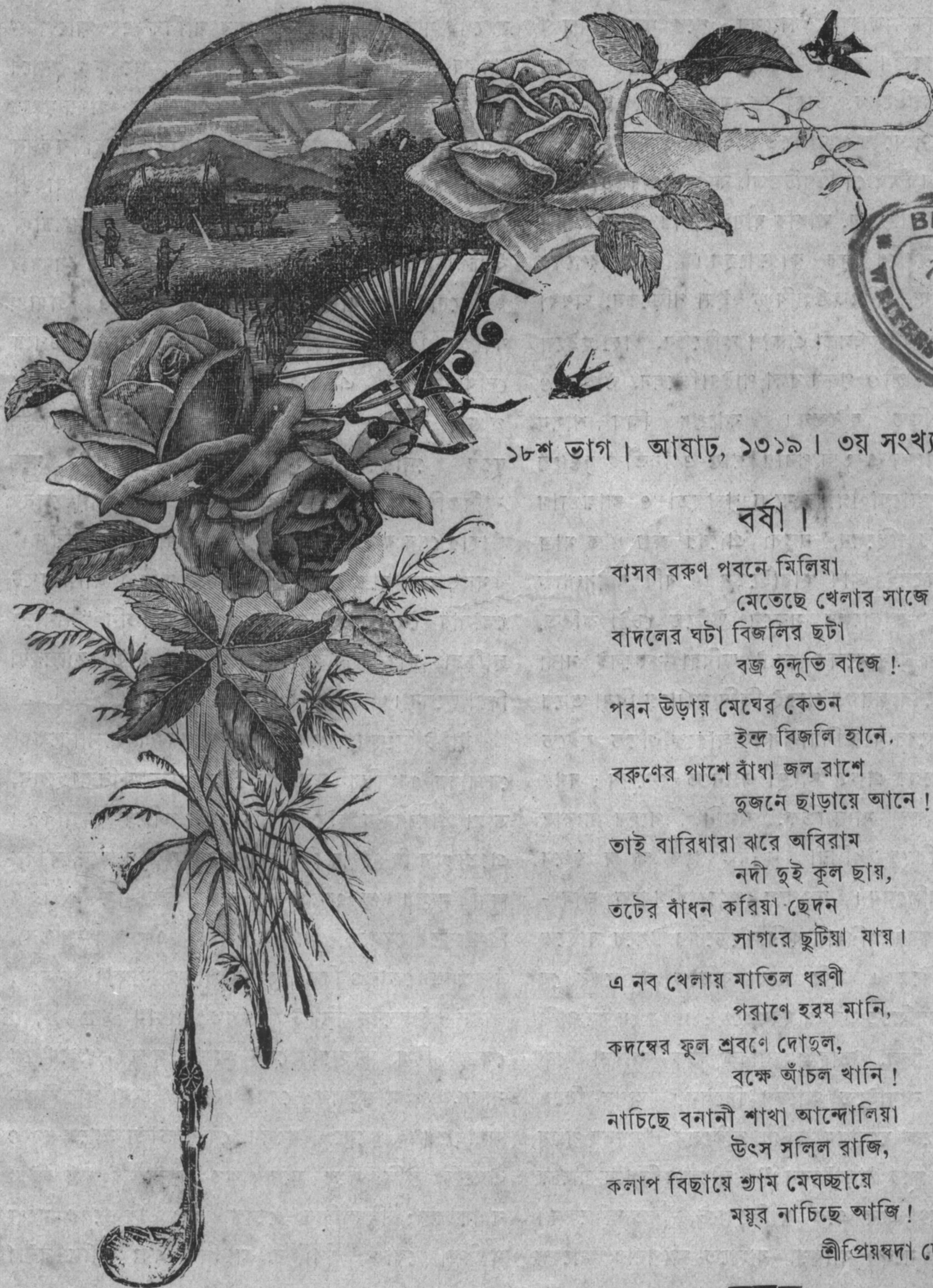
১৮শ ভাগ। আষাঢ়, ১৩১৯। ৩য় সংখ্যা।

বর্ষা।

বাসব বরুণ পবনে মিলিয়া
মেতেছে খেলার সাজে
বাদলের ঘটা বিজলির ছটা
বজ্র দুন্দুভি বাজে !

পবন উড়ায় মেঘের কেতন
ইন্দ্র বিজলি হানে,
বরুণের পাশে বাঁধা জল রাশে
দুজনে ছাড়ায়ে আনে !

তাই বারিধারা ঝরে অবিরাম
নদী দুই কূল ছায়,
তটের বাঁধন করিয়া ছেদন
সাগরে ছুটিয়া যায়।

এ নব খেলায় মাতিল ধরণী
পরাণে হরষ মানি,
কদম্বের ফুল শ্রবণে দোদুল,
বক্ষে আঁচল খানি !

নাচিছে বনানী শাখা আন্দোলিয়া
উৎস সলিল রাজি,
কলাপ বিছায়ে শ্যাম মেঘচ্ছায়ে
ময়ূর নাচিছে আজি !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মৃত্যুর সম্মুখে।

টাইটানিক জাহাজ ধ্বংসের পরে মৃত্যুর সম্মুখে যাঁহারা অসাধারণ বীরত্ব, ধৈর্য্য এবং দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাপ্তেন স্মিথ এক জন। সংঘর্ষের পর হইতে টাইটানিক জলমগ্ন হওয়া পর্য্যন্ত কাপ্তেন স্মিথ যে স্থিরচিত্ততা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন, তাহার দ্বারা তাঁহার প্রথমের ত্রুটী অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছেন। সেই বিপদের সময়ে তিনি যদি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেন, অথবা কোনও প্রকার দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে যে সাত শত স্ত্রীও পুরুষ রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। কাপ্তেন স্মিথ শাসন ও উৎসাহ বাক্যে এবং আপনার শান্ত ও নির্ভীক দৃষ্টান্তে নাবিক এবং আরোহীগণের মধ্যে শৃঙ্খলতা ও আত্মত্যাগ উদ্রিক্ত করিয়াছিলেন, নতুবা প্রাণের জন্য অতি মাত্র ব্যস্ততায় সকলেই প্রাণ হারাইতেন। যদি অল্পসংখ্যক জালি বোটে জাহাজের সকলে উঠিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বোট ডুবিয়া সকলেই মারা পড়িত। সংঘর্ষের অল্পক্ষণ পরেই তিনি সর্ব্বাগ্রে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের ঘরে গিয়া সিগনালারকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া জাহাজের প্রকৃত অবস্থা জানিতে গেলেন; যখন বুঝিলেন, অবস্থা সাংঘাতিক, অমনি বিপদের সংবাদ প্রেরণ করিতে বলিয়া নাবিকগণকে স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইতে বলিলেন। তৎপরে আরোহীগণকে জীবন-রক্ষক কোমরবন্ধ পরিধান করিয়া ডেকের উপরে যাইতে আদেশ করিলেন। ইতি মধ্যে বুঝিতে পারিলেন, যে জাহাজ দ্রুতগতিতে জলমগ্ন হইতেছে; তখন যে কয়খানি জালিবোট ছিল, তাহার নাবিক ঠিক করিয়া দিয়া জালিবোট নামাইতে আদেশ দিলেন। অপর দিকে আরোহীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সমুদয় পুরুষ বোট হইতে দূরে দাঁড়াইবেন।" স্ত্রীলোকদিগকে নীচের ডেকে নামিয়া একে একে জালিবোটে উঠিতে বলিলেন। নিজে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া যাহাতে আপনার আদেশ প্রতিপালিত হয়, দৃঢ়তার সহিত তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কারণ বিপদের সময় একটু বিশৃঙ্খলা হইলেই সর্ব্বনাশ। টাইটানিকের নাবিক এবং আরোহিগণ যে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার মূলে অনেক পরিমাণে কাপ্তেন স্মিথের দৃষ্টান্ত। তিনি শেষ পর্য্যন্ত আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে ভয় বা দুর্ব্বলতার লেশমাত্র না দেখাইয়া যতজন লোককে বাঁচাইতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। টাইটানিকের যে সকল আরোহী বাঁচিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে সমুদায় জালিবোট নামান হইয়া গেলে পরেও তাঁহারা কাপ্তেন স্মিথকে জাহাজের উপরিস্থিত সেতুর উপরে দেখিয়াছিলেন, একবার একটা ঢেউ আসিতে তিনি পড়িয়া গেলেন কিন্তু পর মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুরন্ত লোকদের সঙ্গে কথা বলিবার যন্ত্রে নাবিকদিগকে উপদেশ এবং উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তাঁহার শেষ কথা "ইংরেজ নাবিকের নাম রক্ষা করিও।" এমনও শুনা যায়, যে তাঁহাকে জোর করিয়া জালিবোটে তোলার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি "আমাকে ছাড়িয়া দাও" বলিয়া তাহাদের হাত ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

টাইটানিকের ধ্বংসের সময় অধ্যক্ষ এবং নাবিকেরা যে বীরত্ব এবং স্থিরচিত্ততার দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসনীয় হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে স্বাভাবিক। প্রত্যেক নাবিকই যে দিন নৌ ব্যবসায় গ্রহণ করে, সে দিন অবধি মৃত্যুর জন্য এক প্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু বিলাসের ক্রোড়ে লালিত ধনী এবং লক্ষপতিরা, যাঁহাদের কোনও দিন দুঃখের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, জীবন যাঁহাদের নিকট কেবল আরাম এবং সুখের ক্ষেত্রই ছিল, তাঁহারা সেই আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে যে সাহস, ও আত্মত্যাগ দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অসাধারণ। অনেকে বলেন, যে পাশ্চাত্য জগতে ধন ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মনুষ্যত্বের খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে; নিরবচ্ছিন্ন ভোগ এবং বিলাসের মধ্যে থাকিয়া লোক সুখপ্রিয়, স্বার্থপর এবং দুর্ব্বল হইয়া

যাইতেছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার লোকে এখনও যে মৃত্যুকে ভয় করে না, প্রয়োজন হইলে যে অকাতরে জীবনের সকল সুখ তুচ্ছ করিয়া প্রাণ দিতে পারে, টাইটানিকের আরোহীরা তাহার জীবন্ত সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। বিলাসের ক্রোড়ে পালিত ধনীর সন্তান, স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধির অধীশ্বর লক্ষপতি, দুর্ব্বল রমণী প্রভৃতি সকলে যে ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং মানব চরিত্রের প্রতি সম্মান ও আশার উদ্রেক হয়। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে কর্ণেল আষ্টরের নাম উল্লেখ যোগ্য। ইনি আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ ক্রোড়পতি। নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণীর সহিত ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন। টাইটানিকের আরোহীরা সকলে একবাক্যে কর্ণেল আষ্টরের সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা

জন জেকব এষ্টর ও ইসিদোর ষ্ট্রস।

করিয়াছেন। তাঁহা স্ত্রীর শরীর অসুস্থ ছিল; এইজন্য প্রথমে তিনি তাঁহাকে এক খানি নৌকায় বসাইয়া দিলেন। স্ত্রীকে সাহস দিবার জন্য বলিলেন নিউইয়র্কে পৌঁছিয়া আবার সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু সেই দেখাই শেষ দেখা। স্ত্রীকে নৌকায় বসাইয়া দিয়া তিনি অন্য স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাদিগকে নৌকায় উঠিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শেষ নৌকা না গিয়াছিল, ততক্ষণ তিনি অক্লান্তদেহে স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদের প্রাণরক্ষার জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে তাঁহাকে কোনও একখানি নৌকায় উঠিয়া নিজের প্রাণরক্ষা করিতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক জন স্ত্রীলোকও অবশিষ্ট থাকিবেন, ততক্ষণ তিনি জীবনরক্ষক তরণীতে উঠিবেন না। যখন টাইটানিক জলমগ্ন হয়, তখন তাঁহাকে মেজর আর্চ্চিবাল্ড বাটের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া জাহাজের উপরিস্থিত সেতুর উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। কর্ণেল আষ্টরের এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের বিষয় চিন্তা করিলেও মন উন্নত হয়।

অনাথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিস্তার ঠাকুরাণী তাঁর বসবার ঘরে এক খানি টেলিগ্রাম হাতে করে হতবুদ্ধির মত বসেছিলেন। এই ঘরে তাঁর ভাইপো ভাইঝিদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়, সেদিন কার সেই কলরব, কচি মুখের আধ আধ কথা, আর হাসি, আজ সব নিঃশব্দ নির্জ্জন। ক্ষীরো দুবার দুবার এসে বলে গেল, যে খাবার প্রস্তুত, কিন্তু দুবারি তিনি তাকে বাধা দিয়ে চলে যেতে বল্লেন। বামন ঠাকুরাণী একবার এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তারে কোন অশুভ সংবাদ এসেছে কিনা, তাকেও তিনি চলে যেতে বল্লেন।

নিস্তার ঠাকুরাণী একেবারে কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত বসেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লে যদিও তিনি কখনই স্বীকার করতেন না, যে তাঁর ভাইপো ভাইঝিরা চলে যাওয়াতে বাড়ীর সকল আনন্দ, সকল সৌন্দর্য্য, তাদের সঙ্গে চলে গিয়েছে, তবু আজ তিনি অন্তরে অন্তরে খুবই অনুভব করছিলেন, তাঁর জীবন কি অর্থহীন, কত শ্রীহীন। তিন জন বৃদ্ধা আর একজন অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক একত্রে বাস করেন মাত্র, তাঁদের মনের কোন মিল নেই, জীবনে শান্তি এবং সন্তোষের

বড়ই অভাব। নিস্তার ঠাকুরাণীর চেয়ে কম কঠিন মন আর কেউ হলে আজ তার নিশ্চয়ই করুণার কোমলতা, শোভনা ও উর্ম্মিলার কমনীয়তা ও বীরেনের সরলতার কথা বার বার মনে পড়ত, তাদের অভাবে কষ্ট বোধ হত, কিন্তু তাঁর সে সব বালাই কিছুই ছিল না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে তাদের সব ভার নিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করেছিলেন, তাতে তাঁর আনন্দই হয়েছিল। করুণার মামা রাজা বাহাদুরের অর্থের অভাব ছিল না, তাঁর সন্তান সন্ততি নেই, তাই তিনি এ ভার নিয়ে যে খুবই উদারতার পরিচয় দিলেন, একথা নিস্তারঠাকুরাণী মনে করতে পারছিলেন না। তিনি ভাবছিলেন, আমি অসহায় নিঃস্ব বিধবা, আমি কেমন করে এমন গুরুভার বহন করতাম। যে ধনী সেই এ ভার গ্রহণ করেছে, এইত ন্যায় বিচার হল। নিজের মনকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করলেও মাঝে মাঝে সে তাঁকে খুব খোঁচা দিচ্ছিল। সে বলছিল, যে দিন মহেশ হঠাৎ তার বাপের বাস্তু ভিটায় এসে দাঁড়িয়ে, আপনার বড় বোনের কাছে তার ছেলে মেয়ের খবর জিজ্ঞাসা করবে, সে দিন তিনি কি বলবেন? মহেশ তো ভোলানাথ, সেতো কোন কিছু নিয়েই তাঁর সঙ্গে ঝগড়া দ্বন্দ্ব করেনি, টাকা কড়ি সে তুচ্ছ মনে করে, তবে তার মাতৃহীন ছেলে মেয়েদের তিনি যে বিদায় করে কুটুম্ব বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন, এ কথা যখন সে জানবে, তখন সে কখনই তাঁকে আর শ্রদ্ধা করবে না, তাঁর এ কর্ত্তব্যক্রটি কখনই সে সহ্য করবে না। মহেশের বাল্য মুখখানি তিনি ভুলতে পারছিলেন না, তার দ্রুত গমন, উচ্চহাস্য, অবাধ বাক্যস্রোত এই সকল কেবল তাঁহার মনে পড়ছিল। সে যে একদিন চিন্তারেখাঙ্কিত ললাট, পলিতকেশ, স্থবিরদেহ অপকমতি বৃদ্ধের মত তাঁর কাছে আসতে পারে,একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি,সে নিশ্চয়ই একদিন তাহার চির বালক স্বভাব, প্রফুল্ল মুখ ও চঞ্চল গমন নিয়ে তাঁর ঐ নিঃশব্দ সিঁড়ি বেয়ে উপরে এসে দিদি বলে ডাকবে, তাঁর চুল পেকে গিয়েছে দেখে অবাক হয়ে যাবে। সেই চিরন্তন সরল নির্ভরপরায়ণতার সঙ্গে তার ছেলে মেয়েদের সংবাদ চাইবে। আজ কদিন হল ছেলেদের দূরে পাঠিয়ে দেবার পর হতে নিস্তার ঠাকুরাণীর মনে এই ছবি জাগছিল, মহেশের প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন মনে করে, তাঁর সমস্ত মন কুণ্ঠিত হয়েছিল, কি বলে তাকে বোঝাবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আজ ঐ দুছত্রের বিদেশী ভাষায় লেখা নিদারুণ বার্ত্তা তাঁহার সকল সমস্যা পূরণ করে দিলে। মহেশ আর আসবেনা, আর কোন প্রশ্নই করবেনা। কিন্তু তবু সান্ত্বনা কোথায়? মহেশ আর ফিরে এসে তার ছেলে মেয়ে ফিরে চাইবেনা। অপব্যয়ী, অবিবেচক, বিষয় বুদ্ধিহীন মহেশ আর নেই! তার সেই সরল হাস্যপূর্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি চির দিনের মত রুদ্ধ, তার কণ্ঠস্বর চির দিনের মত নীরব। মহেশকে স্বার্থপর মনে করে কতবার নিজের মনে তাকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু সে কি স্বার্থপর ছিল? তাহলে কি তাকে এত লোক এত ভাল বাসত? তাহলে কি তার ছেলে মেয়ে তাকে দেবতার মত পূজা করত? মৃত্যু শয্যায় শুয়েও সে তার অনাথ ছেলে মেয়েদের শোক মনে করে, বলে গিয়েছে, এ দুঃখের সংবাদ তাদের যেন সহসা না দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে আর তার ফিরে আসা হল না। তিনি যখন তাকে দায়িত্ব-বোধহীন, স্বার্থপর বলে দোষ দিচ্ছেন, তখন সে সমুদ্রের অগাধ বক্ষে সমাহিত। তাঁর খোলা জানালা দিয়ে দূরে নদীর প্রশস্ত মোহনার দিগন্ত বিস্তার দেখা যাচ্ছিল; আর মহেশের সেই চির সঙ্গীহীন নীরব সমাধির ছবি তাঁর মনে কেবলই জেগে উঠছিল, হায় কেউ তার সংকার করলে না।

সারাদিন বৃষ্টি ঢেলে ঢেলে এখন মেঘরাশি সব শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। দিগন্তে পাংশু মেঘের স্তূপ নিঃশব্দে জমাট হয়ে রয়েছে। বর্ষা সূর্য্যের পাণ্ডু আলোকে চারিদিকের দৃশ্য উজ্জ্বল না হয়ে আরো যেন ম্লান হয়েছে। তার উপর সূর্য্যাস্তের আরক্ত রশ্মি, রোদনঅরুণ দৃষ্টির মত অতি সকরুণ। নিস্তার ঠাকুরাণী তাঁর মৃত কনিষ্ঠ সহোদরের জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে পারলেননা। তাঁর শুষ্ক মন যেন আরো শুষ্ক ও নীরস হয়ে উঠেছিল; সেখানে তিনি যে দাহ অনুভব করছিলেন, চোখের জলে

তার নিবৃত্তি হয় না। যখন মহেশের ছেলেরা এই নিদারুণ সংবাদ শুনবে, তখন তারা কেমন আকুল হয়ে কাঁদবে সেই কথাই তাঁর বার বার মনে হচ্ছিল। আর তিনি কি করবেন, তাঁর দিন এমনি নীরবে আরামে কাটবে, কিন্তু মনের মধ্যে যে জ্বালা, তার কি কখনো শান্তি হবে?

সম্প্রতি মহেশের আনন্দ উজ্জ্বল কিশোর মূর্ত্তি তাঁর মনে এমন জাজ্বল্যমান হয়েছিল, যে তিনি কিছুতেই এই শোক সংবাদ জানাবার জন্যে যে পত্র লেখা আবশ্যক, তার রচনায় মনসংযোগ করতে পারছিলেননা। মনের গতি ভিন্ন পথে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি তাঁর লিখবার দেরাজ খুলে এক খানি লম্বা চিঠি বার করে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। এ খানি তাঁর পনর বৎসর আগে লেখা উইল। তাঁর সামান্য সম্পত্তি, তাঁর সযত্ন সঞ্চিত অর্থ, বিবিধ পুণ্য কার্য্যে উৎসর্গ করে দিয়ে ছিলেন। এখন তাঁর আর্থিক অবস্থা তখনকার চেয়ে আরো ভাল হয়েছে; পনর বৎসরের সাবধানতা ও মিতব্যয়িতার গুণে আজ তিনি এক জন ধনী স্ত্রীলোকের মধ্যে গণ্য। পুরাতন উইল খানি তিনি ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তখনি লিখবার টেবিলে বসে আর এক খানি নূতন ব্যবস্থা পত্র লিখলেন, তাতে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এক মাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথকে সমর্পণ করলেন। তার পর বেদনা ক্লিষ্ট মুখে কম্পিত হস্তে সেই নিদারুণ টেলিগ্রাম এক খানি খামে পুরে রাজা বাহাদুরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন।

রাণী ঠাকুরাণী অশ্রুমলিন মুখে রাজাবাহাদুরের হাত ধরে বল্লেন "এ ভয়ানক নিষ্ঠুর সংবাদ আমি কেমন করে শোভাকে দেব, সে যে তার বাবাকে বড় ভালবাসে। তুমি বল, আমি পারবনা।"

"আমি দেওয়ানজীর ওখানে অন্য ছেলে মেয়েদের বলতে যাচ্ছি। তুমি শোভাকে বল, সে তোমাকে বেশী ভাল বাসে, তুমি তাকে ভাল বোঝাতে পারবে।"

"তুমি অন্য ছেলেদের বিষয় কি করবে? তাদের ত কেউ নেই।"

"আমি সে সব বিষয় পরে ভেবে স্থির করব। তাড়া তাড়ি করে কিছু না করাই ভাল!"

রাণী ঠাকুরাণী অধীর ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। যা কিছু করবার তা তিনি তখনি স্থির করতে ভাল বাসতেন। একটু চুপ করে বসে থেকে তার পর উঠে শোভনার কক্ষে গেলেন।

তিনি পড়ার ঘরে গিয়ে দেখেন, শোভনার দু চোখ জলে ভরা। ইংলণ্ডের ইতিহাস মুখস্থ করতে হচ্ছে বলে সে একেবারে কাতর হয়ে উঠেছে।

যে ভদ্র মহিলাটি শোভনাকে পড়াতেন, তাঁর দিকে চেয়ে রাণী ঠাকুরাণী বল্লেন, "পড়তে গিয়ে মেয়ে যদি এমন কাতর হয়ে কাঁদে, তাহলে সে শিখবে কেমন করে? পড়াটা যে তাহলে শাস্তি হয়ে উঠবে। যাতে একটু আমোদ পায়, খুসী মনে পড়ে, তাই করবেন।"

শিক্ষয়িত্রী কাতর কণ্ঠস্বরে বল্লেন "আমার তো চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই, শোভনা কিছুতেই পড়তে চায় না, মনোযোগ দেয় না, আমি যখন বুঝিয়ে দি, কিছুই সে শোনে না।"

শোভনাও উদারভাবে বল্লে, "মামীমা, ওঁর কোন দোষ নেই। তবে কত কাল হয়ে গেল, যে সব বিদেশী রাজা মরে গিয়েছে, তাদের বিষয় জান্‌তে কোনই কৌতুহল হয় না, তারা কবে কি করেছিল, বলেছিল, এখন সে সব জেনে আমার লাভ কি?"

শিক্ষয়িত্রী বল্লেন, "শোভনাকে আমি অবাধ্য কিম্বা দুষ্ট বলতে পারিনে, সে আমাকে ভালবাসে, আমাকে আদর করে, তবে আমি তাকে লেখা পড়া শেখাবার জন্যেই এখানে এসেছি, কিছুই যদি না শেখে, তা হলে আমার কষ্ট হয়।"

"আচ্ছা মামীমা, আমি গুরুমাকে বিরক্ত করতে চাইনে, কিন্তু কবে কোন রাজা কি ভুল করেছিলেন, তাতে তাঁর উত্তরাধিকারীর কি অপকার হয়েছিল, কোন রাজা কার মাথা কেটেছিলেন এ সব আলোচনায় আর লাভ কি? তাঁরা তো মরে কোথায় গিয়েছেন তার খবর নেই। আমরা যে তখন জন্মাইনি এই আমাদের ভাগ্যি

বলতে হবে। আমরা যতদিন বেঁচে আছি, আরামে থাকি, কে কবে মরেছে, কে কাকে মেরেছে, এসব শিখবার জন্যে মাথা ঘামবার দরকার কি ?"

রাণী মামী গম্ভীরভাবে বল্লেন,"ছি শোভনা, ছি শোভনা, ছি ! এসব কি কথা, গুরুমা যা শেখাবেন মন দিয়ে শিখতে হবে, তা না হলে তোমার মামা বাবু ও আমি বড় দুঃখিত হব।" যে দুঃখের সংবাদ শোভনাকে দিতে এসেছেন সে কথা মনে করে চারিদিকের এই সকল কথা অতি তুচ্ছ স্বপ্নের মত অলীক মনে হতে লাগল। শোভনার বাবা যখন সমুদ্র সমাধিতে চির নিদ্রিত, তখন তাঁর আদরের কন্যা দৈনিক সামান্য নিয়মিত কাজ নিয়ে চোখের জল ফেলছে, একথা ভেবে তাঁর মন ব্যথিত হয়ে উঠিল। গুরু মা বল্লেন,"শোভনা পড়ার সময় বড় চঞ্চল হয়, যেদিন স্থির হয়ে বসে, সেদিন তাকে যা শেখাই, কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না, আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন, শোভনা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, যে পৃথিবী গোলাকার !"

"রাণী মামী, আমি কেমন করে বিশ্বাস করব পৃথিবী গোল কমলা লেবুর মত ; আমি যে চোখে দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবী এই টেবিলখানার মত সমান টানা মাঠ, পৃথিবী যদি সত্যি ঘুরতো তা হলে সমুদ্রের জল কি অমনি থাকৃত, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত না।"

সমুদ্রের নাম শুনেই রাণী ঠাকুরাণীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল। তিনি ইংরাজী করে গুরুমাকে বল্লেন, "আমি সব কথায় মনোযোগ দিতে পারিনি, সেজন্যে আমায় মাপ করবেন, শোভনাকে বড় ভয়ানক সংবাদ দিতে এসেছি, তাকে একটু আমার কাছে একলা রেখে যান।"

গুরু মা চলে গেলেন, শোভনা এখনও ইংরাজী ভাল বুঝতে পারত না ; শিক্ষয়িত্রী বিদায় হলেন দেখে সে আনন্দে রাণীমার কাছে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল !

রাণীমা অতি ধীরে ধীরে শোভনার চুলেও মুখের উপরে আদরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলিলেন, "শোভামণি, তুমি কাল আমাকে বলছিলে, তোমার বড় ভয় করে তোমার আমাদের ছেড়ে যেতে হবে, তোমার বাবা এসে তোমাকে আমাদের কাছ হতে নিয়ে যাবেন।"

শোভনার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল্, মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, সে মনে করলে তার কথা সব তাঁরা জান্তে পেরেছেন, কিন্তু না। রাণীমা বল্তে লাগলেন "মণি, তা আর কখনো হেবে না ; তিনি আমাদের কাছেই তোমাকে চিরকাল রেখে দেবেন, আর কখন নিতে আসবেন না, তুমি তাঁকে খুব ভালবাসতে জানি, তিনিও তোমাকে খুব ভাল বাস্তেন। আমরাও তোমাকে খুব ভালবাসব, তাঁর ভালবাসার অভাব কখন বুঝতে দেবনা।" শোভনা রাণী মার আরো বুকের কাছে ঘেঁসে এসে বল্লে, "তোমরা আমায় এত আদর কর, যে কত সময় বাবার আদর আমি ভুলে যাই, তোমার মত আমায় আর কেউ অত ভালবাসেনি। বাবা যদিও আমাকে খুবই আদর করতেন, তবু তিনিও আমাকে খুব বেশী সুন্দর, কি ভাল মনে করতেন না। তুমি যেমন আমাকে সারাদিনই আদর কর, সাজিয়ে রাখতে চাও, তিনিও এমন করতেন না। তাইতো আমি এত সুখে আছি।"

"সোণা আমার, তোমাকে আমি যে দুঃখের কথা বল্তে এসেছি, তা যখন তুমি ভাল করে বুঝতে পারবে, তখন তোমার ভারী কষ্ট হবে, তোমার বাবা তোমাদের যতই ভালবাসুন, আর তোমাদের কাছে ফিরে আস্তে পারবেন না।"

শোভনা কথাটা যদিও স্পষ্ট বুঝতে পারল না তবুও তার মন কাতর হয়ে উঠল, সে ব্যাকুলভাবে বললে, "বাবাত রেঙ্গুন গিয়েছেন তাঁর কাজ হয়ে গেলেই তিনি আসবেন, এমন কি হবে যে তিনি ছুটী পাবেন না ? সব কাজেই ত ছুটী হয় !"

রাণীমা বল্লেন, "না মণি, ছুটীর কথা নয়, তোমার বাবা রেঙ্গুন পৌঁছিতে পারেন নি, জাহাজে তাঁর খুব অসুখ হয়, তিনি সেখানেই— আমি কেমন করে তোমাকে বল্ব ? তিনি সেখানেই মারা গিয়েছেন।"

শোভনার মুখ ভয়ে কাগজের মত শাদা হয়ে গেল, সে পাগলের মত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রাণীমার মুখের দিকে চেয়ে কাতর হয়ে বল্লে, "বাবা, বাবা, রাণীমামী তুমি কি বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

রাণী ঠাকুরাণী শোভনাকে আর কি করে বোঝাবেন। না বুঝাতে পেরে বল্লেন আমি কি বলব কেমন করে তোমাকে বোঝাব; তাঁর চোখ দিয়ে কেবল জল পড়ে তাঁর বুক ভিজে যেতে লাগল। তার পর তিনি কিছুক্ষণ থেমে বল্লেন "শোভা তোমার ছোট মাকে মনে আছে ত? তিনিত আর নেই। তেম্নি তোমার বাবাও—"

শোভনা রাণীঠাকুরাণীর কথা শেষ করতে না দিয়ে বল্লে "ছোটমার তো কেবলি অসুখ করত, তিনি সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকতেন। রাণী মামী, তুমিত জান না আমার বাবার কখনো অসুখ করত না। বাবা ছোটমার মত মরে যেতে পারেন না। তাঁর গায়ে কত জোর, তিনি ছোটমাকে কোলে করে উপরে নিয়ে যেতেন। বাবার কখনো অসুখ হয়নি।"

শোভনা রাণী মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আশা করছিল যে তিনি তাকে আশ্বস্ত করবেন। বলবেন, কিছুই হয়নি, কিন্তু তিনি যখন নিরুত্তর রইলেন, তখন সে হাহাকার করে কেঁদে, মাটীতে আপসে পড়ে গেল, চীৎকার করে বল্‌তে লাগল, "বাবা, ওগো বাবা, তুমি কোথায়, তোমার কি হয়েছে, বাবাগো একবার এস। করুণা কই, করুণাকে আমি চাই। দিদিগো আমার কাছে এস!"

রাজাবাহাদুর দুঃসংবাদ নিয়ে দেওয়ানজীর বাড়ী গিয়ে করুণাকে ডাকিয়ে সব কথা বল্লেন। সে তার বড় বড় চোখ দুটী তাঁর মুখের উপর রেখে জোরে দু হাত মুঠো করে ধরে নিঃশব্দে এই শোকের সংবাদ শুনলে। কত চেষ্টায় চীৎকার করে, হাহাকার করে কেঁদে উঠবার ইচ্ছা দমন করলে, তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগল, আর অবিরল ধারায় চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল; দেখে রাজা বাহাদুরের তার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা হল, তেমনি তার দুঃখে সহানুভূতি জেগে উঠল। খুকু বড় ছোট বলে এ সব কথা বলবার আগে খেলতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কেবল বীরেন তার দিদির হাত ধরে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সে যদিও স্পষ্ট ধারণা করিতে পারছিল না, যে বাবা তাকে কাঁধে করে দৌড়ে বেড়াতেন, তার সঙ্গে ব্যাটবল খেলতেন, হাসতেন গল্প বলতেন, তিনি আর ফিরে আসবেন না আর তাঁর আদরের খোকাবাবু সঙ্গে খেল্‌বেন না তবুও তার চোখের জল বাধা মানছিল না। অনেক কষ্টে সে আপনার চীৎকার করে কান্না সংযত করে রেখেছিল। রাজাবাহাদুর মনে করলেন এ সময় তাদের একা রেখে গেলে, ভাই বোনে প্রাণ খুলে কেঁদে নিজেদের দুঃখ লাঘব করতে পারবে, তাই তিনি বাড়ী যাবার জন্য উঠছেন, এমন সময় রাজবাড়ী হতে একজন লোক উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে সংবাদ দিলে, শোভনা দিদিমণির বারবার মূর্চ্ছা হচ্ছে, কেউ তাঁকে শান্ত কর্ত্তে পারছে না রাণীমা তাই করুণা দিদিকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন।

করুণার প্রতি এ সময়ে এমন অত্যাচারের কথা মনে করে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন, কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে স্নেহ-কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "করুণাময়ী, তুমি কি এখন যেতে পারবে?"

করুণা বল্লে, "শোভনা যখন আমাকে চায়, তখন আমি যাব বৈকি? বেচারী শোভা, বাবা তাকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসতেন, তার পক্ষে এ শোক সহ্য করা সবার চেয়ে কঠিন হবে!"

হঠাৎ একথা বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। সে কিছুতেই কান্না থামাতে না পেরে দৌড়ে ঘর হতে বেরিয়ে উপরে গেল। রাজা বাহাদুর সেই দুয়ারের সম্মুখে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। বীরেনও তার দিদির সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠিয়াছিল, কিন্তু অর্দ্ধেক সিঁড়ি উঠে গিয়ে যখন তার মনে পড়ল, যে রাজাবাহাদুর একলাটি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, অতিথির প্রতি এমন ব্যবহার বড় অভদ্রের মত দেখাচ্ছে তখন সে আবার আস্তে আস্তে নেমে ফিরে এল। বীরেনের মা অসুস্থ শরীরে তাদের জন্যে শারীরিক পরিশ্রম করতে পারতেন না সত্যি, কিন্তু কি করলে ছেলেমেয়েরা ভদ্র হবে, সৌজন্য শিখ্‌বে, অতিথিকে সমাদর করতে পারবে এসব তিনি অতি যত্নে অতি ধৈর্য্যের সহিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাই এমন দুঃখের সময়ও বালক বীরেন

ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্যে আবার ফিরে এল। করুণার সঙ্গে সে উপরে যাচ্ছিল, বাহিরের লোকের সম্মুখে যে চোখের জল অনেক কষ্টে রোধ করে রেখেছিল, ভাই বোনে একা হয়ে সেই কান্না কেঁদে মন হাল্কা করবে, কিন্তু যখনি তার মনে হল, সমাগত অতিথিকে একা ফেলে যাওয়া ভদ্র সমাজের নীতি বিরুদ্ধ, তখনি সে আবার নেমে এল। বীরেনের এই আত্মসংযম, এই ভদ্রতা, এই পুরুষোচিত ব্যবহার দেখে রাজা বাহাদুর বড় সন্তুষ্ট ও আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। বীরেন ফিরে এসে বল্লে "শোভা দিদি আমাকেত যেতে বলেনি, রাজা বাবু আপনি আসুন বৈঠক খানায় বসবেন, দিদির বেশী দেরি হবেনা!"

বীরেনের কথা মত রাজা বাহাদুর আবার বস্‌বার ঘরে ফিরে এলেন। বীরেন তাঁর জন্যে একখানি চৌকী এগিয়ে দিয়ে তিনি বসলে, নিজেও একখানি চৌকী টেনে নিয়ে বসলে। "দিদির বেশী দেরি হবেনা, দিদি শুধু চটি জুতো ছেড়ে বাহিরে যাবার জুতাটা পরবে আর অন্য একটা জামা পরে আসবে বৈত নয়, আমি ভাবছিলাম তার সঙ্গে গিয়ে তার জুতা কাপড় গুছিয়ে দেব, কিন্তু এখন বোধ হয় সে একটু একা থাক্‌তে চায়, মেয়েরা এক এক সময় কাঁদে!"

দিদির কান্নার কথা বল্‌তে গিয়ে বীরেনের দুই চোখ জলে ভরে এল। কোঁচার খুঁট তুলে চোখ মুছতে মুছতে সে হাসিমুখ করবার চেষ্টা করছে দেখে রাজা বাহাদুরের বড় মায়া হল, তিনি তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, "তুমি পুরুষ বাছা বটে, তোমার মত আমার যদি একটি ছেলে থাকৃত, আমার তাহলে খুবই আনন্দ হত!"

বীরেন বল্লে "আমার বাবা আর যখন নেই তখন আমি আর কারো ছেলে হবনা।" তার পর একটু ভেবে বল্লে "তোমাকে ভাল বাসবার কোন ছোট ছেলে নেই; আমার তোমার জন্যে দুঃখ হয়।" রাজা বাহাদুর মৃদুস্বরে বল্লেন "তুমি বড় ভাল ছেলে!"

বীরেন গম্ভীর ভাবে তাঁর দিকে চেয়ে বসে রইল, ভাবে বোধ হল মনে মনে তর্ক বিতর্ক করছে যে রাজা বাহাদুরের মত লোককে ভালবাসা সহজ কিনা? তারপর হঠাৎ বলে উঠ্‌ল "রাজা বাহাদুর তোমার চোখেও জল দেখা যাচ্ছে যে—তুমিও কি আমার বাবাকে ভাল বাস্‌তে?" রাজাবাহাদুর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদুস্বরে "না বীরেন, আমিত তোমার বাবাকে ভাল জান্‌তামনা!" বীরেন তাঁর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করল বটে, কিন্তু তবু আবার বল্লে, "তোমার কিন্তু দুঃখ হচ্ছে, তা না হলে তোমার চোখে জল এল কেমন করে?"

"তাইত, তুমিযে এখনি বল্লে আমাকে ভাল বাসবার জন্যে কোন ছোট ছেলে নেই সেই কথা শুনে আমার দুঃখ হয়েছে বোধ হয়!"

"কেন শোভা দিদি কি তোমাকে ভাল বাসেনা? আমি মনে করেছিলাম, শোভা দিদি যখন তোমার মেয়ে হল, তখন সে তোমাকে খুব ভাল বাস্‌বে! রাজাবাবু তুমি করুণা দিদিকে যে নিয়ে যাওনি, তাতে আমাদের খুব আনন্দ হয়েছে!"

রাজা বাহাদুর স্বপ্নেও কল্পনা করেননি, যে তিনি একটা গোপন কিছু আবিষ্কার কর্ত্তে যাচ্ছেন, তাই সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কি শোভাকে ভাল বাসনা?"

"শোভা দিদিকে ভালবাসি বৈকি, সে যে আমার আপনার বোন। তবু শোভা দিদিত আর করুণা দিদি নয়। শোভাদিদি বড় গর্ব্বপর। তবে শোভাদিদি আমার চেয়ে বয়সে বড় বলে দিদি সে কথা কখনো আমাকে বল্‌তে দেয়না। রাজা বাবু আমি যদি তুমি হতাম তাহলে শোভনা আমাকে না ভালবাস্‌লেও আমি কিছু দুঃখ করতাম না, যদি করুণা আমাকে ভাল বাস্‌ত তাহলেই খুসী হতাম।

"কিন্তু করুণা যদি আমায় না ভাল বাসে তবে?"

বীরেন বাবু সজোরে মাথা নাড়িয়ে বল্লেন "তা বুঝি জাননা, দিদি তোমাকে সব চেয়ে ভাল বাসে। সুন্দর গহনা পরা রাণী মামীর চেয়েও তোমাকে

অনেক ভাল বাসে। আমি আর খুকু কিন্তু সুন্দর রাণীকে বেশী ভাল বাসি। দিদি পৃথিবীতে বাবা, মা, আমাদের পরই তোমাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে, তা জ্ঞেন।"

"কেন?"

"কেন ত আমি জানিনে?" তার পর একটু থেমে বল্লে "বোধ হয় তোমার অমন সুন্দর শালের চোগা আছে বলে!"

বীরেনের এই সব মনের কথা যখন চলছে, তখনই করুনা এল। কেঁদে কেঁদে তার চোখ ছুটি ফুলে উঠেছে। সে যখন বিদায় নেবার আগে ছোট ভাইটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেলে, তখন রাজাবাহাদুর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

বীরেন চুপি চুপি বল্লে "দিদু বেশী দেরী করিসনে, সারাক্ষণ শুধু মেজ দিদির কাছে থাকিসনে। আমার কাছে কে সব কথা বলবে। তুই যদি বেশী দেরী না করিস, তাহলে আমি ভাল ছেলে হয়ে থাকব, কাঁদবনা।" কিন্তু তখনি বীরেনের মুখ বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল।

করুণা তার চোখ মুছিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লে, "যাদু ভাই আমি কি করব, শোভনার জন্যে আমায় যেতে হচ্ছে। আজ আর তুমি পড়া করোনা; মোক্ষদা দিদির কাছে গিয়ে বসে থেক, তিনি তোমায় খুব আদর করবেন, ভাল ভাল গল্প বলবেন। আমি এখন যাই।"

করুণা আস্তে আস্তে বীরেনের হাত দুখানি ছাড়িয়ে রাজাবাহাদুরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে, "এখন চলুন।" করুণা রাজা বাহাদুরের সঙ্গে গাড়ীতে উঠল। তেজী আরব ঘোড়ার জুড়ি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কত দূর চলে এল। করুণা একবার পিছে ফিরে দেখলে বীরেন তখনও সেই সম্মুখের দুয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রাজবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছে তাঁরা দেখ্‌লেন রাণী ঠাকুরাণী অতি ব্যস্ত ভাবে নীচের বৈঠক খানায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চাকর বাকর চারিদিকে দৌড়া দৌড়ি করছে, রাজাবাহাদুর তাড়াতাড়ি তাঁর শালের চোগা খুলে এসে সে ঘরে প্রবেশ করলেন, করুনাও তাঁর পিছু পিছু গেল, রাণী ঠাকুরাণী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন— "কি ভয়ানক ঘটনা হয়েছে আমি কি করে তোমাকে জানাব? আমাদের শোভামণিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছেনা!"

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

চাঁদ।

চাঁদ দেখিতে কেনা ভালবাসে! প্রতিপদের রেখামাত্র চাঁদ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণিমায় কেমন পূর্ণাবয়ব ও উজ্জ্বল হয়। কিন্তু চন্দ্র নিজে আলোক বিশিষ্ট নয়, সূর্য্যের আলোকে আলোকান্বিতা। চাঁদ সাতাশ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

চন্দ্র পৃথিবী হইতে দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে। পৃথিবীকে দশবার প্রদক্ষিণ করিতে যত সময় লাগে তত সময়ে তুমি এখান হইতে চাঁদে পৌঁছিতে পার। যদি পৃথিবী হইতে চন্দ্র পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক তার থাকিত, তবে আমরা দেড় সেকেণ্ডে সেখানে সংবাদ পাঠাইতে পারিতাম। রেলপথ থাকিলে চাঁদ রাণীর রাজ্যে পৌঁছিতে আমাদের আট মাস মাত্র লাগিত।

চন্দ্র খুব বড় নয়। উহার ব্যাস দুহাজার মাইল, পৃথিবীর ব্যাসের এক চতুর্থাংশ মাত্র। যদিও উহার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের চারি ভাগের এক ভাগ মাত্র, তথাপি চৌষট্টিটি চন্দ্র এক সঙ্গে না করিলে পৃথিবীর সমান আয়তন হয় না। একথায় বিশ্বাস না হইলে, কিছু কাদামাটি লও এবং এক ইঞ্চি ব্যাস করিয়া একটি ভাঁটা প্রস্তুত কর। এখন দেখ এই রকম কয়টি ভাঁটা লইলে চার ইঞ্চি ব্যাসের একটি গোলা প্রস্তুত হয়।

আমরা চন্দ্রের একদিক মাত্র দেখিতে পাই। উহার অপর দিক কিরূপ তাহা আমরা জানি না।

চন্দ্র আপনার অক্ষ বা মেরুদণ্ডের উপর একমাসে

একবার আবর্ত্তন করে। আমাদের দিন বার ঘণ্টায়; কিন্তু চাঁদে বাস করিলে আমরা তিনশত চুয়ান্ন ঘণ্টার দিন দেখিতে পাইতাম। চন্দ্রের রাতও ঐ পরিমাণ লম্বা কিন্তু চন্দ্রলোক ভূলোকের ন্যায় তত আঁধার নয়। তোমরা বোধ হয়জান যে রাত্রিকালে আমাদের পৃথিবী চন্দ্রকে আলো দেয়। এই আলো অতি সুন্দর। ইহা চন্দ্রের আলোর ন্যায় তত শুভ্র নহে, রক্তাভ এবং মাঝে মাঝে নীল-পীতের আভাযুক্ত। তা ছাড়া নক্ষত্রগণ চন্দ্রালোকে সমধিক উজ্জ্বল কিরণ দেয় কারণ সেখানে বায়ুমণ্ডল নাই। পৃথিবীতে নক্ষত্রের আলো বায়ু মণ্ডল দ্বারা হীনপ্রভ হয়।

চন্দ্রমণ্ডল পৃথিবী অপেক্ষা সমধিক বন্ধুর এবং পাহাড় পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। সেখানে অসংখ্য নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরি আছে। প্রাচীনকালে যখন উহারা অগ্নিউদ্গারণ করিত তখন কি ভীষণ দৃশ্যই না হইত!

চন্দ্রের রাজ্যে তৃষ্ণা নিবারণের উপায় নাই। সেখানে পুকুর, খাল, বিল, নদী, সমুদ্র কিছুই নাই; জলের চিহ্ন মাত্র নাই। উহা মরুভূমির ন্যায় তৃণহীন কিন্তু শীতল। সেখানে আষাঢ়ের বৃষ্টি নাই।

এক সময় চন্দ্র তাপযুক্ত ছিল। তখন সেখানে নদী ও সমুদ্র ছিল। জলধারা বর্ষণ হইত। সেই প্রাচীন কালে চাঁদের আকাশে মেঘ উড়িয়া বেড়াইত এবং জল ধারা বর্ষণ করিত। সে বহু যুগের কথা। চাঁদের সাদা অংশ শুষ্ক সমুদ্রগর্ভ; এবং উহার কাল অংশগুলি পাহাড় পর্ব্বত, নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি।

তোমরা পাথরের টুকরা লইয়া খেলা কর। একখণ্ড প্রস্তর দেখিয়াই তোমরা অনুমান করিতে পার উহা কত ভারী। পাথর ভারী বোধ হয় কেন? পৃথিবী উহাকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী উহাকে অদৃশ্যভাবে নিজের দিকে টানে। এই টানের নাম মধ্যাকর্ষণ শক্তি।

সার আইজাক নিউটন (Sir Isac Newton) নামে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। পৃথিবী সকল জিনিসই নিজের দিকে টানে। অন্যান্য গ্রহগণ ও এইরূপ সকল পদার্থ তাহাদের নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের জোর উহাদের আয়তন ও ঘনত্ব বা স্থূলতার উপর নির্ভর করে। চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির এক ষষ্ঠ মাংস মাত্র। সাধারণ কথায় বলিতে গেলে আমাদের পৃথিবী চন্দ্র অপেক্ষা ছয়গুণ বলবান। পৃথিবীর উপর যে পাথর খানার ওজন ছয়সের চন্দ্র লোকে উহা একসের মাত্র হইবে। তোমার ওজন যদি ত্রিশ সের হয়, চাঁদে তুমি মাত্র পাঁচ সের হইবে। তুমি সেখানে কেমন হালকা হইবে! চাঁদের রাজ্যে যাইতে পারিলে তুমি হনুমান ভায়ার মত লম্বা লম্বা লম্ফ দিতে পার। এখানে যদি তুমি এক লাফে তিন হাত যাইতে পার, সেখানে এক লাফে আঠার হাত যাইতে পারিবে। চাঁদের রাজ্যে বেড়াইয়া আসিতে তোমার অনেক দিন লাগিবে না।

শ্রীযামিনানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাতৃস্নেহ।

বিশ্বে মোর কিছু নাই; নয়ন শ্রবণ
আছে প্রকৃতির শোভা করিতে দর্শন,
বসুধার শব্দ যত সঙ্গীতের প্রায়
ব্যথিত হৃদয় মম পরশিয়া যায়!

বিশ্বে মোর কিছু নাই; আছে হস্ত পদ,
প্রভাত শিশির-সিক্ত দুর্ব্বাদল দিয়া
তুলিতে অঞ্জলি পুষ্প ভক্তি গদ গদ,
পদ ব্রজে চলে যাই সীমান্ত খুঁজিয়া!

বিশ্বে মোর কিছু নাই; আছে ভগ্নকায়া
অতীতের স্বপ্নসম ক্ষীণতর ছায়া;
এতন্তু ভবের কার্য্যে যদি আসে কভু,
নিরর্থক জীবনের সার্থকতা তবু।

বিশ্বে মোর কিছু নাই; আছে খোলা প্রাণ,
ব্রহ্মাণ্ড ভরিতে তাহে সদা আগুয়ান,
অনন্ত অসীম স্নেহ শূন্যতা আঁধারে
হাহাকারে কাঁদিতেছে দিতে আপনারে

হিয়া চাহে বিলাইতে সব খানি তার,
সঞ্চিত এ মাতৃস্নেহ কে চাহ আবার,
সাগর তরঙ্গে তাহা আসিবে ছুটিয়া
রুদ্ধ ভালবাসা স্রোতে দিবে ডুবাইয়া।

এ প্লাবন সহিবারে পার যদি কেহ
মাতৃহারা পুত্র কন্যা, আলিঙ্গন দেহ,
দাঁড়াও সকলে আসি হৃদয়ের কূলে
আমি তোমাদের মাতা হব সব ভুলে!

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

বৈদ্যুতিক ভোজবাজী।

গত ষাট সত্তর বৎসরে তাড়িৎ শক্তির সাহায্যে মানুষ যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। সেগুলি আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে এমন মিশিয়া গিয়াছে, যে এখন মনে হয় সে গুলি না হইলে দিন চলে না। কিন্তু পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে সেসকল কিছুই ছিল না। আজ আমরা ইচ্ছা মাত্র ছয় আনা খরচ করিয়া ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সংবাদ কয়েক ঘণ্টায় আনাইতে পারিতেছি। কয়েকটী টাকা খরচ করিলে পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে ইংলণ্ড বা আমেরিকাস্থ বন্ধুকে সংবাদ প্রেরণ করিতে ও তাঁহার সংবাদ লইতে পারি; ঘরে বসিয়া দূরস্থ বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিতে পারি। এক শত বৎসর পূর্ব্বে লোকে এসকল ব্যাপার কল্পনাও করিতে পারিত না। তাড়িতের সাহায্যে মানুষ অল্প সময়ের মধ্যে যে সকল কাণ্ড করিয়াছে, তাহা ভোজবাজী অপেক্ষাও বিস্ময়কর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা তোমাদিগকে সংক্ষেপে এই বৈদ্যুতিক ভোজবাজী এবং তাহার আবিষ্কর্ত্তাদের বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

যদিও কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর হইল তাড়িত শক্তি ব্যবহারে মানুষ আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে ইহার অস্তিত্ব মানুষের জানা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই হাজার বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে মানুষ জানিত, যে বিভিন্ন বস্তুতে এক প্রকার অদ্ভুত শক্তি সঞ্চার করিতে পারা যায়। খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক বৈজ্ঞানিক থেলস্ দেখিয়াছিলেন, যে গালা ঘসিলে তাহাতে এক প্রকার আকর্ষণী শক্তি জন্মে; এক প্রকার মাছ এবং অন্যান্য কোনও জন্তুর দেহেও এই প্রকার শক্তির অস্তিত্বের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন। ইহার তিন শত বৎসর পরে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক থিওফ্রষ্টস এই শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমক পণ্ডিত প্লিনী তাড়িৎ শক্তির বিষয় লিখিয়াছিলেন। এমন কি প্রাচীন কালে তাড়িৎ শক্তির সাহায্যে রোগ মুক্তিরও বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, যে রোমক সম্রাট টাইবিরিয়াসের এথেরো নামক একজন ক্রীতদাস এক প্রকার বৈদ্যুতিক মৎস্যের স্পর্শে বাত রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গথদের রাজা ওলিমার সম্বন্ধে লিখিত আছে, যে তাঁহার গাত্র হইতে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নির্গত হইত।

প্রাচীনকালে তাড়িৎ শক্তি একেবারে অজ্ঞাত না হইলেও প্রকৃত পক্ষে ষোড়শ শতাব্দী হইতে তাড়িৎ বিষয়ক জ্ঞান ও তাহার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। ডাক্তার গিলবার্ট নামক একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবিষয়ে অনেক গবেষণা করেন। তাঁহাকেই বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক ও পিতা বলা যাইতে পারে। ডাক্তার গিলবার্টের মৃত্যুর পরে রবার্ট বয়েল নামক অপর এক ব্যক্তি তাড়িৎ-উৎপত্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা নামক এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রায় সেই সময়ে অটোভনগেরিক নামক এক জন জর্ম্মান পণ্ডিতও এই প্রকারের পরীক্ষা করিতেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ তাড়িতের বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মুসেনব্রক, বেঞ্জামিন,

ফ্রাঙ্কলিন, গ্যালভানি ও ভল্টার নাম সুপরিচিত। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় তাড়িত সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বেই বৈজ্ঞানিকগণ তাড়িৎ উৎপন্ন এবং সংগ্রহ করিয়া রাখিবার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাড়িৎ শক্তি ধরিয়া মানুষের কাজে লাগান উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদিগের বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের ফল। এ বিষয়ে ইংলণ্ডকে পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সার হাম্ফ্রি ডেভি, ফার্য্যাডে, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ তাড়িতের প্রকৃতি, কার্য্য এবং শক্তি সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তাড়িৎ কি, ইহার কি শক্তি, কি প্রকারে কাহার দ্বারা সে সমুদায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ দিতে আমরা এখন চেষ্টা করিব না। তাড়িতের শক্তিতে যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ইতিহাস দেওয়াই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক দেখিতে পাই। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চ্চাতেই আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, এবং তাহাতেই আপনাদের জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ইঁহাদের লক্ষ্য জ্ঞান। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরা প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কৃত জ্ঞান মানুষের কাজে লাগাইয়া জগতের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরিশ্রমে তাড়িৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আর এক দল কর্ম্মকুশল বৈজ্ঞানিক বিবিধ উপায়ে মানুষের কাজে তাহা লাগাইয়া জগতের সুখ সমৃদ্ধি তদ্দ্বারা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া চির স্মরণীয় হইয়াছেন। নিম্নে তোমাদিগকে আমরা তাহার বিবরণ দিতেছি।

মানুষের কাজে তাড়িতের প্রথম প্রয়োগ টেলিগ্রাফের তারে। শীঘ্র দূর দেশে সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজন মানুষ চিরদিনই অনুভব করিয়াছে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশ, জাতি বা দলের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিবাদ হইত, হঠাৎ শত্রু আসিয়া পড়িয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইবার ভয় সর্ব্বদাই থাকিত। এরূপ অবস্থায় দ্রুতগতিতে দেশের দূরবর্ত্তী স্থানে শত্রুর আগমনের সংবাদ দেওয়ার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়াছে। প্রাচীন কালে পাহাড়ের উপরে আগুন জ্বালাইয়া শত্রুর আগমন জ্ঞাপন করা হইত। তোমরা অনেকেই বোধ হয় জান, যে রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব সময়ে স্পেনদেশের রণতরী সকল যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে আসিতেছিল, সমুদ্র তীরবর্ত্তী পাহাড়ের উপরে আগুণ জ্বালাইয়া তখন দেশের লোককে শত্রু আগমনের বার্ত্তা ঘোষণা করা হইয়াছিল।

প্রাচীন কালে মানুষের বুদ্ধি দূরে সংবাদ প্রেরণের আর এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। অনেক দেশে পায়রার পায়ে চিঠি বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। পায়রারা খুব দ্রুত উড়িতে পারে; শুনা যায় কোনও কোনও পায়রা ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল যাইতে পারে। এইরূপ দ্রুতগামী পায়রা পুষিয়া তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহাদিগকে কোনও দূরস্থানে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলে এক টানে উড়িয়া বাসস্থানে চলিয়া আসে। দূর স্থান হইতে শীঘ্র সংবাদ আনিবার প্রয়োজন হইলে এইরূপ পায়রার পায়ে চিঠি বাঁধিয়া দেওয়া হইত। যুদ্ধের সময় এই প্রকার পত্র বাহক কপোত দ্বারা বিশেষ উপকার হইত। অনেক সময়ে অবরুদ্ধ নগরে পত্রবাহক কপোত দ্বারা প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রেরিত হইত।

তাড়িতের প্রকৃতি পরিজ্ঞাত হইবামাত্রই তাহা দ্বারা দূরে সংবাদ প্রেরণের সম্ভাবনা অনুভূত হইয়াছিল। তাড়িৎ অতি দ্রুতবেগে গমন করে; তারে বহিয়া তাহা এক মুহূর্ত্তে হাজার মাইল দূরে যাইতে পারে, বৈজ্ঞানিকেরা এ তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেই বুদ্ধিমান লোকেরা তাড়িতের দ্বারা দূরদেশে সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।
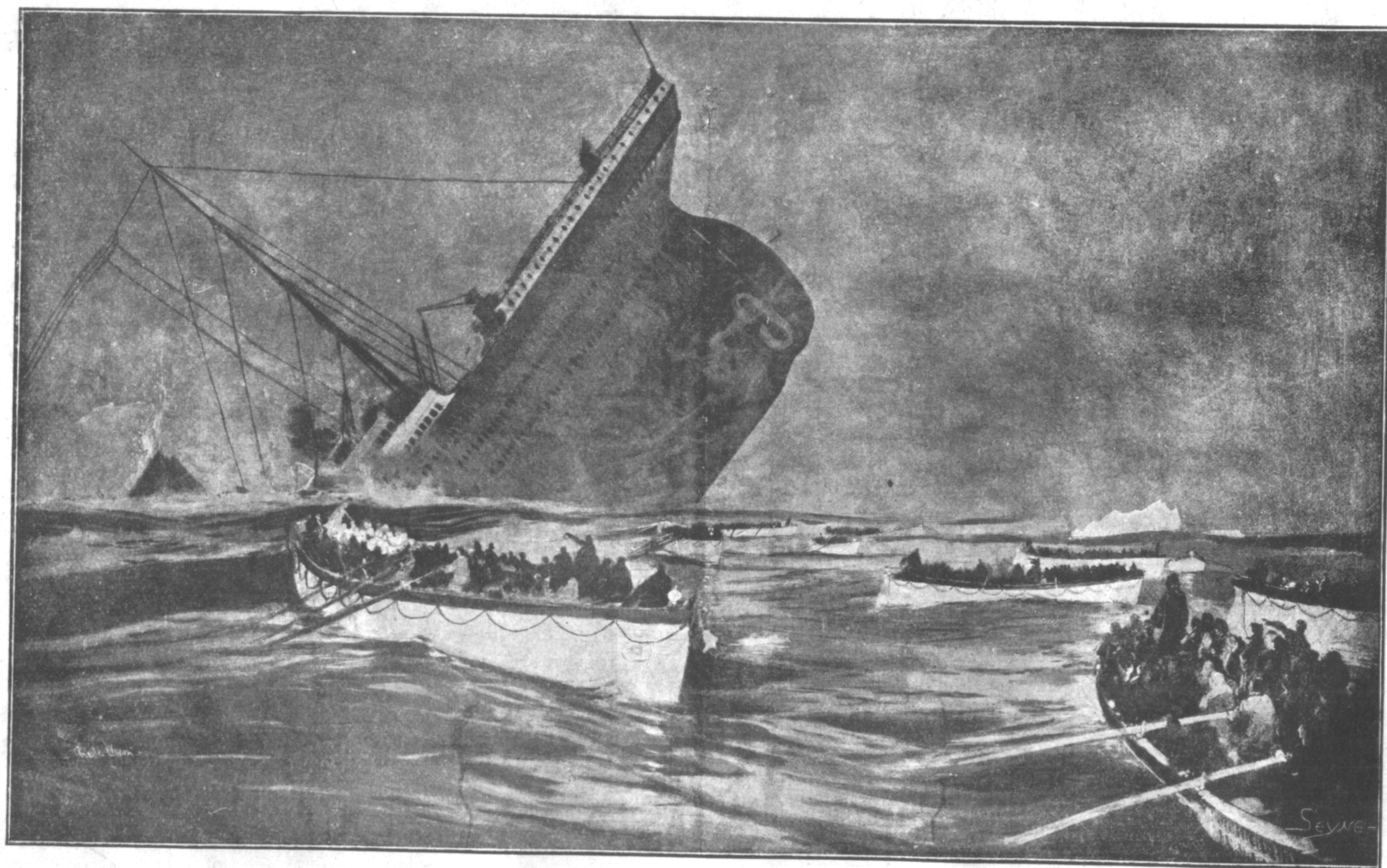
নিমজ্জমান টাইটানিক।

১৭৫৩ সালে এ সম্বন্ধে প্রথম চেষ্টার বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত বৎসর স্কটস্ ম্যাগাজিন নামক একখানি সাময়িক পত্রিকাতে কোনও অজ্ঞাতনামা লেখক তাড়িতের সাহায্যে শীঘ্র সংবাদ প্রেরণের উপায় বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন, যে যদি দুইটী স্থানের মধ্যে বর্ণমালার যতগুলি অক্ষর ততগুলি তার লাগান যায় এবং এক একটী তারের অগ্রভাগের নীচে এক একটী অক্ষর রাখা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেকটী তারের সঙ্গে তাড়িতের যোগ স্থাপন করিয়া উভয় স্থানের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। যে কথা বলিবার প্রয়োজন তাহার অক্ষর চিহ্নিত তার গুলিতে যথাক্রমে তাড়িতের যোগ স্থাপন করিয়া দিলেই অপর প্রান্তের সেই সেই অক্ষরে তার লাগিবে, অপর প্রান্তের লোক সেই সেই অক্ষর লিখিয়া লইলেই কি বলা হইতেছে, বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার কয়েক বৎসর পরে লমণ্ড নামক একজন ফরাসী-দেশীয় লোক এই উপায়ে সত্য সত্যই তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করেন। লমণ্ড স্কটস্ ম্যাগাজিনের প্রবন্ধ পড়েন নাই; নিজের স্বাধীন চেষ্টাতে তিনিও এই উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৮৮৭ সালে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি আর্থার ইয়াঙ ফরাসীদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়া লমণ্ডের টেলিগ্রাফ যন্ত্র দেখিয়া তাহার বিবরণ লিখিয়া পাঠান। তিনি লেখেন যে "এই ফরাসী বৈজ্ঞানিক তাড়িতের সাহায্যে এক অদ্ভুত কল আবিষ্কার করিয়াছেন। যদি কেহ এক খানি কাগজে কিছু লিখিয়া দেন, লমণ্ড তাহা লইয়া একটী কামরায় প্রবেশ করেন এবং তাঁহার যন্ত্র চালান। অপর একটী কামরায় তাঁহার স্ত্রী আর একটী যন্ত্র দেখিয়া অবিকল তাহা লিখিয়া দেন। তারের দৈর্ঘ্যের ন্যূনাধিক্যে যন্ত্রের ক্রিয়ার কোনও তারতম্য হয় না। সুতরাং এই যন্ত্রের সাহায্যে বহু দূরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে।" ইহার সাত বৎসরে পরে ১৭৯৪ সালে বেতনকুর্ নামক অপর একজন ফরাসী মাদ্রিদ হইতে আরানজুর নামক স্থানে ত্রিশ মাইল ব্যবধানে সংবাদ প্রেরণ করিতে সমর্থ হন।

ক্রমশঃ

মানুষের পরিচয়।

কে ভাল, কে মন্দ, তাহা মানুষের আচরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, মানুষের কথার ভঙ্গী তাহার ব্যবহার, তাহার উঠা বসা সমস্ত তাহার নিজের পরিচয় ব্যক্ত করে, আজ এই সম্বন্ধে একটি গল্প বলিব, ইহা এক খানি মাসিক হিন্দী পত্রিকা হইতে ভাবানুবাদ করিয়াছি, গল্পটি এইঃ—

এক পথের পাশে এক অন্ধ ভিখারী বসিয়াছিল। মৃগয়ার অনুসন্ধানে বাহির হইয়া এক রাজা সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পথের পাশে অন্ধ ভিক্ষুককে উপবিষ্ট দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো মহাশয়, এই পথটি কি বনের অভিমুখে গিয়াছে?" অন্ধ ভিখারী সসম্মানে কহিল, "হাঁ রাজন্, এইটিই অরণ্যে যাইবার পথ।" রাজা অন্ধের মুখে "রাজন্" শব্দ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, আমিত ভিক্ষুকের সহিত পরিচিত নই; তবে এ কেমন করিয়া আমায় রাজা বলিয়া চিনিল? রাজা তাহার কথার আর কোন উত্তর না দিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতে রাজমন্ত্রী সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি অন্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায় এটাই কি বনের পথ?" অন্ধ উত্তর করিল "হাঁ রাজমন্ত্রী,এটাই বনের পথ।" রাজমন্ত্রীও অন্ধের মুখে "রাজমন্ত্রী" শব্দ শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "আমিত অন্ধের সহিত পরিচিত নই, তবে সে কেমন করিয়া আমায় রাজমন্ত্রী বলিয়া চিনিল। অতঃপর তিনি কিছু না বলিয়া বনের দিকে চলিলেন।

অল্পক্ষণ পরে রাজভৃত্য সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও অন্ধকে ওরে অন্ধ বলিয়া পূর্ব্বগামী দুইজন পথিকের মত সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। অন্ধ ভিখারী উত্তর করিল, "হাঁ রাজভৃত্য, বনের পথ এইটাই।" রাজা ও মন্ত্রীর ন্যায় ভৃত্যও অন্ধের মুখে রাজভৃত্য শব্দ শুনিতেই বিস্মিত হইল। সেও ভাবিতে

লাগিল? অন্ধ আমায় চিনিল কেমন করিয়া। সেও কোন কথা না বলিয়া অরণ্যের দিকে প্রস্থান করিল।

কতক্ষণ পরে দৈবক্রমে রাজা, মন্ত্রী ও ভৃত্য তিন জনেই এক স্থানে আসিয়া মিলিত হইলেন। রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, আমি যখন পথ দিয়া বনের দিকে আসিতেছিলাম, সেই সময় এক অন্ধ ভিক্ষুককে পথের পাশে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওগো মহাশয়, এই পথটিই কি বনের অভিমুখে গিয়াছে।" সে কহিল, হাঁ রাজন্ "এইটিই অরণ্যে যাইবার পথ।" রাজার কথা শেষ হইতেই মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ আমিও অন্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মশায় এটাই কি বনের পথ?" অন্ধ উত্তর করিল, "হাঁ রাজমন্ত্রী, এটাই বনের পথ।" মন্ত্রীর কথা শেষ হইতেই রাজভৃত্য কহিল "হুজুর, আমি অন্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ওরে অন্ধ, বনের পথ কি এই দিকে? সে অমনি বলিল। হাঁ রাজভৃত্য, বনের পথ ঐ দিকে"। রাজা ও ভৃত্য ইহার কি কারণ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। মন্ত্রী বড় বুদ্ধিমান; তিনি রাজাকে কহিলেন, "রাজন্ অন্ধ বড় চতুর সে আমাদের তিন জনের সম্বোধন সূচক তিন প্রকারের শব্দ উচ্চারণ শুনিয়াই প্রত্যেককে চিনিয়াছে। সে জানে রাজা উদারচেতা, তিনি মহৎ, তাই সম্বোধনে ওগো মশায় শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, মন্ত্রী ভদ্রসন্তান কিন্তু ঈষৎ অহঙ্কারী তাই সম্বোধনে মশায় শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, রাজ ভৃত্য পদে নীচ প্রবৃত্তি নীচ, তাই অভদ্র ভাষায় ওরে অন্ধ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী।
উনাও (অযোধ্যা)

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল,

১।	৩০	৩৯	৪৮	১	১০	১৯	২৮
	৩৮	৪৭	৭	৯	১৮	২৭	২৯
	৪৬	৬	৮	১৭	২৬	৩৫	৩৭
	৫	১৪	১৬	২৫	৩৪	৩৬	৪৫
	১৩	১৫	২৪	৩৩	৪২	৪৪	৪
	২১	২৩	৩২	৪১	৪৩	৩	১২
	২২	৩১	৪০	৪৯	২	১১	২০

২। দাবা খেলার রাজা।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীপ্রভাতকুমার চৌধুরী (নিমতিতা), শ্রীপরিমল গোস্বামী (পেতোজিয়া)।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীসচ্চিদানন্দ দত্ত (টাঙ্গু), শ্রীঅমিয়কন্তে চৌধুরী (পটীয়া এইচ, ই, স্কুল), শ্রীনলিনকুমার বসু (ঢাকা), শ্রীসুখময় গুহ, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ শীল (সাঁওনি) শ্রীশশাঙ্ক-শঙ্কর রায় (কটক), শ্রীঅন্নদাচন্দ্র গুপ্ত (বাহারিয়া) শ্রীহিমাদ্রিকুমার শর্ম্মা (শিলং), শ্রীনীরোদগোপাল গোস্বামী (খিদিরপুর), শ্রীললিতকুমার দে (ভবানীপুর) শ্রীশক্তিপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় (নাগপুর। শ্রীব্রজেন্দ্র-লাল দত্ত।

নূতন ধাঁধা।

(শ্রীইরেশলাল চৌধুরী প্রেরিত)

১। আটচালের ঘর খানি একটীমাত্র খুঁটী।
রোদবৃষ্টি মধ্যে ঘর করে ছুটাছুটী॥
ঘর ছিদ্র করে খুঁটি উঠেছে উপরে।
কি আশ্চর্য্য তবু ঘরে জল নাহি পড়ে॥

(কুমারী শেফালিকা রায় প্রেরিত)

২। বঙ্গের নূতন কবি কে?

৩। কে বড় সোজা লেখক নহেন?

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। ধাঁধার সহিত উত্তর না পাঠাইলে সে ধাঁধা প্রকাশিত হয় না।

২। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সময় গ্রাহক নম্বর না দিলে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করা হয় না।

রাজা হ'তেম যদি।

ও পাড়ায় ছিল দুষ্টু এক ছেলে
নামটী তাহার রবি,
পোষাকে যেমন ছিল তার ঝোঁক
আহারে তেমনি লোভী।
পাঠে কভু তার ছিল নাক মন
পেটের ভাবনা ভারি,

পিঠেতে যদিও চট্ পটাপট্
পড়িত বেতের বাড়ি।
একদা সে গেল সহর দেখিতে
মনে মনে ছিল আশ,
পেট্‌টি পূরিয়া খাইবে মিঠাই
পরিবে নূতন বাস।
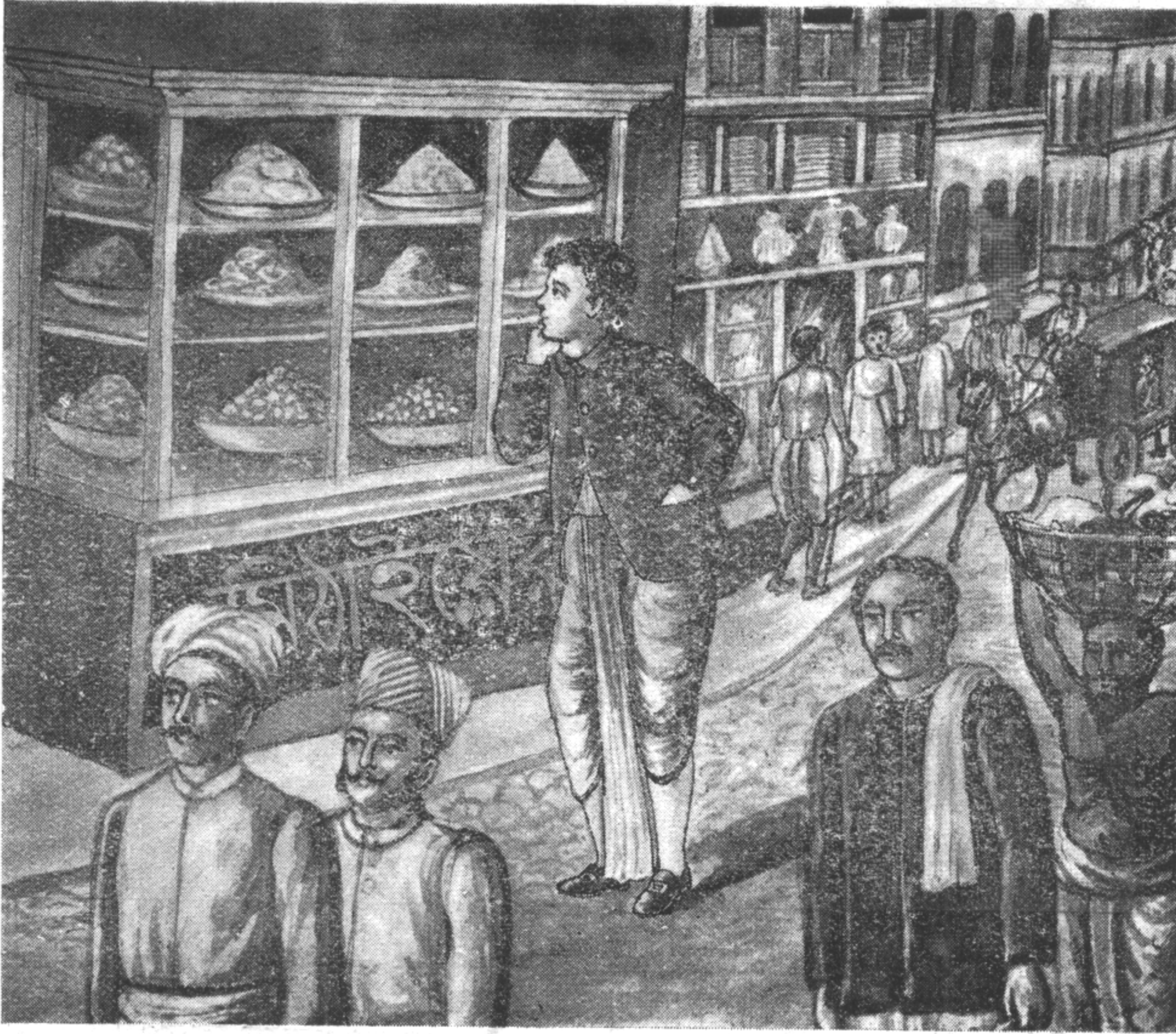
সহরেতে গিয়ে রবি দেখে চেয়ে
সেথা কোলাহল ভারি,
লোকের উপরে পড়িতেছে লোক
গাড়ীর উপরে গাড়ী।

দোকানের সার শোভিছে দুধার
মণি মুকুতার মত,
যা' দেখে নয়নে সাধ যায় মনে
কিনে ফেলে শত শত।

মেঠাই দোকানে কাচের বাসনে
রয়েছে কত যে খাদ্য,
গজা, মতি চূড়, খাজা, রসপুর,—
কহিবে কাহার সাধ্য!

দেখিয়ে রবির আঁখি হ'ল স্থির
মুখে পড়ে তার লাল,
"রাজা যদি ঠিক হইতাম আমি
ভরিতাম দুই গাল।"
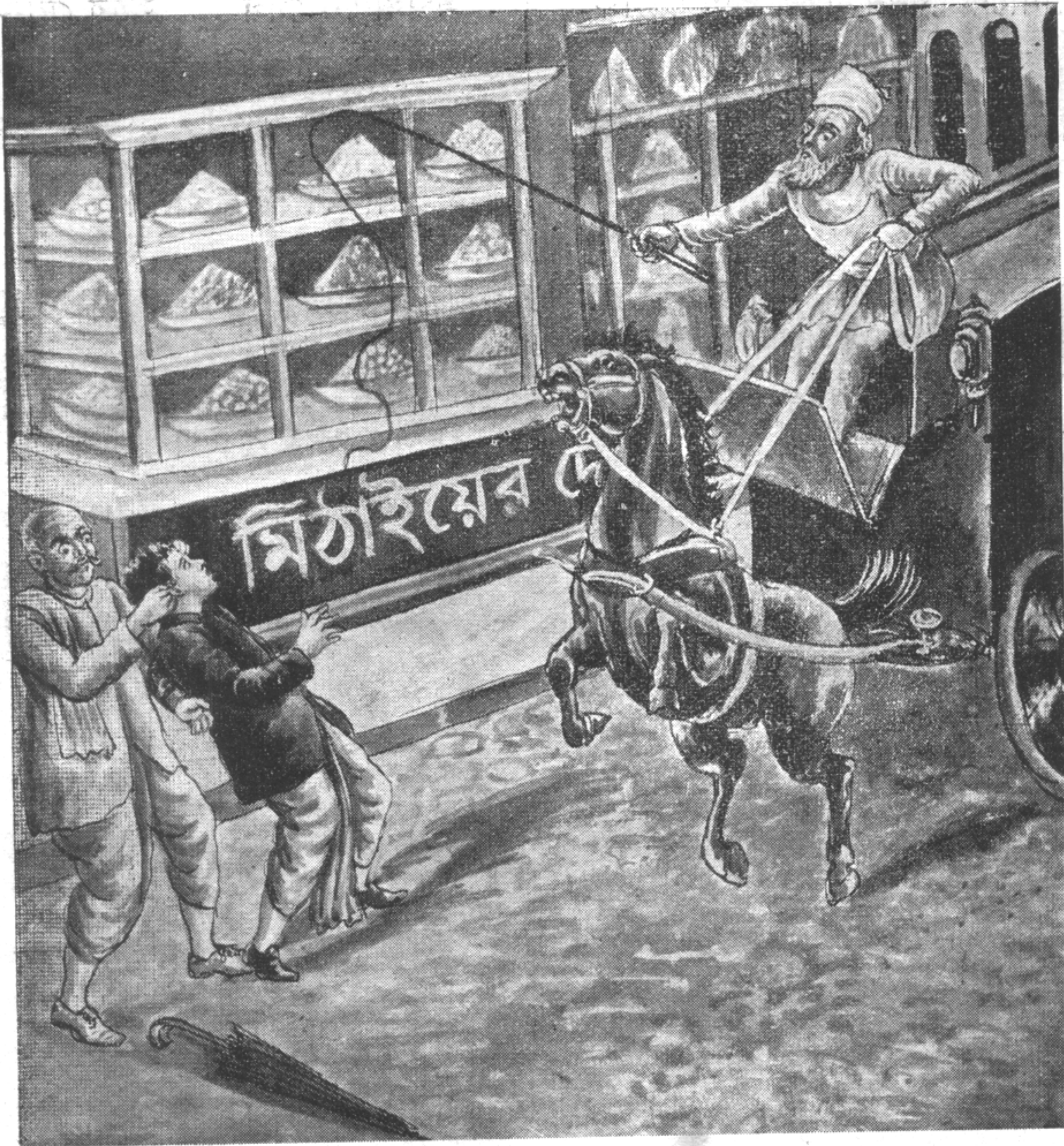
ভ্যাবাচাকা হ'য়ে আছে রবি চেয়ে
নাহি যেন তার জ্ঞান,
গাড়ী উঠে ঘাড়ে, তবুও না নড়ে
ক'শে মারে গাড়োয়ান।
চাবুক খাইয়া ভাঙিল চমক্
ধমক লাগিল প্রাণে,

ফিরিতে আবার পড়ে যায় ঘুরে
সেজন ধরিছে কাণে।
শেষে ভাবে রবি, হায়রে প্রমাদ,
পাড়াগাঁটা মোর বেশ,
আহারে বিহারে করিব না লোভ,
শিক্ষার হয়েছে শেষ।

২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
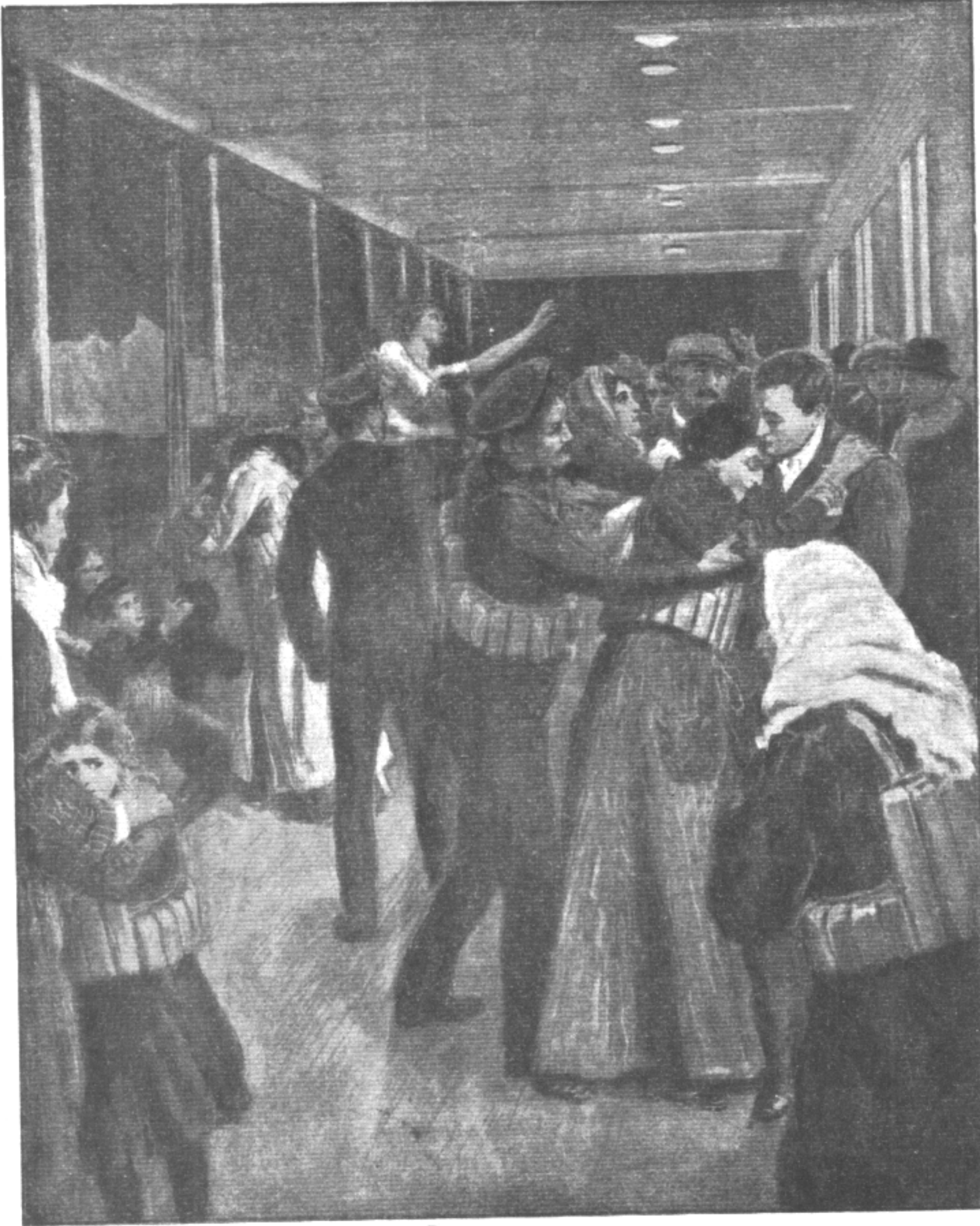
টাইটানিকের স্ত্রীলোকদিগের উদ্ধার।
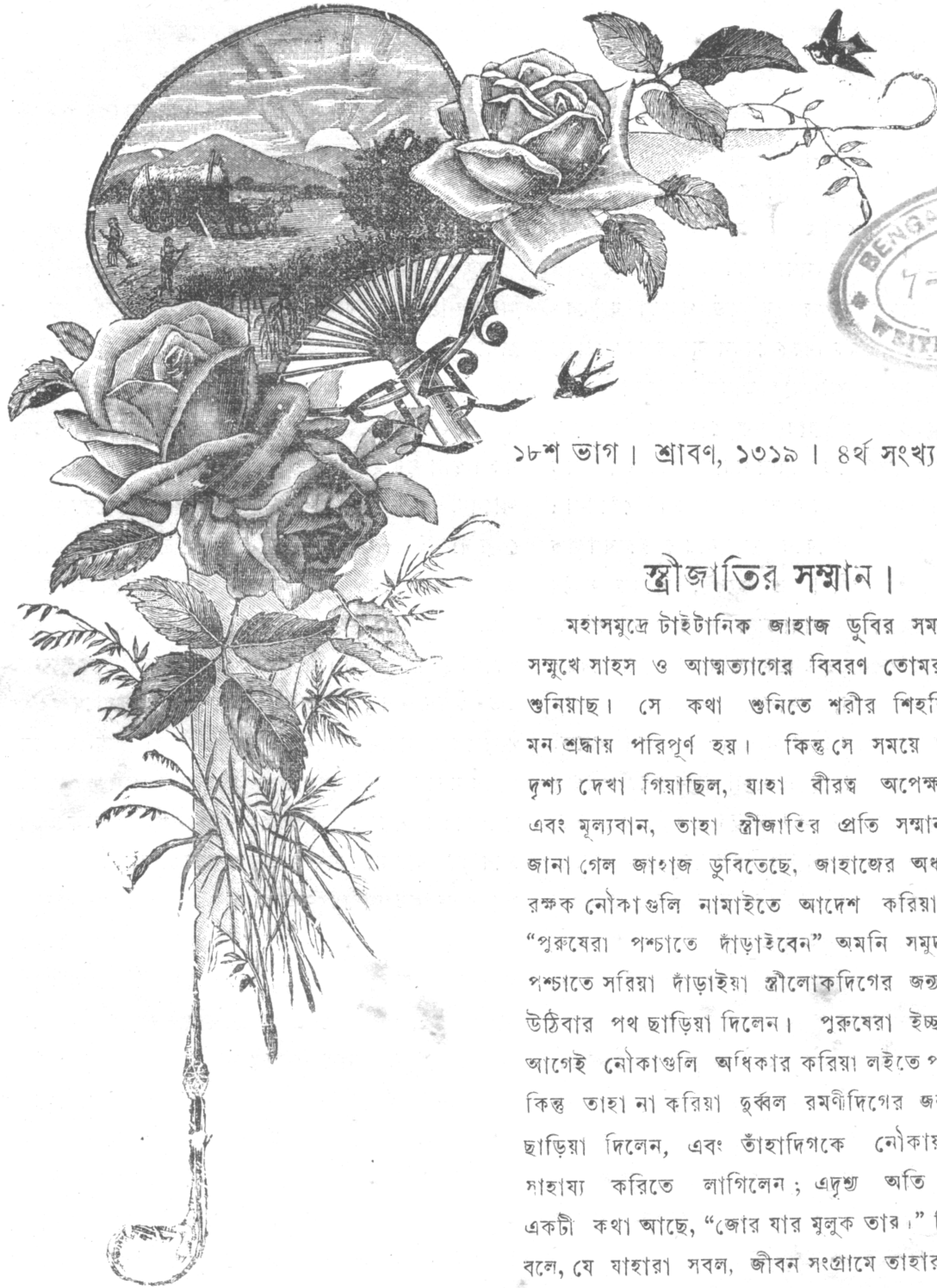
১৮শ ভাগ। শ্রাবণ, ১৩১৯। ৪র্থ সংখ্যা।

স্ত্রীজাতির সম্মান।

মহাসমুদ্রে টাইটানিক জাহাজ ডুবির সময়ে মৃত্যুর সম্মুখে সাহস ও আত্মত্যাগের বিবরণ তোমরা অনেক শুনিয়াছ। সে কথা শুনিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, মন শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু সে সময়ে আর এক দৃশ্য দেখা গিয়াছিল, যাহা বীরত্ব অপেক্ষাও দুর্ল্লভ এবং মূল্যবান, তাহা স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান। যখন জানা গেল জাহাজ ডুবিতেছে, জাহাজের অধ্যক্ষ জীবন রক্ষক নৌকাগুলি নামাইতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "পুরুষেরা পশ্চাতে দাঁড়াইবেন" অমনি সমুদয় পুরুষ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকদিগের জন্য নৌকায় উঠিবার পথ ছাড়িয়া দিলেন। পুরুষেরা ইচ্ছা করিলে আগেই নৌকাগুলি অধিকার করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া দুর্ব্বল রমণীদিগের জন্য নৌকা ছাড়িয়া দিলেন, এবং তাঁহাদিগকে নৌকায় উঠিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন; এদৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। একটী কথা আছে, "জোর যার মুলুক তার।" বিজ্ঞানেও বলে, যে যাহারা সবল, জীবন সংগ্রামে তাহারাই বাঁচে, এ কথা যে একেবারে অসত্য, তাহা নহে। জীবরাজ্যে

দেখা যায়, সবলের পীড়নে দুর্ব্বল প্রাণ হারায়। বনে বড় গাছটীর আওতায় ছোট গাছটী মারা যায়; সবল কুকুরটা দুর্ব্বলটীকে তাড়াইয়া দিয়া নিজে সকল খাদ্য টুকু খাইয়া লয়; যে পাখীটা বেশী শীঘ্র উড়িতে পারে, সেই আগে গিয়া খাবার খাইয়া লয়। দুর্ব্বল জন্তুগুলি খাদ্যাভাবে আস্তে আস্তে আরও দুর্ব্বল হইয়া মারা পড়ে। মানুষের মধ্যেও দুর্ব্বলের পরাজয় ও সবলের জয় নীতি দেখিতে পাওয়া যায়। আদিম অসভ্য অবস্থা হইতে বর্ত্তমানের সুসভ্য সমাজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সবলের অত্যাচারের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু মানবের মধ্যে এক দিকে যেমন আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি আছে, অর্থাৎ মানুষ আপনার জীবন, আপনার স্বার্থ, আপনার সুখ রক্ষা করিবার জন্য যেমন চেষ্টা করে, তেমনি মানুষের প্রকৃতিতে আবার পরার্থপরতা ও দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ কেবল আপনার সুখই দেখেনা; পরের সুখ এবং সুবিধাও দেখে। আপনার সুখের ব্যাঘাত না করিয়া পরের সুবিধা ত করেই, অনেক সময়ে আবার আপনার সুখের ব্যাঘাত করিয়াও পরের সুবিধা করিয়া দেয়। সবল দুর্ব্বলকে স্থান ছাড়িয়া দেয়; আপনার মুখের খাদ্য, আপনার আশ্রয়, আপনার বাঁচিবার উপায় দুর্ব্বলকে দিয়া আপনি অনাহারে থাকে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে কষ্ট পায়, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। ইহাই মানবে দেবত্ব; ইহারই জন্য মানুষ কেবল পশু নয়, মানুষ দেবতাও বটে। মানুষ যত উন্নত হয়, তত তাহাতে এই দেবভাব বিকশিত হইয়া উঠে। সভ্য সমাজের একটী প্রধান লক্ষণ দুর্ব্বলের প্রতি, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির প্রতি করুণ ব্যবহার। শারীরিক বলে স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা হীন, সুতরাং জীবন সংগ্রামে পুরুষ অনায়াসেই স্ত্রীকে পশ্চাতে ফেলিয়া নিজের সুখ সুবিধা ভোগ করিতে পারে এবং অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বত্রই তাহা করিয়া থাকে। এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশেই স্ত্রীলোকের প্রতি অনেক অত্যাচার ও অবিচার চলিতেছে; পুরুষ যাহা সচ্ছন্দে করে, স্ত্রীলোককে তাহা করিতে দেয় না, পুরুষ আপনাদের সুখের জন্য যাহা নিত্য প্রয়োজনীয় মনে করে, স্ত্রীলোককে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখে। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে সময়ে সময়ে আপনাদের সুখ ও সুবিধা তুচ্ছ করিয়া পুরুষ স্ত্রীলোকদিগের সুখ অগ্রে দেখে। পাশ্চাত্য জগতে এই ভাব বেশ বদ্ধমূল হইয়াছে। সেখানে বাল্যকাল হইতে পুরুষদিগকে আগে স্ত্রীলোকদের সুখ ও সুবিধা দেখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোনও ফল বা মিষ্টান্ন আনিয়া, ভাই আগে বোনদের দিয়া পরে নিজে খাইবে, আহারে বসিলে আগে স্ত্রীলোকদিগকে পরিবেশন করা হইবে, তাহার পর পুরুষদের। গাড়ীতে আগে স্ত্রীলোকরা বসিবেন, স্থান থাকিলে পরে পুরুষেরা বসিবেন। স্ত্রীলোকেরা আসিলে পুরুষেরা তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সম্মান করিবেন, তিনি আসন গ্রহণ করিলে তবে পুরুষেরা বসিবেন। রেলগাড়ীতে বা ট্রামে সকল স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যদি কোনও স্ত্রীলোক আসেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বসিতে দিয়া পুরুষদের মধ্যে কেহ দাঁড়াইয়া যাইবেন। যদি কেহ স্ত্রীলোকের প্রতি এই প্রকার সম্মান না দেখান, তাহা হইলে তাঁহাকে অভদ্র মনে করা হয়। স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মানের শেষ পরীক্ষা মৃত্যুর সম্মুখে। কিঞ্চিৎ আরাম, বা স্বার্থ ত্যাগ তত কঠিন নয়; সভ্যতার নিয়মের অনুরোধে ট্রাম গাড়ীতে না হয় দশ মিনিট দাঁড়াইয়া গেল; কিন্তু যেখানে জীবন মরণের কথা, সেখানেও যদি স্ত্রীলোকের সুবিধা, স্ত্রীলোকের সম্মান, স্ত্রীলোকের জীবন আগে রক্ষিত হয় তবে বুঝা যায় মানবসমাজ প্রকৃত সভ্যতা লাভ করিয়াছে। সমুদ্রবক্ষে ইউরোপীয় সভ্যতা এই চরম পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সমুদ্রের নিয়মই এই, "স্ত্রীলোকের স্থান সর্ব্বাগ্রে"। জাহাজ ডুবিবার উপক্রম হইলে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোকদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কেবল যে সেদিন টাইটানিকের জাহাজের যাত্রী ও নাবিকেরাই আপনাদের প্রাণ দিয়া স্ত্রীলোকদের বাঁচাইয়াছিলেন তাহা নহে, এ পর্য্যন্ত যত জাহাজ ডুবিয়াছে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রতিপালিত হইয়াছে। টাইটানিক জাহাজে এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে গিয়া কষ্টের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল, তথাপি এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেওয়া

হয় নাই। কেবল স্ত্রীলোকদিগকে না বাঁচাইয়া যাঁহারা বাঁচিয়াছেন, তাঁহাদের স্বামীদিগকেও নৌকায় তুলিয়া লইলে ভাল হইত; তাহাতে যদি অল্পসংখ্যক স্ত্রীলোক বাঁচিতেন, তবু ভাল ছিল; কারণ যাঁহাদের স্বামীরা বাঁচেন নাই, নিজেরা বাঁচিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে এখন জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর মনে করিতেছেন। স্ত্রীলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও এই ব্যবস্থা অধিকতর ভাল বলিতেন। স্বামীকে ছাড়িয়া কেহই বাঁচিতে ইচ্ছা করেন নাই। যাহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, পরে তাঁহাদের স্বামীরাও আসিবেন। যদি জানিতেন যে তাঁহাদের স্বামীরা রক্ষা পাইবেন না, তাহা হইলে অনেকেই নৌকায় উঠিতে সম্মত হইতেন না। অনেককেই ভুলাইয়া বা বল প্রকাশ করিয়া স্বামীর আলিঙ্গন হইতে ছাড়াইয়া নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইসিডোর ষ্ট্রস্ নামে আমেরিকার এক জন লক্ষপতি সস্ত্রীক টাইটানিক জাহাজে যাইতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রীকে বলপ্রকাশ করিয়াও স্বামীর পার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় নাই। ষ্ট্রস্ পত্নী স্বামীকে ছাড়িয়া কোনও মতেই জীবন রক্ষক তরণীতে উঠিলেন না। অবশেষে স্বামী স্ত্রী হাত ধরাধরি করিয়া একত্র অতল সমুদ্রগর্ভে চিরতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

টাইটানিক ধ্বংশের পরে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে অনেক মহিলাই লিখিয়াছিলেন, যে স্ত্রীলোকদের জীবন অগ্রে রক্ষা করার নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত, কারণ স্ত্রীলোকদের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া অনেক মূল্যবান জীবন নষ্ট হয়; স্বামী ছাড়িয়া বাঁচা অপেক্ষা, স্বামীর সঙ্গে মরা ভাল এবং তাহার স্থানে এক জন পুরুষের প্রাণ রক্ষা হইলে অধিক কল্যাণ হইতে পারে। ফলাফল যাহাই হউক না কেন, সকল পুরুষ আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিয়া অসহায় দুর্ব্বল রমণীদিগকে রক্ষা করিতেছে এ দৃশ্য অতি মহৎ, ইহা স্বর্গীয়। স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ইউরোপীয় সভ্যতার একটী অতি মূল্যবান পদার্থ। পৃথিবীর সকল জাতি ইহার অনুকরণ করে, ইহা বাঞ্ছনীয়।

বৈদ্যুতিক ভোজবাজী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই রূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে বৈজ্ঞানিকগণ ধীরে ধীরে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের উন্নতি করিতেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তাঁহাদের চেষ্টা প্রায় সফল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮১৬ সালে রোনাল্ডস নামক একজন ইংরেজ হ্যামারস্মিথে একটী টেলিগ্রাফ যন্ত্র খাটাইয়া ছিলেন, যাহার দ্বারা তিনি এক তারে আট মাইল দূরে সংবাদ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন অধ্যাপক, গাউস এবং ওয়েবার এক মাইল দূরে থাকিয়া তাড়িতের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ করিতেন। ইহাকেই পৃথিবীর সর্ব্ব প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের যন্ত্রে অনেক ত্রুটী ছিল; সর্ব্বদা সাধারণের ব্যবহারে আনিতে তাহার অনেক উন্নতি সাধন প্রয়োজন ছিল। জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী টেলিগ্রাফ যন্ত্র নির্ম্মাণের গৌরব হুইটষ্টোন এবং কুক নামক দুই জন ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের প্রাপ্য। ইঁহাদের দুইজনের সমবেত চেষ্টায় ১৮৩৭ সালে, অর্থাৎ পরলোকগত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনাধিরোহণ বৎসরে প্রথম রীতিমত টেলিগ্রাফের লাইন স্থাপিত হয়। এখানে আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের জীবনের ইতিহাস দিতেছি। তাঁহাদের জীবন কাহিনী একাধিক কারণে অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক এবং শিক্ষাপ্রদ। টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা অমর হইয়াছেন; সেজন্য তাঁহাদের জীবনী সকলেরই জানা উচিত। তদ্ভিন্ন তাঁহারা, বিশেষতঃ হুইটষ্টোন, যেরূপে সামান্য অবস্থা হইতে নিজের চেষ্টায় জগতের এক জন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন, সে কাহিনী গভীর শিক্ষা এবং আশাপ্রদ।

চার্লস হুইটষ্টোন ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গ্লষ্টার নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঐ নগরে গানের কাগজ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। চার্লস বাল্যকালে গ্লষ্টারের এক স্কুলে সামান্য শিক্ষা লাভ

করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ বৈজ্ঞানিক কোনও উচ্চ শ্রেণীর স্কুল বা কলেজে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই। বৈদ্যুতিক ভোজবাজীর সম্পর্কে যে সকল প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকদিগের বিষয় আমাদিগকে বলিতে হইবে, তাঁহাদের অনেকেরই সম্বন্ধে এই কথা খাটে। স্কুল কলেজে পড়িয়া তাঁহারা জ্ঞান লাভ করেন নাই। সম্পূর্ণরূপে নিজের চেষ্টাতে সামান্য অবস্থার মধ্যে তাঁহারা আপন আপন অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছিলেন। হুইটষ্টোন গ্লষ্টারের সামান্য স্কুলে পাঠ সময়েই অঙ্ক এবং বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শিতার আভাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু অবস্থার প্রতিকূলতায় তৎকালে এই স্বাভাবিক ক্ষমতা বিকাশের আর কোনও সুযোগ হয় নাই।

হুইটষ্টোনের বাল্যকালেই তাঁহার পিতা গ্লষ্টার হইতে লণ্ডনে আসিয়া বাস করেন। হুইটষ্টোনকে এই সময় হইতেই জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। প্রথমতঃ তিনি বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। হুইটষ্টোন যদিও তখন তাহা জানিতেন না, কিন্তু এই কার্য্য তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে সহায় হইয়াছিল। তাঁহার কর্ম্মকুশল, উদ্ভাবনশীল প্রকৃতি এই ব্যবসায়ে শব্দতত্ত্ববিষয়ে মৌলিক গবেষণা এবং পরীক্ষার সুযোগ পাইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে করিতে হুইটষ্টোন অনেক প্রকার নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার এবং নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

১৮৩৩ সালে হুইটষ্টোন শব্দতত্ত্ব বিষয়ে একটী চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এখন হইতেই বৈজ্ঞানিক সমাজে তাঁহার খ্যাতি প্রসার লাভ করিতে লাগিল। পর বৎসর তিনি তাড়িতের গতি বিষয়ে একটী অতি গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করিলেন, যে আলোক অপেক্ষা তাড়িত দ্রুতগামী। জগদ্বিখ্যাত রয়াল সোসাইটীর একটা সভাতে তাঁহার প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার প্রবন্ধের প্রশংসা করেন। ইহার কিছুদিন পরে হুইটষ্টোন লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গ্লষ্টারের গানের কাগজ বিক্রেতার পুত্র, যিনি কোনও দিন কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া মাড়ান নাই, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য দোকানে কাজ করিতে করিতে অবসর সময়ে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজের অধ্যাপকের পদে উন্নীত হওয়া সামান্য কথা নহে। দুই বৎসর পর তিনি রয়াল সোসাইটীর ফেলো মনোনীত হন। ইউনিভার্সিটী কলেজের যন্ত্রাগারে হুইটষ্টোন টেলিগ্রাফের বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি টেলিগ্রাফ ভিন্ন আরও অনেক প্রকারের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছিলেন; কিন্তু এখানে সে সকলের উল্লেখের প্রয়োজন নাই, আপাততঃ আমরা টেলিগ্রাফের বিষয়েই বলিব। টেলিগ্রাফের আবিষ্কার কতটা হুইটষ্টোনের নিজের কাজ, এবং কতটা তাঁহার সহযোগী কুকের তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ১৮৩৭ সালের প্রথম হইতে তাঁহারা একত্র কাজ করিয়াছিলেন; সেই বৎসর জুন মাসে দুই জনে মিলিয়া নর্থওয়েষ্ট রেলওয়ের ইউষ্টন ও ক্যামডেন টাউনের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার স্থাপন করিয়া তাড়িতের সাহায্যে দূরে সংবাদ প্রেরণ সহজসাধ্য প্রমাণ করেন। কিন্তু তাহাতেও জন সাধারণের মধ্যে টেলিগ্রাফ প্রচলিত হয় নাই, তাঁহাদিগকে আরও অনেক দিন অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের এই মিলিত চেষ্টার কথা পরে বলিতেছি। তৎপূর্ব্বে হুইটষ্টোনের সহযোগী কুকের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিব।

কুক হুইটষ্টোন অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন, এবং বাল্যকাল হইতে তাঁহার শিক্ষারও অধিকতর সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার পিতা লণ্ডনের নিকটস্থ ইলিং নামক স্থানের ডাক্তার ছিলেন; এখানেই ১৮০৬ সালে উইলিয়াম ফথারগিল কুকের জন্ম হয়। কুকের জন্মের পরে তাঁহার পিতা ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ডারহামে অবস্থিতি করেন। ডারহাম সহরে কুকের শিক্ষা আরম্ভ হয়; পরে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন।

বিশ বৎসর বয়সে তিনি সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আসেন, এবং পাঁচ বৎসর কাল এদেশে অবস্থিতি করেন। তৎপরে স্বদেশে ফিরিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে মনস্থ করেন, এবং সেই জন্য প্রথমে পারিস ও তৎপরে জর্ম্মানির মিউনিক সহরে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। ভবিষ্যতে যে কার্য্যের জন্য তিনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কুকের কোনও পারদর্শিতা বা আগ্রহ দেখা যায় নাই। মিউনিকে অবস্থান কালেই তাড়িতের সাহায্যে দূরে সংবাদ প্রেরণের সম্ভাবনা বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ প্রথম আকৃষ্ট হয়। কুক যে অধ্যাপকের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন, তিনি তাড়িত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং একদিন তিনি যে বিষয় পড়াইতেছিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী টেলিগ্রাফের তার প্রস্তুত করিয়া ছাত্রদিগকে দেখাইয়াছিলেন।

কুক অতিশয় আগ্রহ এবং উৎসাহের সঙ্গে এই নূতন যন্ত্রের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন, যে এই উপায়ে দূরে সংবাদ প্রেরণ করিবার সুবিধা হইতে পারে এবং ভবিষ্যতে ইহা দ্বারা জগতের অনেক কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে। সেই মুহূর্ত্ত হইতে কুক এই কার্য্যে আপনার সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিলেন। চিকিৎসা ব্যবসায় প্রভৃতি আর কিছুই তাঁহার চিন্তায় স্থান পাইল না। তখন তিনি একাগ্রচিত্তে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

১৮৩৭ সালের প্রথমে কুক ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন, এবং সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের সহিত পরিচিত হন। ফ্যারাডে তাঁহার উদ্দেশ্যের বিষয় অবগত হইয়া হুইটষ্টোনের সঙ্গে কুকের আলাপ করিয়া দেন। পরস্পরের কার্য্য এবং উদ্দেশ্য বিষয়ে ঘনিষ্ঠ আলাপের পর হুইটষ্টোন এবং কুক একত্র কার্য্য করিতে মনস্থ করিলেন। এ বন্দোবস্ত ভালই হইয়াছিল; কারণ কুকের বিলক্ষণ ব্যবসায় বুদ্ধি এবং উদ্যম ছিল, হুইটষ্টোনের যাহা ছিল না; অপর দিকে হুইটষ্টোনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি অধিক ছিল। দুই জনে মিলিয়া তাঁহারা একটী টেলিগ্রাফ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাহার পেটেণ্ট গ্রহণ করিলেন। পেটেণ্ট গ্রহণ করিলে আর কেহ সে যন্ত্রের নকল করিয়া তাহার লাভের অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।
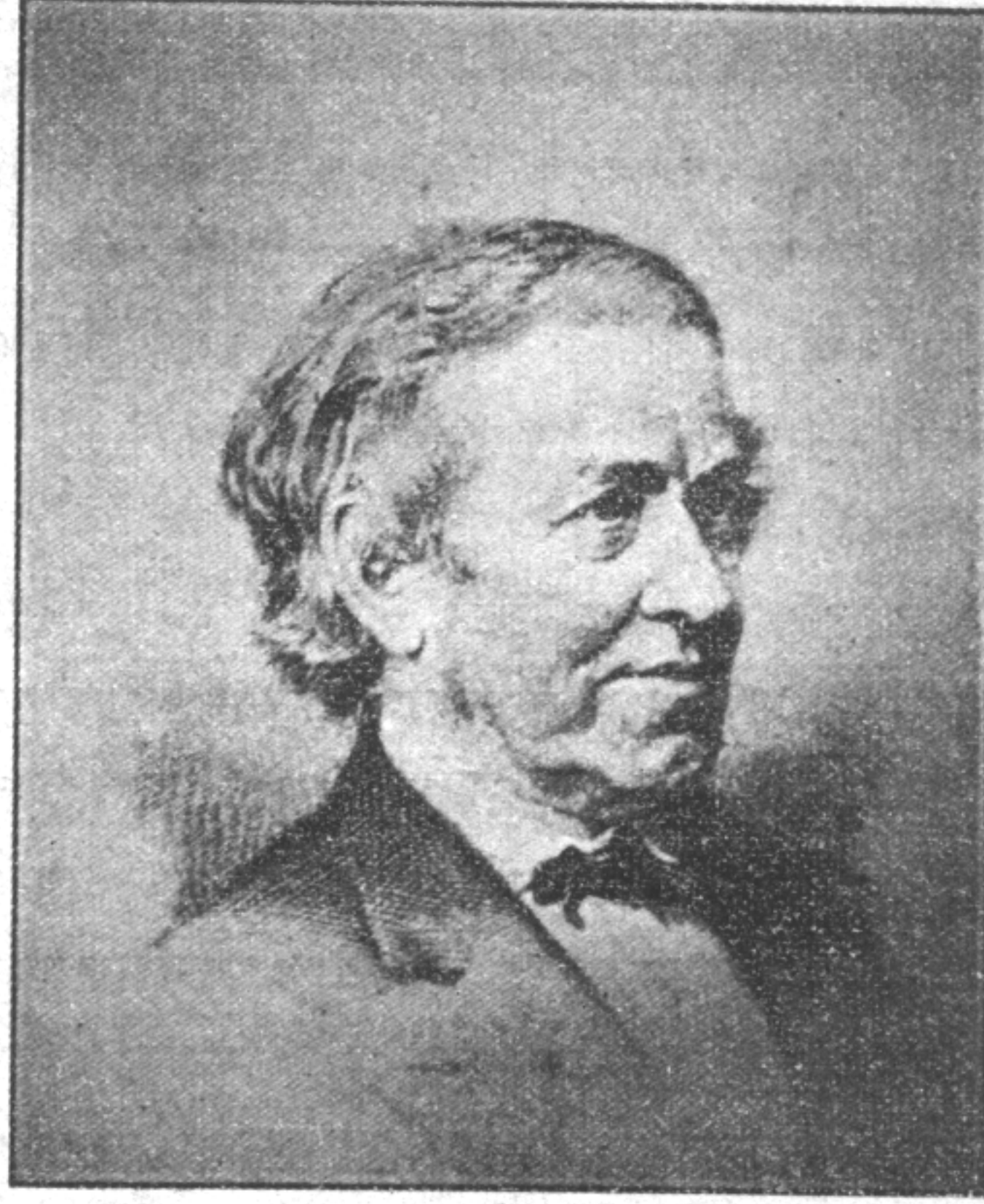
সার চার্লস হুইটষ্টোন।

এখন হুইটষ্টোন এবং কুক আপনাদের নির্ম্মিত যন্ত্র জন সাধারণে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই ইংলণ্ডে রেলের গাড়ী প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। প্রথমতঃ তাঁহারা রেলওয়ে ষ্টেশনের মধ্যে টেলিগ্রাফের লাইন স্থাপনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখন ত টেলিগ্রাফের লাইন ছাড়া রেলওয়ের লাইন আমরা দেখিতেই পাই না। টেলিগ্রাফ ছাড়া রেল রাস্তার কাজ সম্ভব বলিয়াই মনে হয় না। কিন্তু প্রথম যখন রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ হইয়াছিল তখন টেলিগ্রাফের লাইন ছিল না। হুইটষ্টোন এবং কুক রেলওয়ে কোম্পানিগুলিকে টেলিগ্রাফের উপকারিতা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পরে

ইংলণ্ডের নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানি পরীক্ষার জন্য আপনাদের লাইনের ইউষ্টন ও ক্যামডেন টাউন নামক দুই ষ্টেশনের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার বসাইবার অনুমতি দিলেন। যথা সময়ে তার বসান হইল। ১৮৩৭ সালের ২৫ জুলাই তার বসান এবং যন্ত্র প্রস্তুত হইল; সেই দিন তারে প্রথম সংবাদ প্রেরিত হইবে। হুইটষ্টোন এবং কুক অতিশয় ব্যগ্রতা এবং উৎকণ্ঠা সহকারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই যন্ত্রের কৃতকার্য্যতার উপরে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছিল। কিন্তু তাঁহারাও জানিতেন না, যে কেবল তাঁহাদের নহে ভবিষ্যৎ সভ্যতার গতিও অনেক পরিমাণে তাঁহাদের সেদিনের পরীক্ষার উপরে নির্ভর করিতেছিল।

হুইটষ্টোন একাকী ইউষ্টন ষ্টেশনে তারের এক প্রান্তে যন্ত্র ধরিয়া বসিলেন; ক্যামডেন টাউনে কুক সুবিখ্যাত ষ্টিভেন্সন এবং চার্লস কক্সের সঙ্গে অপর প্রান্তস্থিত যন্ত্রের নিকটে দণ্ডায়মান। হুইটষ্টোন কল টিপিলেন, কুক তাঁহার প্রেরিত সংবাদ পড়িতে পারিলেন; তাঁহাদের পরীক্ষা সম্পূর্ণ সফল হইল। কিন্তু তবুও জনসাধারণ বা রেলওয়ে কোম্পানিরা এবিষয়ে বেশী আগ্রহ দেখাইল না। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষেরা শীঘ্র তার উঠাইয়া লইবার জন্য আদেশ করিলেন; এমন কি এক জন ডিরেক্টর নূতন হুজুক তুলিয়াছে বলিয়া হুইটষ্টোন এবং কুক ও তাঁহাদের আবিষ্কৃত যন্ত্রের নিন্দা করিয়াছিলেন। এই ব্যবহারে তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইলেও নিরাশ হইলেন না। তাঁহারা নিজে পরীক্ষা করিয়া তাড়িতের সাহায্যে দূরে সংবাদ প্রেরণ সহজসাধ্য বলিয়া দেখিয়াছেন; এখন জন সাধারণের মধ্যে ইহার প্রচলনে যাহা বিলম্ব। তাঁহারা নিশ্চিত জানিতেন, যে শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক লোকে ইহার উপকারিতা বুঝিবেই বুঝিবে। ইতিমধ্যে তাঁহারা আপনাদের যন্ত্রেরও উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। ১৮৩৯ সালে গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেল রাস্তায় ১২ মাইল দূরবর্ত্তী দুইটী ষ্টেশনের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার বসাইতে অনুমতি পাইলেন। এই তার বেশ কাজ করিতে লাগিল। ১৮৪০ সালে হুইটষ্টোন তাঁহাদের যন্ত্রের আরও উন্নতি করিলেন। তখন লোকে ইহার উপকারিতা অনুভব করিতে লাগিল, এবং অনেক বড় বড় সহরের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার বসাইবার প্রস্তাব আসিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃতকার্য্যতার মুহূর্ত্তে হুইটষ্টোন এবং কুকের মধ্যে টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কারে আপন আপন অংশ লইয়া বিবাদ বাধিল। সে বিবাদের বিবরণ বা মীমাংসা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

১৮৪৩ সালে হুইটষ্টোন এবং কুক বিবাদ রফা করিয়া গেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই যে টেলিগ্রাফ দেশের মধ্যে বহুল পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ এই, যে ১৮৩২ সালে ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ কোম্পানি হুইটষ্টোন এবং কুকের নিকট হইতে১৪০০০০পাউণ্ড অর্থাৎ দুই কোটী বিশ লক্ষ টাকা মূল্যে তাঁহাদের পেটেণ্ট ক্রয় করিয়া লইয়াছিল। অনতি বিলম্বে আবিষ্কর্ত্তাদের যশ দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইল। ১৮৬৮ সালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হুইটষ্টোনকে "সার" উপাধি প্রদান করিলেন। ১৮৬৯ সালে এডিন বরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল, এল, ডি উপাধি প্রদান করেন। এই বৎসর গবর্ণমেণ্ট কুককেও "সার" উপাধি প্রদান করেন।

(ক্রমশঃ)

অনাথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হতবুদ্ধির মত বিস্ফারিত চক্ষে রাণীঠাকুরাণীর মুখের দিকে চেয়ে রাজাবাহাদুর কম্পিত কণ্ঠে বল্লেন, "পালিয়ে গিয়েছে? শোভনা? একি কথা বলছ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে!"

রাণীঠাকুরাণী অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে বল্লেন, "বাপের মৃত্যু সংবাদ শুনে অবধি মেয়ে যেন পাগলের মত হয়ে গেল, তাইত আমি করুণাকে আনতে পাঠিয়েছিলাম। আমি যখন জমাদার হীরা সিংকে তোমার কাছে যাবার কথা বলতে গিয়াছিলাম, আমি মনে করেছিলাম

শোভনা আমার অনুপস্থিতি বুঝতে পারবেনা, কিন্তু সেই অবসরে শোভনা উঠে কোন দিক দিয়ে যে বৃষ্টি ঝড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, সে কথা কেহই কিছুই বল্‌তে পারেনা। বাগানের মধ্যে দিয়ে তার ছোট পায়ের চিহ্ন বড় রাস্তা অবধি দেখা যাচ্ছে, তার পর পাকা রাস্তায় কোন চিহ্নই নেই, চৌমাথায় সে কোন দিকে গিয়েছে কিছুই বোঝা যাচ্ছেনা।"

"বউরাণী, অত ব্যস্ত হয়োনা, সে কখনই বেশী দূর যেতে পারেনি। এইত আধঘণ্টাও হয়নি, আমি এখান হতে দেওয়ানজীর ওখানে গিয়েছিলাম, আমি চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর নিজেও যাচ্ছি, কোন ভয় নেই। এখনি তাকে পাওয়া যাবে!"

"আমি এখনি চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি, চার জন দরওয়ান চারদিকে গেছে, কিন্তু ঐ দেখ, আবার বৃষ্টি আরম্ভ হল, শোভনা যে ভিজে ন্যাতা হয়ে যাবে, আর তার যে সুকুমার শরীর!"

রাজাবাহাদুর গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "তার যদি আর একটু সংযম শিক্ষা থাকৃত, তা হলে ভাল হত।" রাণী ঠাকুরাণী অসহিষ্ণু ভাবে বল্লেন, "তুমি তার উপর রাগ করছ? তার স্নেহশীল কোমল মন, শোকের সংবাদে একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়েছিল, সে কিছুই বুঝতে পারছিলনা। সে তোমারি বোনের মেয়ে সত্যি, কিন্তু তবু আমি তাকে বেশী ভাল বাসি!"

রাজাবাহাদুরও বিরক্ত ভাবে বল্‌তে যাচ্ছিলেন "তুমিইত তার মাথাটি খেয়েছ।" কিন্তু কিছুনা বলে ধীরে ধীরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, করুণা তাঁর দিকে চেয়ে শান্ত অথচ বিষণ্ণ মুখে বল্লে "আমাকেও নিয়ে চলুন! আমার পায়ে মোটা জুতা আর গায়ে গরম জামা আছে, বৃষ্টিতে আমার কোন হানি করবে না। আমিও আপনার সঙ্গে তাকে খুঁজতে যেতে চাই।"

করুণার পিঠে হাত দিয়ে রাজাবাহাদুর বল্লেন, "তুমি গিয়ে গাড়ীতে বোস, আমি নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে যাব।" করুণাও রাজাবাহাদুর একত্র যাত্রা করিলেন। কিছুদূর গিয়ে চৌমাথার মুখে এসে করুণাকে জিজ্ঞাসা করলেন "এবার কোন দিকে যাব?"

করুণা একটি অপ্রশস্ত নিভৃত পথ দেখিয়ে বল্লে "এই দিকে।" তার সহজেই মনে হল, শোভনা যে পথে লোকজনের অধিক যাতায়াত নেই, স্বভাবতঃ সেই পথ দিয়েই যাবার চেষ্টা করবে। সে পথ অতিক্রম করে গিয়ে যেখানে উপস্থিত হলেন, সেখানে আর পাকা রাস্তা নেই, একটি খুস্কি পথ মাঠের উপর দিয়ে গিয়েছে; অন্য একটি পথ প্রান্তর মধ্যে প্রবেশ করেছে। এবারেও জিজ্ঞাসা করবা মাত্র করুণা মাঠের পথ দেখিয়ে দিলে। এখানে তাঁকে খুব সাবধানে গাড়ী হাঁকাতে হচ্ছিল, একেত তেজী ঘোড়া, তাতে অপ্রশস্ত মেঠো পথ, তাও বড় অসমান, আবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে চারিদিক ঝাপসা হয়েছিল, কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলনা। কোন দিকে যাচ্ছেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, তবে সুশিক্ষিত ঘোড়া আপনাদের সংযত করে চলছিল, কিছু দূর যাবার পর সম্মুখেই রাজবাড়ীর একজন দরওয়ানকে দেখতে পেয়ে রাজাবাহাদুর চীৎকার করে তার নাম ধরে ডাকলেন। সে দৌড়তে দৌড়তে তাঁর গাড়ীর কাছে এসে বল্লে "মহারাজ বড় বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে কিছু দূর আগেই আমি ছোট ছোট পায়ের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি, সম্মুখের দিকে আরো কিছু দূর গেলে শোভনা—দিদিকে দেখতে পাওয়া যাবে বোধ হয়।"

শোভনা এই অল্প সময়ের মধ্যে ঝড় বৃষ্টিতে এত দূর আসতে পেরেছে তা রাজাবাহাদুরের বিশ্বাস হলনা, তবুও দরওয়ান সম্মুখে যে পথ দেখিয়ে দিলে, তিনি সেই দিকেই জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলেন। এই পথে মিনিট দশেক যাবার পরই তাঁরা দূরে দেখতে পেলেন, শোভনা বাতাসের মুখে ছিন্ন পত্রের মত অতিবেগে ছুটে চলেছে। সহিস সাহায্য করবার আগেই করুণা গাড়ী হতে নেমে পড়ল, আর দুজনে দৌড়ে গিয়ে, শোভনাকে ধরে গাড়ীর কাছে নিয়ে এল। তার পরণের কাপড় অবিশ্রাম বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে গায়ের সঙ্গে লেগে গিয়েছে, কোঁকড়া চুল ভিজে গিয়ে জটার মত তার মুখের চারিদিকে ঝুলছে, ভয়ে মুখ খানি পাংশু বিবর্ণ, শোভনা বলে তাকে চেনাই

কঠিন হয়েছিল। বাড়ী ফিরবার সময় গাড়ীতে শোভনা একেবারে কাষ্ঠখণ্ডের মত পড়েছিল। করুণা তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল, আর রাজাবাহাদুর তাঁর শালের চোগাটা তাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন কিছুই বুঝতে পারছেনা; তার অনুভব এবং বোধশক্তি যেন একেবারে লোপ হয়ে গিয়েছে। বাড়ী গিয়ে পৌঁছিবামাত্র রাণীঠাকুরাণী দৌড়ে এলেন, করুণা একটু দূরে তফাতে দাঁড়িয়ে রইল। দু তিন জন পুরাণ দাসী অতিযত্নে ও সাবধানে শোভনাকে বহন করে তার সুন্দর সাজান ঘরে নিয়ে গেল। করুণা তখনও রাণীঠাকুরাণীকে আগে যেতে দিয়ে নিজে পিছনে আস্তে আস্তে যেতে লাগল। কি সুন্দর শোভনার ঘর খানি কত যত্ন, কত চিন্তা, কত অর্থ, এই সুকুমার সুকোমল নীড় খানিকে মনোহর করবার জন্যে অকাতরে ব্যয় করা হয়েছে।

অতি সুকুমার রেশমের রাত্রিতে পরে শোবার লম্বা জামা, বিছানার পাশে টাঙ্গান, এক জোড়া সাচ্চা জরির কাজ করা ছোট্ট চটি জুতা, বিছানার পাশের কাছে সাজান আয়নার, টেবিলের উপর লক্ষ্ণৌএর চিকনের কাজ করা সৌখীন চাদর বিছান, তার উপর রূপার চিরুণী কোটা, ব্রুস, পাউডারের বাক্স, গন্ধদ্রব্য রাখবার শিশি, অতি সুন্দর করে সাজান রয়েছে। শোভনার দাসীটিও যেন ফরমাস দেওয়া একটি সুন্দর পুটপুটে ভুটিয়া মেয়ে, তার কানে, গলায়, হাতে সোনা, ফিরোজা আর প্রবালের গহনা। শোভনাকে ঘরে নিয়ে যাবামাত্র তাকে গরম জলে স্নান করিয়ে, কাপড় ছাড়িয়ে গরম দুধ আর ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হল। দুতিন জন দাসী আর রাণীঠাকুরাণী নিজে হাতে সব করছেন দেখে, শোভনার কোন রূপ অযত্ন কিম্বা অসুবিধা হবার সম্ভাবনা নেই জেনে করুণা দূরে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তখনও বৃষ্টি বন্ধ হয়নি পোষা হরিণ গুলি বাগানে এ গাছ তলা হতে ও গাছ তলায় বৃষ্টির হাত এড়াবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

শোভনা এতই শ্রান্ত হয়েছিল, মানসিক কষ্টের তাড়নায় এমনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, যে একটী কথাও কইতে পারিলনা, একটু ওষুধ খাইয়ে দেবার পরই তখনি ঘুমিয়ে পড়ল। রাণীঠাকুরাণী শোভনার হাত ধরে তার পাশে বসে ছিলেন, আর করুণা দূরে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল, এ ভিন্ন সে ঘরে আর কেহই ছিলনা। সেই নিঃশব্দ অৰ্দ্ধ অন্ধকার ঘরেও শোভনা অধিক ক্ষণ ঘুমাতে পারলনা, হঠাৎ চীৎকার করে কেঁদে জেগে উঠল। বল্লে, "ওরে, এরা আবার আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। আমি আবার এসেছি; দিদি কোথায়? দিদি কোথায়? আমি যে তাকে চাই আমি শুধু তাকেই চাই।" রাণীঠাকুরাণী স্নেহভরে শোভনার বুকে হাত দিয়ে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লেন, "কেঁদনা মাণিক, ভয় কি, করুণাত এখানেই আছে।" শোভনা কেঁদে বল্লে, 'ওগো আমি বড় ভয় পাই, তোমরাত জাননা। রাণীমামী যাও, যাও, এখান হতে যাও, তুমি থাকলে আমি কিছুই বলতে পারবনা। করুণাকে ডাক, আমি তার কাছে একা থাকতে চাই।" শোভনা তার নাম করছে শুনবামাত্র করুণা তার পাশে এসে দাঁড়াল। রাণীঠাকুরাণীর মনে শোভনার ব্যবহারে আঘাত লাগল, কিন্তু কিছু না বলে রাজা বাহাদুরকে আশ্বস্ত করবার জন্যে নীচে চলে গেলেন।

তিনি চলে যাবার পর শোভনা করুণার গলা জড়িয়ে ধরে "দিদি" "দিদি" বলে কাঁদতে লাগল।

করুণা বল্লে "শোভামণি, চুপ কর, ধৈর্য্য ধর। অত চেঁচিয়ে কেঁদনা। তাহলে এখনি সকলে আবার এসে পড়বেন, তুমি তাহলে কিছু বলতে পারবেনা। আমিত কিছুই বুঝতে পারছিনে। কেন মণি, কেন, এ কাজ করলে?"

শোভনা আপনার মুখের উপর হতে ঘন চুলের রাশি সরিয়ে দিয়ে করুণার বুকের কাছে ঝুঁকে এসে বল্লে "শোন, দিদি ভাই, আমি তোকে সব কথা বলছি। তুইত জনিসনে আমি কত দুষ্টু, কত খারাপ, আমার কেবলি ভয় হত, বাবা যদি ফিরে আসেন, তিনিত প্রতারণা সহ্য করতে
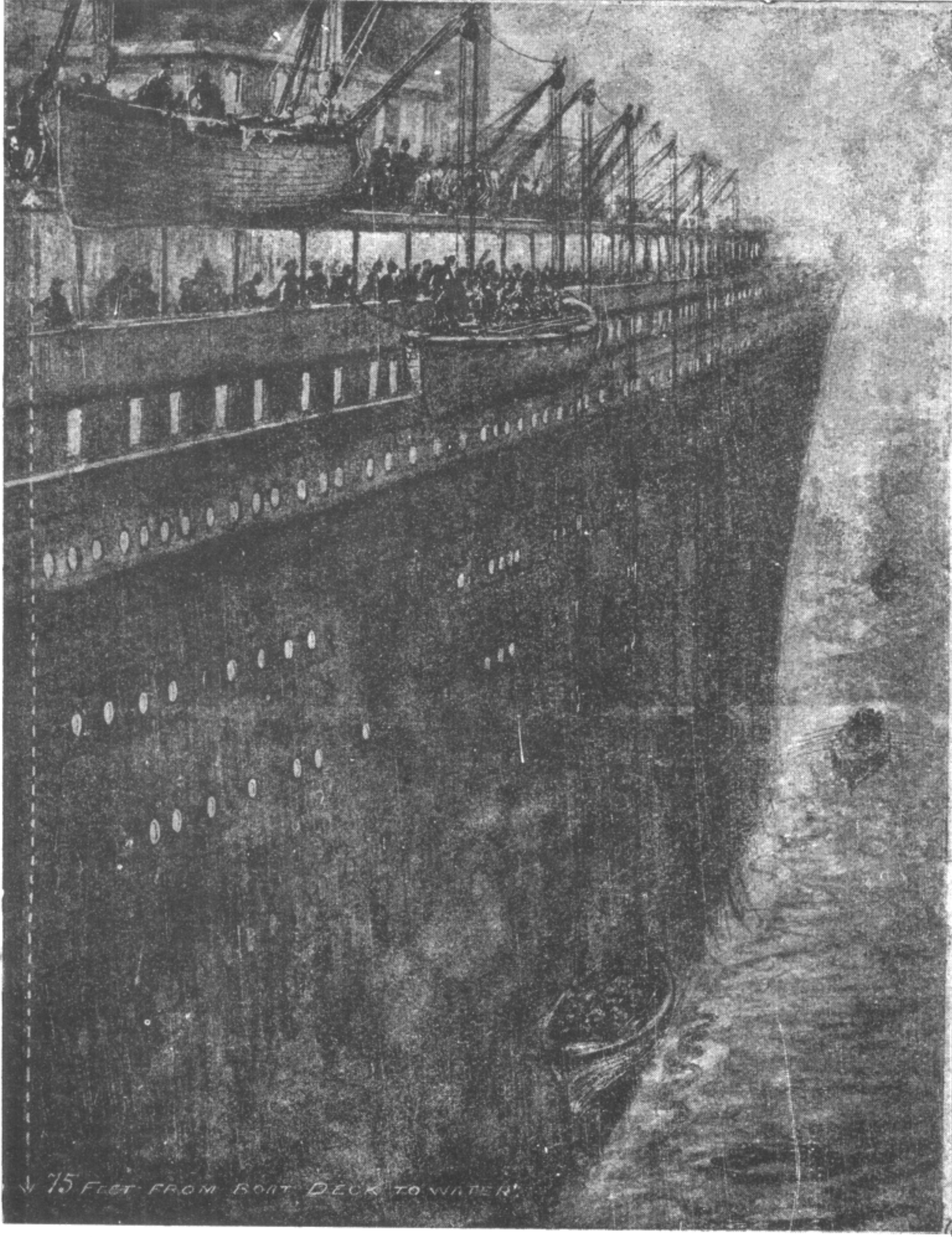
টাইটানিক যাত্রীদের সমুদ্রে অবতরণ।

পারিবেননা। তুমিত জান, তিনি মিথ্যাকে কত ঘৃণা করতেন। ফিরে এসে তিনি এসব দেখে কখনই সহ্য করিতেন না। নিশ্চয়ই সব প্রকাশ করিতেন, তুই এখানে ফিরে আসৃতিস আর আমি অপমানিত চলে যেতাম। এই সব মনে করে আমার ভয় হত, হিংসে হত। তাই আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম, তিনি যেন অনেক দিন অনেক বৎসর আর ফিরে না আসেন।" তার পর করুণার কাণের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি ভয়কম্পিত স্বরে বল্লে, "আমি এমনও একবার একবার বলেছিলাম, তিনি আর যেন কখনই ফিরে না আসেন। তবুও আমি সারা ক্ষণই জানতাম, বাবামণি ফিরে আসতে চাচ্ছেন, আমার কাছেই ফিরে আসতে চাচ্ছেন। ভগবান এখন আমাকে শাস্তি দিয়েছেন, আমার বাবাকে একেবারে মেরে ফেলেছেন। আর তিনি ফিরে আসতে পারবেন না, আর কখনই ফিরে আসতে পারবেননা। এখন যে আমি বাবাকে চাই, আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে।" "ওগো বাবা বাবাগো" বলে শোভনা এমন চীৎকার করে কাঁদতে লাগল, যে করুণা তাকে কোলে তুলে নিয়ে ছোট ছেলের মত দুলিয়ে তার পায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগল, "লক্ষ্মী মণি, শান্ত হও বাবাত এখন স্বর্গে আছেন। তোমার সব দুঃখ তিনি বুঝতে পারছেন, তিনি তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তিনিত বোন তোমাকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসতেন; কখনো তোমার উপর রাগ করেন নি।"

"কিন্তু দিদি, ভগবান তো আমার উপর রাগ করেছেন।"

"শোভামণি, ভগবানের মনে কি বাবার চেয়ে কম দয়া আছে?-তিনি যে এত বড় পৃথিবীর এত লোক জন সকলেরি পিতা, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের নিজের বাবার চেয়ে বেশী দয়ালু। তিনি কখনই তোমার মত ছোট অবোধ মেয়েকে গুরুতর কঠিন শাস্তি দিতে পারেন না"।

শোভনা কতক শান্ত হয়ে বল্ল "দিদি, আরো বল।"

করুণা বল্লে "দেখ শোভা আমার মনে হয় বাবার মনে ছোটমার জন্যে কত কষ্ট ছিল, ভগবান তাত জানতেন, ছোটমারও স্বর্গে গিয়ে বাবার জন্যে মনে সুখ ছিলনা, বাবার বিষন্ন মুখ দেখে, তাঁর মন সর্ব্বদাই কাতর হত, তাই তিনি বাবাকে নিয়ে যাবার জন্যে ভগবানের কাছে কেবলি প্রার্থনা করতেন; তাই বোধ হয়, ভগবান তাঁকে নিয়ে গেলেন। আমারতো এই কথাই মনে নিচ্ছে; তবে নিশ্চয় করে কিছুই বলতে পারিনে। মনে করেছিলাম, বাবার তো টাকা বেশী ছিলনা, আমাদের কি করে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখবেন ভেবে ভেবে বাবা বড় ব্যাকুল হতেন, তাই দয়াময় আমাদের সকলকে, বিশেষ করে তোমাকে, রাজা মামার আশ্রয়ে রেখে তাঁকে নিশ্চিন্ত করে দিলেন। বাবা আর মা যখন স্বর্গ হতে দেখবেন, যে আমি বীরেন আর খুকুর কাছে আছি, তাদের স্নেহ যত্ন করছি, তোমার কাহিল শরীর তুমিও রাজ বাড়ীতে এমন আদর যত্নে আছ, তখন নিশ্চয়ই তাঁদের খুব আহ্লাদ হবে।"

শোভনা ব্যাকুল হয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বল্লে "আমি যে বাবাকে চাই; তাঁর জন্যে যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

করুণা বল্লে, শোভামণি বাবা যে স্বর্গে গেছেন, ছোট মার কাছে শান্তিতে আছেন এ মনে করে কি তোমার আনন্দ হচ্ছেনা?

"না দিদি, আমার কিছুই আনন্দ হচ্ছে না, আমার কেবলি ইচ্ছা হচ্ছে, তিনি আমার কাছে আবার ফিরে আসুন, আবার এখনি আসুন, আমাকে কোলে করে নিন, আমাকে আদর করুন, আর আমার হয়ে সব কথা রাজা মামাদের বলুন!"

"তুমি কি তবে সব সত্যি কথা, এঁদের কাছে বলৃতে চাও।"

শোভনা কাঁদতে কাঁদতে বল্লে "হ্যাঁ আমি সব বলতে চাই, আমি মনে করেছিলাম আমি যদি পালিয়ে যাই, তাহলে তুমিই সব কথা এঁদের বলতে পারবে, এঁরা আদর করে তোমাকেই ফিরে নেবেন আর রাজামামা

যদি রাগ করেন তা'লে সে কথা আমি কিছুই জান্‌তে পারব না। তাঁকে আমি বড় ভয় করি, তিনি কি রকম গম্ভীর,, কি ভয়ানক তীক্ষ্ণ তাঁর দৃষ্টি! রাণী মামীর আমার জন্যে দুঃখ হত সত্যি. কিন্তু রাজা মামা দুঃখিত হতেন না। বাবা হলে আমার সব কথা বুঝতে পারবেন, কিন্তু রাজামামা কিছুই বুঝবেন না, তাঁকে আমি বড় ভয় করি! আমি বাবাকে চাই, ওগো আমি যে আমার বাবাকে চাই!"

করুণা তার গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে, "সোনা আমার, চুপ কর, চুপ কর, এমন করলে, এত কাঁদলে, তুমি যে ব্যামোত পড়বে।"

শোভনা বল্লে, "আমি ভেবে ছিলাম কোথাও লুকিয়ে থাক্‌ব! প্রতিদিনই যখন রাত হত, আমি ঘুমতে পারতামনা, আমার কেবলি মনে হত, বাবা আমার মনের সব লুকান কথা বুঝতে পারছেন, বুঝতে পারছেন, আমি আর চাইনা যে তিনি আবার ফিরে আসেন। তিনি আমায় কত ভাল বাসতেন আমার এই দুষ্টু চিন্তা বুঝতে পেরে তাঁর মন নিশ্চয়ই একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাই আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম, দুঃখ কষ্ট অসুবিধা স্বীকার করে, সহ্য করে তাঁকে দেখাতে চেয়ে ছিলাম, আমার অন্যায়ের জন্যে আমার কত অনুতাপ হচ্ছে।" এই কথা বলে বালিশে মুখ গুঁজে শোভনা অত্যন্ত কাঁদতে লাগল, এমন সময় রাণী মামী সে ঘরে এলেন শোভনা অমন কাতর হয়ে কাঁদছে দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে করুণা কে বল্লেন এ তোমার বড় অন্যায় কোথায় তুমি বোনটিকে সান্ত্বনা দেবে, না তাকে আরও উত্তেজিত করছ" শোভনাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, "শোভারাণী, এত কেঁদনা এমন করে কেঁদনা, আমার যে মনে বড় ব্যথা লাগছে! কেমন করে তোমার রাণী মামীকে একা ফেলে এমন নিষ্ঠুরের মত পালিয়ে গিয়েছিলে? আমি যে তোমাকে এত ভালবাসি সে কথা একবারও মনে করনি?

(ক্রমশঃ।)

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

গৃহ শিক্ষা।

মালতীর মাতা এক জন শিক্ষিতা নারী, তিনি তাঁহার সন্তানগণের নীতিশিক্ষা বিষয়ে অতিশয় সতর্ক, সন্তানদের প্রতি তাঁহার এই আদেশ, যে তাহারা তাঁহার অগোচরে যে কিছু অন্যায় কাজ করিবে, সমুদয় তাঁহাকে খুলিয়া বলিবে। আজ রাত্রে মালতী বিছানায় শুইতে গিয়া স্থির হইতে পারিতেছেনা, বার বার বিছানায় উঠিয়া বসিতেছে, ও 'মা" "মা" করিয়া জননীকে ডাকিতেছে। মাতা আসিলে মালতী কহিল, "মা, আমি একটি কথা বলিতে তোমায় ডাকিয়াছি। আজ আমার স্কুল হইতে আসিতে এত দেরী কেন হইল, তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি খাবার খাইতে খাইতে তোমায় তখন বলিয়াছি, যে আজ অঙ্ক করিতে করিতে আমার এমন দেরী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেবল অঙ্ক করিতেই আমার অত দেরী হয় নাই।"

"তবে আর কি করিতেছিলে?"

"মা, তুমি রাগ করিওনা। আজ কাল আমাদের গ্রামে যে সখের যাত্রার দল আসিয়াছে, তাহারা নন্দীদের মাঠে তাহাদের আড্ডা পাতিয়াছে, স্কুল হইতে আসিবার সময় মহামায়া ও রাধার সঙ্গে তাই শুনিতে গিয়াছিলাম। মহামায়া ও রাধা গান শুনিয়া এ উহার গায়ে পড়িয়া কত হাসিল, কত কথা কহিল, কিন্তু আমি সে সব কিছুই করি নাই, কারণ তুমি আমায় অনেক বার বলিয়াছ যে বাহিরে কোথাও গিয়া ও রকম করা মেয়েদের পক্ষে বড় খারাপ। উহা ভয়ানক অসভ্যতা ও নির্লজ্জতা।" এই বলিয়া মালতী রাস্তায় ও যাত্রায় কি কি দেখিয়াছে, অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু যাহা বলিতে মাকে ডাকিয়াছিল, তাহা বলিতেই সে ভুলিয়া গেল। কত ক্ষণ পরে মাতাকে নীরব দেখিয়া সে কহিল, "মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করিলে?"

"না রাগ করি নাই, কিন্তু দুঃখিত হ'লাম।"

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া মালতী আবার বলিল "আমি যে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলাম, আমার খুব অন্যায় হইয়াছে, আমি জানিতাম, যে তুমি স্কুলের পরে বরাবর বাড়ী আসিতে বলেছ, পথে দেরী করতে মানা করেছ, কিন্তু যাত্রার গান এমন চমৎকার ও যাহারা সাজিয়াছে তাহাদের কাপড় চোপড় এমন সুন্দর, যে না গিয়া থাকিতে পারিলামনা।"

"আমার নিষেধ সত্বেও যে তুমি বন্ধুদের সঙ্গে যাত্রা শুনিতে গিয়েছিলে, এতে তোমার খুব অন্যায় হয়েছে, কিন্তু তা' ছাড়া তুমি আর একটা কাজ করেছ, যার জন্য আমার বেশী দুঃখ হয়েছে এবং যাহা আমি সব চেয়ে বেশী অন্যায় মনে করি।"

"মা, আমি তোমাকে সকল কথা বলি নাই, তাই ?"

"হাঁ, তাহা খুব অন্যায়, কিন্তু তোমার আরও অপরাধ হয়েছে।"

"আরও অন্যায় করেছি! আমি কি এত মন্দ? হয়েছি! আমিত বুঝিনা, তুমি বল।"

"তুমিত নিজেই সে কথা বলেছ। তুমি বললে যে কেবল অঙ্ক কসিবার জন্য স্কুলে থেকে আস্‌তে তোমার দেরী হয় নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য কাজে দেরী হয়েছিল। আমি এই জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি যে, তুমি সম্পূর্ণ সত্য কথা না বলে, কিছু গোপন রেখেছিলে।"

"এটা সত্য, যে অঙ্ক কসিতেছিলাম, তাই আসিতে দেরী হইল।"

"হাঁ তুমি সত্য কথাই বলেছিলে। কিন্তু একটু ভেবে দেখ, তুমি কেন সম্পূর্ণ সত্য না বলে কিছু গোপন রেখেছিলে!"

"মা, আমি ভেবেছিলাম তুমি বিরক্ত হবে।"

"তুমি কোন্ কাজটা করাতে বেশী বিরক্ত হব ভাবলে?"

"তুমি যেখানে যেতে বারণ করেছ, সেখানে গিয়েছিলাম।"

"তুমি সেখানে গিয়ে দেরী না কর্‌তে তবে আমি সুখী হ'তাম। কিন্তু তুমি যখন গিয়েছিলে সে কথাটা আমাকে না বলেত সে অপরাধ দূর করতে পার নাই।"

"না তা আর পরিবর্ত্তন করব কি করে? কিন্তু তুমি যদি এ কথাটা না জান্‌তে, তা হ'লে রাগ করতে না।"

"শুন একটা গল্প বলি। এক জনদের ঝি একটি পাথরের গেলাস ভেঙ্গে ফেলেছিল। সে ভয়ে তাড়াতাড়ি একটু ময়দা মাখা দিয়া সেস্থানটুকু জুড়ে রেখে দিল। গৃহিণীকে সে কথা কিছুই বলিলনা।"

মালতী হাসিতে হাসিতে বলিল "ঝিটা কি বোকা!" তার মনিবকে সে কি বুঝাতে চেয়েছিল!"

"সে ঐ গেলাসটা ভাঙ্গে নাই।"

"আরও শুন। একজন ছেলে ক্লাসের সময় স্লেটে অঙ্ক না কসে, বসে বসে ছবি আঁকৃত। যখন শিক্ষক প্রত্যেকের স্লেট দেখ্‌বার জন্য উঠ্‌তেন, সে অমনি তাড়াতাড়ি তার পাশের ছেলের স্লেট দেখে অঙ্ক নকল করিয়া লইত। ইহাতে সে তাহার শিক্ষককে কি বুঝাইতে চাহিত?"

"সে যে নিজেই অঙ্কগুলি করেছে।"

"কোন কোন ফলওয়ালা যত পচা ও খারাপ ফল, ভাল ফলের নীচে রাখে। কেন তারা ও রকম করে?"

"খরিদ্দার মনে করবে যে সব ফলগুলিই ভাল।"

"হাঁ, ডিমওয়ালা টাট্‌কা বলিয়া পচা ডিম বিক্রি করে।"

"তুমি দেখিলে যে যাহারা এরূপ ব্যবহার করে, তাহার প্রবঞ্চক, এখন আমি তোমায় আর এক প্রশ্ন করিব। একটী মেয়ে তার মা'তার নিকট সম্পূর্ণ সত্য না বলে কিছু গোপন করেছিল, কিন্তু তার মাকে বুঝাতে চেয়েছিল যে সে সম্পূর্ণ সত্যই বলেছে। তুমি তা'কে কি রকম মেয়ে মনে কর?

এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে বালিকা মালতী তাহার মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,

"মা, আমি এতটা ভাবি নাই। আমি কখনও ভাবি নাই, যে আমি আবার প্রতারণা করব।"

"এখন তোমার দোষ যখন বুঝ্‌তে পেরেছ, আমি আশা করি, ভবিষ্যতে আর কখন এরূপ করবে না। তুমি

যে আমার অবাধ্য হইয়াছিলে আর প্রলোভনে পড়িয়া দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলে, তোমার যে আমার নিকট সম্পূর্ণ সত্য বলিতে সাহস ছিল না, এ সকলের জন্য আমি তত দুঃখিত হই নাই, কিন্তু তুমি যে সত্যকথা বলনা ও আমার সঙ্গে প্রতারণা করিতে চাও, সেজন্য বিশেষ দুঃখিত হয়েছি। কিন্তু আমি ইহা জানি, যে যদি কেহ, তোমার কাণে কাণে বল্‌ত যে তোমার প্রতারণা করা হইল তা হ'লে তুমি অবাক্ হইয়া যাইতে।

"হাঁ, যদি কেহ ঐ কথা বলিত, তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই নিজের অবনতি দেখিয়া দুঃখিত হইতাম।"

"তোমাকে নিশ্চয় কেহ ঐ কথা বলিয়াছিল।"

"না, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তার কথা মানিতাম।"

"তবে শুইতে আসিয়া আমাকে সকল কথা বলিতে তোমার ইচ্ছা হইল কেন?"

"আমি সব কথা বলি নাই বলে কষ্ট হইল আর আমি যে দোষ করেছি তা' বুঝেছিলাম।"

"হাঁ, তুমি তবে কাহারও কথা শুনেছ। তুমি যদি সতর্ক থাক্‌তে, তবে অনেক পূর্ব্বেই কাণে কাণে তার কথা শুন্‌তে পেতে। আমার মনে, হয় তুমি অনেক বার শুনেছ, যে কে যেন বলছে, তোমার বাড়ী যাওয়া উচিত।"

"হাঁ, তাইত আমি এক জনকে অনেক বার বল্‌তে শুনেছি।"

"কে তোমাকে কোথাও দেরী না করে বাড়ী ফিরিতে বলিল, আর আমার নিকট সব দোষ স্বীকার করতে বলিল?"

মালতী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে তাহার মুখ মাতার কর্ণের নিকট লইয়া বলিল "মা, ঈশ্বর বলেছিলেন।"

"তবে তুমি ঈশ্বরের বাণী অগ্রাহ্য করেছিলে! তোমাকে যখন তিনি সাবধান করেছিলেন, তখন তুমি তাঁর কথা গ্রাহ্য কর নাই?"

"ও আমি এত মন্দ?"

"এখন তুমি বুঝ্‌তে পারলে, ঈশ্বরের কথার অবাধ্য হওয়া কিরূপ অন্যায়। আর একটা অন্যায় কাজ করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক পাপ এসে পড়ে। প্রথমে তুমি কথার অবাধ্য হয়েছিলে, পরে সে কথাটি বল্‌তে তোমার ভয় হয়েছিল, সেজন্য তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা কর্‌লে। দেখ ঈশ্বরের বাণী শুনলে আর এত কষ্ট ও অবনতি হ'ত না। এখন হইতে মনে রাখ, আর কখনও বিপথে যাইবে না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি তোমায় বল দিবেন।" মালতী অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও করযোড়ে ভগবানের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া শয়ন করিল।

শ্রীবাসন্তী মিত্র।

"কাঁপুনি শিখ্‌তে হবে।"*

এক জন লোকের দুই ছেলে। বড় ছেলে হারু, সে খুব চালাক। আর ছোট ছেলে কানু, সে বড় বোকা। কাজেই বাড়ীর যত কাজকর্ম্ম, বড় ছেলেকেই সব করতে হয়, কিন্তু রাত্রির বেলায় কোথাও যেতে হলে তার ভারি ভয় করে। আর ভূতের গল্প শুনলেই সে বলে, "বাবারে! ভয়েতে আমার কাঁপুনি আস্‌ছে।" তার কথা শুনে ছোট ছেলে কানু মনে মনে ভাবে, "তাইত! কাঁপুনি কাকে বলে তা ত জানিনা! না জানি, সেটা কি রকম জিনিষ!"

একদিন কানুর বাবা তাকে ডেকে বল্‌ল, "দেখ্ তুই এত বড় হ'লি; এখনও কিছু কর্‌তে শিখ্‌লি না। এর পর খাবি কি করে? তোর দাদা দেখ্‌ত কত কাজ করে।" কানু বল্‌ল, "বাবা আমি একটা জিনিষ শিখ্‌ব ঠিক করেছি। কাঁপুনি কাকে বলে বাবা? সেইটে শিখ্‌তে আমার বড় ইচ্ছা করে।" তার বাবা বল্‌ল, "সে জন্য ভাবনা নেই। কাঁপুনি তুমি আপনিই শিখ্‌বে। কিন্তু তাতে কি আর পেট ভরবে?"

পর দিন তাদের বাড়ীতে গুরুঠাকুর এসেছেন, আর তাদের বাবা তাঁর কাছে দুঃখ করছে, যে কানুটা কোন কাজ শিখ্‌ল না, কেবল বলে কিনা, "কাঁপুনি কি?

---

* শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত 'গল্পের বই' নামক যন্ত্রস্থ পুস্তক হইতে গৃহীত।

কাঁপুনি শিখ্‌ব।" এ কথা শুনে গুরুঠাকুর বল্‌লেন, "বেশ ত, তাকে আমার বাড়ী পাঠিয়ে দিও, আমি খুব করে তাকে কাঁপুনি শিখিয়ে দেব।"

কানু ত গুরুঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের বাড়ী গেল। সেখানে তার কাজ হলো রোজ মন্দিরের সিঁড়ী ঝাঁট দেওয়া। এক দিন দুপুর রাত্রে উঠে গুরুঠাকুর বল্লেন, "কানু, কাল খুব সকাল সকাল পূজো কর্‌তে হবে, তুমি এখনি গিয়ে মন্দিরের সিঁড়ী ঝাঁট দিয়ে এসো;" কানু সিঁড়ী ঝাঁট দিচ্ছে, ঝাঁট প্রায় শেষও হয়ে এসেছে; এমন সময় সে চেয়ে দেখে যে সকলের উপরের সিঁড়ীতে একটা শাদা মতন কি দাঁড়িয়ে আছে। সে ভাব্‌ল, "বুঝেছি চোর! নইলে এত রাত্তিরে এ এখানে কি কর্‌তে এসেছে?" তারপর সে চীৎকার করে বল্‌ল, "কে এখানে? শীগ্‌গীর পালাও, না হলে এক ঠেলা মেরে ফেলে দেব।" সে শাদা জিনিষটা কিন্তু কিছু বল্‌ল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তখন কানু ছুটে গিয়ে তাকে এমনি এক ধাক্কা দিল, যে সেটা সিঁড়ী দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে গেল। তাতে কানু খুব খুসী হয়ে, ঝাঁট পাট শেষ করে বাড়ী এসে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগ্‌ল। পর দিন সকাল বেলা সকলে এসে দেখে যে মন্দিরের সিঁড়ীর তলায় গুরুঠাকুর শাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে আছেন। তা দেখে তারা ভারি আশ্চর্য্য আর ব্যস্ত হয়ে, ধরাধরি করে তাঁকে বাড়ী নিয়ে গেল। তার পর তাঁর গায়ের বেদনা সারতে অনেক দিন লেগেছিল। এ সব কথা শুনে কানুর বাবা তাকে বল্‌ল, "তুই দূর হয়ে যা। আমি আর তোর মুখ দেখ্‌ব না।"

কাজেই কানু আর কি করে, সে আস্তে আস্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। সে পথ দিয়ে যায় আর বলে, 'কাঁপুনি শিখতে হবে,' 'কাঁপুনি শিখ্‌তে হবে'। এমনি করে যেতে যেতে সে আর এক রাজার দেশে চলে গেল। সেখানে এক দিন একজন লোক তাকে বল্‌ল, "কাঁপুনি শিখ্‌তে চাও? কি করে কাঁপুনি শেখা যায়, আমি ব'লে দিতে পারি। ওই যে পাহাড়ের উপর বাড়ী দেখ্‌ছ, ওটা ভূতের বাড়ী। ওখানে অনেক টাকা কড়ি আছে, ভূতেরা সে সব পাহারা দেয়। আমাদের রাজা বলেছেন যে, যে লোক ওখানে এক রাত্রি থাকতে পারবে, তার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন। তুমি ওই ভূতের বাড়ীতে এক রাত থাকলে কাঁপুনিও শিখ্‌তে পারবে, রাজার মেয়েও বিয়ে কর্‌তে পারবে।"

কানু তখনই গিয়ে রাজা মশাইকে বল্‌ল, "রাজা-মশাই! আমি তিন রাত ঐ ভূতের বাড়ীতে থাক্‌ব।"

রাজা বল্লেন, "বাঃ, বেশ কথা! তিনটি জিনিষ তুমি সঙ্গে নিতে পার। তা, তুমি কি কি চাও?"

কানু বল্‌ল, "আগুন জ্বালবার জন্য কিছু কাঠ, একটা বস্‌বার চৌকি, আর একটা বড় ছুরি।"

রাজামশাই তখন অনেক কাঠ, একটা চৌকি, আর একটা মস্ত বড় ছুরি দিয়ে ভূতের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়ালেন।

তার পর সন্ধ্যা হতেই কানু একলা একলা সেখানে গেল। তখন শীতকাল ছিল, তাই সে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বেলে, ছুরি হাতে ক'রে আগুনের ধারে চৌকি পেতে চুপ করে বসে রইল। অনেক ক্ষণ ব'সে থাকবার পর তার মনে হল, যেন চার দিকে কিসের একটা গোলমাল চল্‌ছে: নাকি সুরে, কারা যেন বল্‌ছে, "উঁ-হুঁ-হুঁ ভাঁরী শীঁত ভাঁরী শীঁত!" কানু তখন চেঁচিয়ে তাদের বল্‌ল, "তোরা ত ভারি বোকা রে! দূরে থেকে খালি ভাঁরী শীঁত ভাঁরী শীঁত করছিস্‌! শীত করে ত আগুনের ধারে এসে বস্‌ না!" অমনি চারদিক থেকে ধুপ্‌ ধাপ্‌ করে এই বড় বড় কালো কালো কুকুর বেড়াল লাফিয়ে পড়তে লাগল। তারা সব ভূত। তাদের চোখ গুলো আগুনের মত জ্বলছে, লাল লাল জীভ্‌ সব লক্‌লক্‌ করছে। তারা এসে কানুকে ঘিরে আগুনের চার ধারে বস্‌ল, আর তার দিকে চেয়ে চেয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগল। কানু কিন্তু তাতে একটুও ভয় পেল না। খানিক পরে ভুত গুলো তাকে বল্‌ল, "আয়না, খেলা করি।" কানু বল্‌ল, "আগে তোদের নখ দেখি ত।" তারা তাদের কালো কালো থাবা বার করে দেখাল,

তাতে এই বড় বড় বাঘের নখের মত নখ। তাই দেখে কানু বল্‌ল, "তোদের যে নখ, খেলতে গিয়ে যদি আঁচড়ে দিস্? আয়, আগে তোদের নখ কেটে দি।" এই বলে সে যাই ছুরি বার করে তাদের নখ কাট্‌তে গিয়েছে, অমনি সব কুকুর বেড়াল কোথায় মিলিয়ে গেল। তারা কিনা ভূত! যে ভয় পায়, তাকে তারা মেরে ফেলে, আর যে ভয় পায় না, তার কিচ্ছু করতে পারে না।

এত ক্ষণে কানুর ভারি ঘুম পেয়েছে। সেই ঘরের এক কোণে একটা মস্ত বড় খাটে সুন্দর বিছানা করা ছিল। কানু সেটা দেখতে পেয়েই ভারী খুসি হয়ে তাতে গিয়ে শুয়ে রইল। তার পর সবে তার চোখ বুজে এসেছে, এমন সময় তার মনে হল, যেন খাট খানা একটু একটু নড়ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে খাটটা ঠক ঠক করে নড়ে উঠল, তার পর দোলনার মতন দোল খেয়ে খেয়ে শেষে একেবারে লাফাতে লাগল। কানু কিন্তু তবু ওঠেনা; সে বিছানা, বালিস শক্ত করে ধরে শুয়ে আছে। লাফাতে লাফাতে শেষটায় খাট তাকে নিয়ে ছুট দিল। সিড়ী দিয়ে, উঠানের উপর দিয়ে, ঘরের ভিতর দিয়ে, সমস্ত বাড়ীময় খাটটা বেড়াতে লাগ্‌ল। খট্‌খট্ ঘট্‌ঘট্ হড়হড় ঘড়ঘড় শব্দে কানে তালা লেগে গেল! তখনও কিন্তু কানু বিছানায় শুয়ে আছে। তার পর হঠাৎ খাটটা উল্টে গিয়ে, তোষক বিছানা বালিস সব শুদ্ধ কানুকে হুড়মুড় করে মাটিতে ফেলে দিয়ে, চুপ করে দাঁড়াইল। তখন কানু আস্তে আস্তে উঠে ভাবল, যে, "আর ঘুম ত হবে না যাই আগুনের কাছে গিয়েই বসি।" কিন্তু সেখানে গিয়ে সে দেখল, যে তার চৌকির উপরে একটা মস্ত দাড়িওয়ালা লোক বসে আছে। কানু তাকে বল্‌ল, "ওটা আমার চৌকি। তুই ওখান থেকে ওঠ, ওখানে আমি বস্‌ব।" দাড়িওয়ালা লোকটা বল্‌ল, "বটে, তোর চৌকি! দেখিত তোর গায়ে কত জোর, আমাকে চৌকি থেকে ওঠা দেখি।" যেই এই কথা বলা, অমনি এক ঠেলা দিয়ে কানু তাকে চৌকি থেকে ফেলে দিল। তখন দুজনে এমনি কুস্তি লেগে গেল যে কি বলব! অনেকক্ষণ কুস্তির পর সেই দাড়িওয়ালা লোকটা বলল, "আর না ভাই, ঢের হয়েছে। তোর গায়ে ত খুব জোর, আর তোর খুব সাহসও আছে দেখছি। আমি এই বাড়ীর ভূতদের সর্দ্দার। এখানে যে সব টাকাকড়ি আছে, সে সব এত দিন আমরা পাহারা দিতাম। এখন সে টাকাকড়ি তোর।" এই বলে সে কানুকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাল, সে ঘর ভরা কত সোনা রূপো, মণি, মুক্ত ঝক্ ঝক্ করছে।

পর দিন সকাল হতেই রাজামশাই অনেক লোকজন নিয়ে ভূতের বাড়ীতে গেলেন। তাঁরা ত মনে করেছেন, ভূতেরা নিশ্চয় কানুকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন, যে সে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। তা দেখে রাজা মশাই যেমন আশ্চর্য্য হলেন, কানুর কাছে সব কথা শুনে তেমনি খুসীও হলেন। তার পর তাকে আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে নিজের বাড়ীতে এনে খুব ধুমধাম করে তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

রাজার বাড়ীতে কানু খুব সুখেই আছে, কিন্তু তার এখনও এই ভারি দুঃখ, যে সে কাঁপুনি শিখতে পারল না। সে রাত্রে ঘুমের মধ্যেও বলে, "তাইত, কাঁপুনি শিখতে পারলাম না। কাঁপুনি শিখতে হবে।"

তা শুনে এক দিন রাজার মেয়ে করলেন কি, তাঁর ঝিকে বললেন, "ঝি, নদী থেকে কতগুলো ছোট ছোট মাছ ধরে নিয়ে আয়তো। এনে, মাছগুলো এক কলসী ঠাণ্ডা জলে রেখে দে।"

তখন শীতকাল। রাত্রে যখন কানু ঘুমিয়েছে, এমন সময় সেই মাছভরা ঠাণ্ডা জলের কলসী নিয়ে রাজার মেয়ে তার গায়ে ঢেলে দিলেন। ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে সেই ছোট ছোট মাছগুলো কিল কিল করে তার গায়ে নড়তেই এমনি শীত আর কাঁপুনি তাকে ধরল, যে কাঁপুনি যাকে বলে। সে ধড়ফড়িয়ে লাফিয়ে উঠে খালি "হু-হু-হু-হু! হী-হী-হী-হী" করে কাঁপছে, আর বলছে, "আরে, আরে, এ কি? এই বুঝি তবে কাঁপুনি?" তখন সে খুব হাততালি দিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বলতে লাগ্‌ল, "কাঁপুনি শিখেছি, কাঁপুনি শিখেছি।"

লক্ষ্মী*

লক্ষ্মী আমার সোনা আমার
একটু হেথা দাঁড়া,
এক্ষুনি ফের তোমার কাছে
এসে হ'ব খাড়া।
সূয্যি ঠাকুর ডুবে গেল,
সন্ধ্যে দেবার সময় হ'ল,
পূজার ঘরে শাঁক বাজিল
বেলা নাইক আর,
তুই কেন ছিঃ অমন ক'রে,
দুই হাতে মোর আঁচল ধরে,
আছিস আজি রাগের ভরে,
মুখটি করে ভার ?
এ কথা তুই জানিস নাকি,
মায়ের যেকাজ থাকে বাকি,
আমি সে সব সেরে রাখি,
কেউ কইবার আগে ?
যতন ক'রে যে জন যার,
ধ'রে রাখে কাজের ভার,
রতন আসে ভারে তার,
লক্ষ্মী জেনে তাকে।

*শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ ঘোষের যন্ত্রস্থ পুস্তক 'মজা' হইতে পূর্ব্বপ্রকাশিত 'ভাই বোন',"রাজা হ'তেম যদি" ও এই কবিতা গৃহীত

জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ।

'মুচুর' জনম দিনে সব দেখি ভাল,
মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই চারিদিক আলো;
আঙ্গিনায় ফুটে ফুল মরি কি বাহার,
দূর থেকে ঝিঁঝিঁ পোকা দিতেছে ঝঙ্কার;
গাছে বসে ছোট পাখী পিউ পিউ গায়
সবার হৃদয়ে আজি আনন্দ জাগায়,
আকাশের মেঘ রোদে লুকোচুরী খেলা
ইন্দ্রধনু নানা রঙ্গে বাজী করে মেলা,
পাহাড়ের উচু মাথা হইতে যখন
নীচে যত দেখা যায় সাগর মতন,
স্বাস্থ্যপূর্ণ বসুধরা মুক্ত চারিধার
নবীন প্রকৃতি, চির জীবন্ত আকার।
এসব শোভার মাঝে জন্মদিন তোর,
আজ হোতে ছিঁড়ে ফেল দুষ্টমির ডোর,
জুতা মোজা হ্যাট কোট সব ত নূতন
দুষ্ট মিটা দেখি কেন তবু পুরাতন?
আজিকার দিন হোতে হিন্দুস্থানী বুলি
ছেড়ে দিয়ে, থদে ফেলি দুষ্টমির ঝুলি,
সভ্যভব্য হয়ে বেটা বই নিয়ে আয়
জন্মদিনে হাতে খড়ি দিবে তোর মায়।
মন দিয়া পড়া শুনা করিস্ সদাই
এর পরে বাপের ত বেটা হওয়া চাই!
সন্দেশ মেঠাই মোণ্ডা পেট ভরে খেয়ে
জনম দিনের সব আশীর্ব্বাদ পেয়ে
মার কোল জুড়ে বসে থাকবি জয়ন্ত,
হোক তোর পরমায়ু অক্ষয় অনন্ত!

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিয়ে দেওয়া গেল,

১। ছাতা। ২। নবীনচন্দ্র সেন।
৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ তিনটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীতারকদাস ঘোষ, শ্রীপরিমল গোস্বামী, শ্রীহিমাদ্রি কুমার শর্ম্মা, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ, শ্রীশিশিরকুমার দত্ত, কুমারী উষারাণী গুপ্তা, শ্রীমতী লীলা গুপ্তা, শ্রীরণধীরকৃষ্ণ রায়, শ্রীমতী প্রীতিময়ী চৌধুরী, শ্রীশশাঙ্কশঙ্কর রায়, শ্রীজিতেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী জাহ্নবী দেবী, শ্রীবঙ্কিম বিহারী বসু, শ্রীসুশীলকুমার দত্ত, শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীমতী সুধা শর্ম্মা, শ্রীমতী অমিয়বালা শিকদার ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাস।

নিম্নলিখিত গ্রাহক দুইটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীমিহিরকুমার মৈত্র।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীযতীন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সাহা, শ্রীব্রজেন্দ্র লাল দত্ত, শ্রীমতী সরোজিনী সেন, শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাস, পটি বালক সমিতির বালকবৃন্দ, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীকামাখ্যাশঙ্কর গুহ, 'সাহিত্য সমিতি'র সভ্যগণ. হাই স্কুল, দার্জ্জিলিং, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীঅন্নদাচরণ গুপ্ত, শ্রীকমলাভূষণ ঠাকুর, শ্রীগজেন্দ্রনারায়ণ দেঁ, শ্রীমতী গিরিজাসুন্দরী রায়, শ্রীবিজেতাচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমহেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীদেবেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীমোহন খাঁ, শ্রীসুকুমার ঘোষ, শ্রীমতী মুক্তকেশী সিংহ, শ্রীশিশির কুমার সিংহ, শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র কুণ্ডার, শ্রীপরিমল রায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীমতী উষাবতী মিত্র, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, শ্রীমতী কৃষ্ণসুহাসিনী সিংহ, শ্রীসুধাংশু নাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার দাস, সৈয়দ নুরমহম্মদ হোসেন চৌধুরী, শ্রীবিমলচন্দ্র দাস গুপ্ত।

নূতন ধাঁধা।

(শ্রীশক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেরিত।)

১। জীবনে রহে সে মৌন, মৃত্যু হলে ডাকে;
শরীরে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে,
সেবা করে থাকে সদা দেবতার স্থানে,
গৃহে রাখে লোকে তায় মঙ্গল বিধানে।

(শ্রীমতী মুক্তকেশী সিংহ প্রেরিত)।

২। পাঁচজনে ধ'রে, বত্রিশ জনে ঘেরে।
একজনে ঠেলা দিলে দরিয়াতে পড়ে,
বল দেখি এমন জিনিস কি আছে সংসারে?

২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্গীয় মহাত্মা ষ্টেড্।

১৮শ ভাগ। ভাদ্র, ১৩১৯। ৫ম সংখ্যা।

উইলিয়ম ষ্টেড।

টাইটানিক জাহাজ ডুবিতে অনেক মূল্যবান জীবন নষ্ট হইয়াছে। কত ধনীর সন্তান, কত যুবক, যাঁহাদের জীবনে কত আশা, কত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; কত গৃহের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার মৃত্যুতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উঠিয়াছে, তিনি উইলিয়ম ষ্টেড। উইলিয়ম ষ্টেড ধনী ছিলেন না, ধনীর সন্তানও নহেন, তিনি কোনও দেশের রাজকার্য্যে উচ্চপদ অধিকার করেন নাই, কোনও পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য ছিলেন না; কিন্তু কোনও ধনী, কোনও রাজমন্ত্রী, বা সভাসদ্ বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাসে ইঁহার সমান প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। পরলোকগত উইলিয়ম ষ্টেডের জীবন আলোচনা করিতে গেলে অনেক কথা মনে হয়। প্রথমতঃ একটী কথা মনে পড়ে যে, কোনও মানুষের ভিতরে মহত্ত্বের বীজ থাকিলে তাহা সকল অবস্থাতেই

অঙ্কুরিত হইয়া ফলোৎপাদন করিতে পারে; অন্ততঃ ইংলণ্ডের মত দেশের পক্ষে একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। উইলিয়ম ষ্টেডের বাল্যজীবনে মহত্ত্বের কোনও উপকরণই ছিল না। তাঁহার না ছিল সহায়, না ছিল সম্বল, না ছিল শিক্ষা। সাধারণতঃ যে সকল পথ দিয়া লোকে যশ ও কীর্ত্তির মন্দিরে গমন করে, ষ্টেড সে পথে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হন নাই। ঘটনাস্রোত তাঁহাকে যে দিকে লইয়া গেল, তিনি সেই পথেই মহত্ত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ষ্টেডের পিতা এক জন সামান্য ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। জগতের নিকটে তিনি সুপরিচিত ছিলেন না; পুত্রের নামেই তিনি পরিচিত, কিন্তু ষ্টেড তাঁহাকে অতি উচ্চ শ্রেণীর লোক মনে করিতেন; তিনি মনে করিতেন, যে তাঁহার পিতার মত লোক হইতে তিনি কখনও আশাও করিতে পারেন না। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার পিতৃভক্তি কেমন গভীর ছিল। এই প্রকার গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধাই মানবের উন্নতির সোপান। যে কোনও নঃ কোন লোককে, তিনি পিতাই হউন, মাতাই হউন, শিক্ষকই হউন, বা অপর কোনও ব্যক্তি হউন, শ্রদ্ধা করিতে না পারে, সে কখনও মহৎ হইতে পারে না; ইহা ধ্রুব সত্য।

উইলিয়ম ষ্টেড স্কুল কলেজে বিশেষ কিছু শিক্ষা পান নাই। শৈশবে কয়েক বৎসর মাত্র ওয়েকফিল্ডের একটী সামান্য স্কুলে পাঠ করিয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময়ে স্কুল ছাড়াইয়া তাঁহাকে নিউকাসল সহরের একজন ব্যবসাদারের নিকটে কেরাণীর কাজে শিক্ষানবিশ করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং কোন স্কুল বা কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভের তাঁহার কোনও সুবিধা হয় নাই। তাঁহার শিক্ষক তাঁহার পিতা এবং তিনি স্বয়ং ছিলেন। জীবনের প্রারম্ভ হইতে তিনি তাঁহার পিতার গৃহের ধর্ম্মের প্রভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। পিতার সাধু চরিত্র এবং তাঁহার ইচ্ছার বল এই দুইটী উইলিয়ম ষ্টেডের মহত্ত্বের প্রধান কারণ।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে স্কুল ছাড়িয়া বালক ষ্টেড সওদাগরের আফিসে কেরাণীর কাজ শিখিতে প্রেরিত হইলেন; কিন্তু তিনি কেবল কেরাণীর কাজ শিখিতেন না; তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক জিনিস শিখিতেছিলেন। স্কুলের অধ্যয়ন বন্ধ হইলেও ষ্টেডের শিক্ষা সেখানেই শেষ হয় নাই। অবসর সময়ে তিনি ভাল ভাল পুস্তক কিনিয়া পাঠ করিতেন। ষ্টেডের পিতা হাত খরচের জন্য তাঁহাকে সপ্তাহে তিন পেনি করিয়া দিতেন। ষ্টেড তাহার এক তৃতীয়াংশ স্থানীয় মিশন ফণ্ডে দান করিতেন; বাকী দুই পেনি দিয়া বই কিনিতেন। সেই সময়ে এক জন পুস্তকবিক্রেতা এক পেনি মূল্যের সেক্সপিয়ারের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। ষ্টেড তাঁহার জীবনের উন্নতির আরম্ভ এখান হইতেই গণনা করিতেন। তিনি হাত খরচের পয়সা বাঁচাইয়া অল্প মূল্যের ভাল ভাল পুস্তক কিনিয়া অবসর কালে গভীর মনোযোগের সহিত সে সমুদয় পাঠ করিতেন। ইহাতে তিনি প্রভূত উপকার পাইতেন; তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা এইরূপেই হইয়াছিল। এই জন্য উত্তর কালে তিনি ভাল ভাল পুস্তক অতি অল্প মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কারণ তিনি জানিতেন ইহাতে দরিদ্র লোকদের কত উপকার হইতে পারে।

এক দিকে তিনি যেমন অবসর কালে ভাল ভাল বই পড়িতেন, সেইরূপ তিনি আবার লেখার অভ্যাসও করিতেছিলেন। নিকটবর্ত্তী ডার্লিংটন সহরে নর্দার্ণ একো নামে একখানি সংবাদ পত্র ছিল। ষ্টেড মাঝে মাঝে তাহাতে লিখিতেন; এইরূপে উক্ত সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। ১৮৭১ সালে, ষ্টেডের বয়স যখন মাত্র বাইশ বৎসর, তখন নর্দার্ণ একোর সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। স্বত্বাধিকারী ষ্টেডকে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিহীন বাইশ বৎসরের এক সওদাগরের কেরাণীকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক হইবার প্রস্তাব আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির একটী কারণই এই, যে সেখানে গুণের আদর ও যোগ্যতার পুরস্কার আছে। নর্দার্ন একোর স্বত্বাধিকারী ষ্টেরের লেখার অসাধারণ

তেজ এবং শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং সেই জন্য এই অদ্ভুত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ষ্টেড শঙ্কিত মনে এই পদ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু এ নির্ব্বাচন ঠিকই হইয়াছিল।
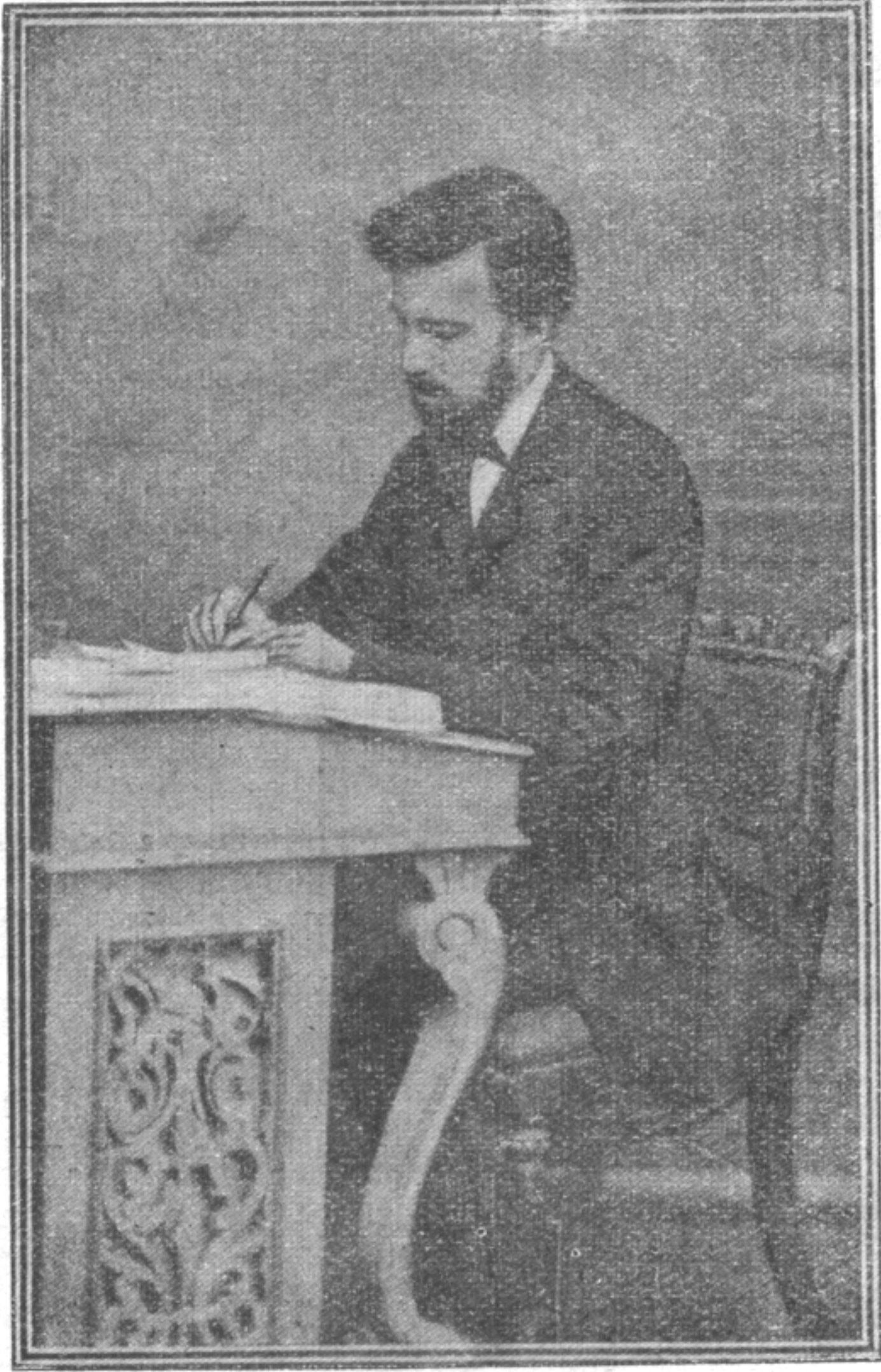
মিঃ ষ্টেড নর্দার্ন একোর সম্পাদক।

নয় বৎসর কাল উইলিয়ম্ ষ্টেড অতি দক্ষতার সহিত নর্দার্ন একোর সম্পাদকের কার্য্য করেন। তাঁহার পরিচালনাধীনে নর্দার্ণ একো ইংলণ্ডের উত্তরাংশে একখানি শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে ষ্টেডের নাম ও যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ১৮৭৬ সালে বুলগেরিয়া দেশের অত্যাচার লইয়া ইংলণ্ডে এক তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। তুরস্কের সুলতান ও তাঁহার মন্ত্রিগণ বুলগেরিয়ার খৃষ্টান প্রজাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত; এই সংবাদে ইংলণ্ডের জনসাধারণ অতিশয় উত্তেজিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন বুলগেরিয়ার অত্যাচার নিবারণের জন্য ইংলণ্ডে এক মহা আন্দোলন উত্থাপন করেন। তাঁহার ওজস্বিনী বাগ্মিতাতে তিনি দেশের লোককে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মিঃ ষ্টেড্ বুলগেরিয়া আন্দোলনে গ্লাড্‌ষ্টোনের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নর্দার্ন একো পত্রিকাতে বুলগেরিয়ার অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিতে লাগিলেন; তাঁহার লেখনী উত্তর ইংলণ্ডে আগুন জ্বালিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে নর্দার্ন একোতে প্রকাশিত মিঃ ষ্টেডের প্রবন্ধ সম্বন্ধে গ্লাডষ্টোন লিখিয়াছিলেন 'আমি এই প্রবন্ধগুলি পড়িয়া মোহিত হইয়াছি। আমার ইচ্ছা হয়, যে আমাদের দেশের সকল সংবাদপত্র এইভাবে পরিচালিত হয়।" বিখ্যাত লেখক টমাস্ কার্লাইল ষ্টেডের কাগজ পড়িয়া তাঁহাকে এক জন বন্ধু দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "সেই ভাল মানুষ ষ্টেড্‌কে বলিও, নির্ভয়ে আপন কাজ করিয়া যায়"।

১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত মিঃ ষ্টেড নির্ভয়ে নর্দার্ন একো পত্রিকা পরিচালিত করিয়াছিলেন। তৎপরে ঐ বৎসর মিঃ জন মর্লি (এখন যিনি লর্ড মর্লি) লণ্ডনের পলমল গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া মিঃ ষ্টেডকে আপনার সহকারী মনোনীত করেন। ১৮৮০ হইতে ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত মর্লি ও ষ্টেড একযোগে পলমল গেজেট পরিচালনা করেন। ১৮৮৩ সালে মর্লি পলমল গেজেটের সম্পাদকের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন মিঃ ষ্টেড সম্পাদক হন এবং বর্ত্তমান ভাইকাউণ্ট লর্ড মিলনার, যিনি বুয়ার যুদ্ধের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ উপনিবেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ সাল হইতে ১৮৮৯ সাল পর্য্যন্ত ষ্টেড পলমল গেজেটের সম্পাদকতা করেন। এই সময় পলমল গেজেট দেশের মধ্যে একটী শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৮৯ সালে পলমল গেজেটের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিয়া মিঃ ষ্টেড রিভিউ অব রিভিউস নামে একখানি নূতন ধরণের মাসিক পত্র বাহির করেন। এখন পর্য্যন্ত সেই কাগজ চলিতেছে, এবং পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে তাহার বহু প্রচলন হইয়াছে।

মিঃ ষ্টেড সংবাদপত্র পরিচালন কার্য্যে নবযুগের অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি কেবল সমসাময়িক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন নাই, সমসাময়িক ইতিহাস প্রস্তুত করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ভাইকাউন্ট মিলনার লিখিয়াছেন, যে মিঃ ষ্টেডের সম্পাদকতাকালে পলমল গেজেট যেরূপ দেশের কার্য্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কোনও দেশের কোনও সংবাদপত্র কখনও সেরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার স্মরণ হয় না। একাধিকবার সঙ্কট সময়ে মিঃ ষ্টেড তাঁহার লেখনীর সাহায্যে ইংলণ্ডের রাজনীতির গতি পরিচালিত করিয়াছিলেন। এমন কি গ্লাডষ্টোনের মত সুবিজ্ঞ এবং তেজস্বী মন্ত্রীও ষ্টেডের পরামর্শমত কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় গ্লাডষ্টোন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নৌবিভাগের জন্য বার্ষিক নয়কোটী টাকা অধিক ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রাধান্য অনেক পরিমাণে ষ্টেডের সনির্ব্বন্ধ আন্দোলনের ফল। বর্ত্তমান সময়ের একজন প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র লেখক ষ্টেডের প্রভাব ও কার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "বুলগেরিয়ার অত্যাচারের সময় হইতে বুয়ার যুদ্ধ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের রাজকার্য্যে যে সমুদয় লেখক আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ষ্টেডের সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না। তিনি একবার রুষিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করিয়াছিলেন, সুদান অধিকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, পার্ণেলের পতনে সাহায্য করিয়াছিলেন, নৌবিভাগের ব্যয় বহুপরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা গ্লাডষ্টোনকে মন্ত্রীপদ হইতে অপসারিত করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন; আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে কায়রো পর্য্যন্ত ব্রিটিশ পতাকা বিস্তারের কল্পনা, যাহার অবশ্যম্ভাবী ফল বুয়ার যুদ্ধ, তাঁহারই সৃষ্টি; হেগ সহরের প্রথম শান্তিসভার সফলতা বহুল পরিমাণে তাঁহারই কার্য্য।" একজন সংবাদপত্র লেখকের দ্বারা যে এত কাজ হইতে পারে, ইতিপূর্ব্বে লোকের তাহা ধারণাই হইত না। কিন্তু ইহার গূঢ় সন্ধান এই, যে মিঃ ষ্টেড এক জন অসাধারণ লোক ছিলেন; তাঁহার জীবনের এক উন্নত লক্ষ্য ছিল। সংবাদ পত্র তাঁহার হাতে সেই লক্ষ্য সাধনের যন্ত্র হইয়াছিল। তিনি যাহা লিখিতেন সে সমুদয়ের উদ্দেশ্য ছিল কোনও সৎকার্য্য সাধন।

উইলিয়ম ষ্টেড বর্ত্তমান সময়ের একজন কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার জীবিতকালে যে কিছু সাধু চেষ্টা হইয়াছিল, উইলিয়ম ষ্টেড অল্পাধিক পরিমাণে তাহার সকলগুলির সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি ধার্ম্মিক লোক ছিলেন; তাঁহার সকল কার্য্যের মূলে ঈশ্বর বিশ্বাস এবং ন্যায়পরতা বিদ্যমান ছিল। ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের প্রধান উৎস ছিল। তাঁহার নিকট বন্ধু লর্ড ফিসার বলিয়াছেন, "প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ ষ্টেড ঈশ্বরকে ভয় করিতেন, এবং তিনি আর কাহাকেও ভয় করিতেন না।" যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিতেন, নির্ভয়ে সকল বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া তাহা করিয়া যাইতেন। এই জন্য তাঁহাকে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল; তাঁহার অনেক শত্রুও হইয়াছিল। সত্য এবং ন্যায়ের অনুরোধে তিনি আপনার নিকট বন্ধুদের কার্য্যেরও প্রতিবাদ করিতে ভয় পাইতেন না। তিনি একজন প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন; কিন্তু স্বদেশের অপেক্ষাও তিনি ধর্ম্মকে, ন্যায় এবং সত্যকে শ্রদ্ধা করিতেন। সেইজন্য যেখানে স্বদেশবাসীরা স্বার্থের প্রলোভনে ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে যাইতেন সেখানে তিনি স্বদেশ এবং স্বদেশবাসিদের প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইংলণ্ডের লোক যখন বুয়ার যুদ্ধে মত্ত, তখন মিঃ ষ্টেড নির্ভয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহাকে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল; তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল; তাঁহার সংবাদপত্রের গ্রাহকসংখ্যা বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল; তাঁহার নিকট বন্ধুরা বিরূপ হইয়াছিল; দেশের লোকের উপর তাঁহার যে প্রভাব ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার দ্বারা দেশের যে কল্যাণ হইতেছিল, তাহাও অনেক পরিমানে বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এসকল কোনও চিন্তাই

তাঁহাকে ন্যায়ের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি অক্ষুব্ধ চিত্তে এই অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে একটী ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য আক্রমণ করা যে কতদূর ভীরুতা ও নীচতার কার্য্য মাসের পর মাস জ্বলন্ত ভাষায় তাহা
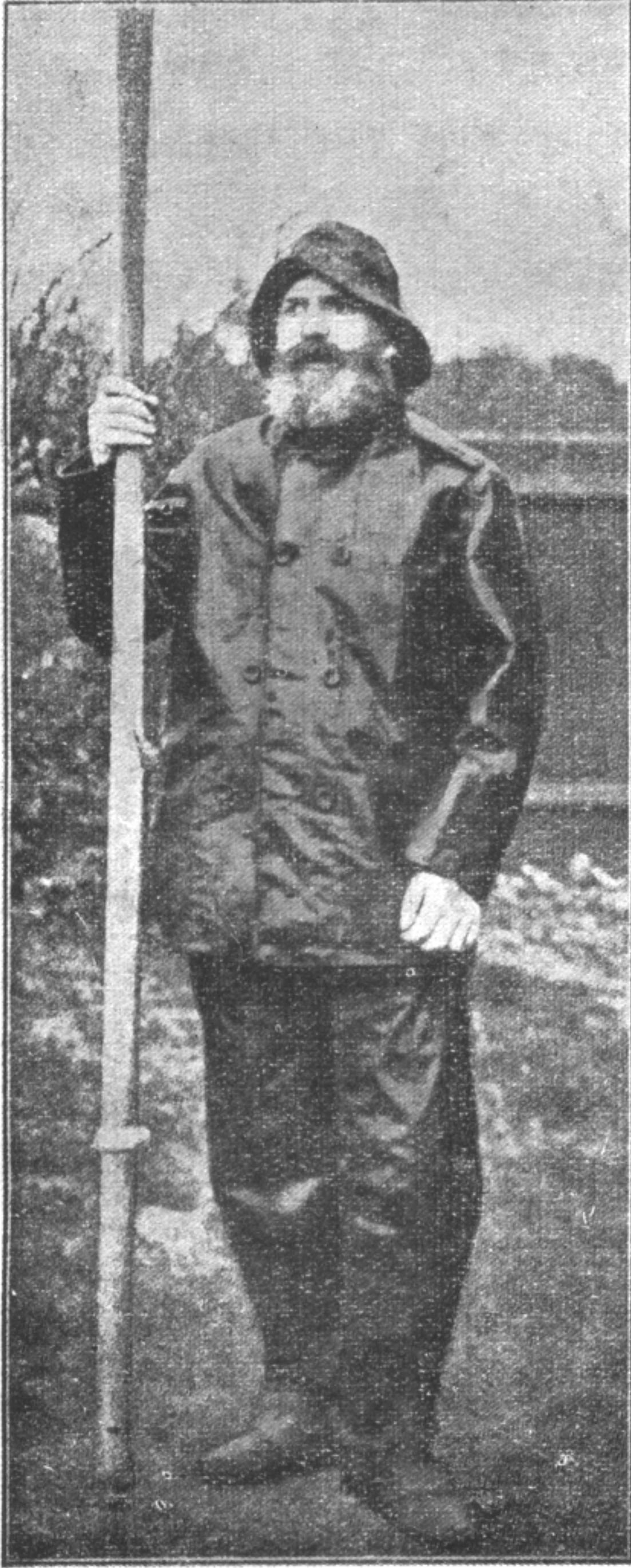
ভ্রমণকারীর বেশে মিঃ ষ্টেড।

দেশের লোকদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। দেশের লোকেরা যে সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের ক্রোধ ও উত্তেজনাতে তিনি কিছুমাত্র ভীত হন নাই। বুয়ার যুদ্ধের পরিচালকদের মধ্যে তাঁহার দুইজন নিকট বন্ধু ছিলেন,—মিঃ সিসিল রোডস্ এবং এলফ্রেড (এখন ভাইকাউণ্ট) মিলনার; মিঃ ষ্টেড তাঁহাদিগকে ও উচিত কথা শুনাইতে ক্রটী করেন নাই। আর একবার সাধারণের উপকার করিতে গিয়া তাঁহাকে কারাগারে যাইতে হইয়াছিল। তিনি তিন মাস কারাগারে বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। কারাগারের কষ্ট তিনি আনন্দের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন। কারাদণ্ডের আদেশ হইলে তিনি বলিয়াছিলেন "বর্ত্তমান সময়ে আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ আশাশীল। ভবিষ্যতে যে আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে তদ্বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই"। দুই মাস কারাগারে বাস করার পর বড় দিনের সময়ে তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে লিখিয়াছিলেন "ভগবান আমাকে আশাতীত করুণা করিয়াছেন।" তাঁহার এই আশাশীলতার কারণ গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস। এ জগতের একজন ন্যায়বান মঙ্গলস্বরূপ বিধাতা আছেন এই বিশ্বাস তাঁহাকে জীবনের সকল বিপদ প্রতিকূলতার মধ্যে বল ও আশ্রয় দিত। তিনি নিরন্তর ঈশ্বরেই বাস করিতেন। তাঁহার একজন বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ জেনারেল গর্ডনকে একবার বলিয়াছিলেন "আমার মনে হয় যে আপনি সর্ব্বদাই ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করেন।" তদুত্তরে গর্ডন বলিয়াছিলেন "আমি করি আর না করি, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরে বাস করেন, তার সাক্ষী ষ্টেড"। মিঃ ষ্টেড প্রতি রবিবার সকালে সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা করিতে যাইতেন; কোনও কার্য্যের অনুরোধে তিনি মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করিতেন না। কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তিনি বিশেষ ভাবে প্রার্থনা ও উপাসনা করিয়া আপনাকে প্রস্তুত করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন ধর্ম্মেতেই ব্যক্তিগত জীবনে এবং জাতীয় জীবনে শক্তি। অধর্ম্মের দ্বারা কোনও জাতি বড় হইতে পারেনা। ১৮৭৭ সালে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি দিন দিনই স্পষ্টতর রূপে দেখিতেছি যে ধর্ম্মবুদ্ধির পরিমাণে জাতির শক্তি, এবং যাহা কিছু কোনও জাতির নৈতিক আদর্শকে নীচ করে, তাহার দ্বারা সে

জাতির শক্তির মূল ছিন্ন হয়।" এই বিশ্বাসের জন্য তিনি অনেকবার স্বদেশ এবং স্বদেশ বাসীদের বিরুদ্ধে তীব্র লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। স্থূলদর্শী লোকেরা এজন্য তাঁহাকে কখন কখন স্বদেশদ্রোহীও বলিয়াছেন; কিন্তু মিঃ ষ্টেড প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক ইঞ্চি জমি তাঁহার প্রিয় ছিল. কিন্তু তাই বলিয়া তিনি স্বজাতির কোনও অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিতেন না। স্বদেশকে ভাল বাসিতেন বলিয়াই তাহার অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন। ষ্টেড স্বদেশ প্রেমিক; ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রেম এবং সহানুভূতি স্বদেশেই আবদ্ধ ছিল না। যেখানে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, যেখানে অন্যায় ও অবিচার তাহারই বিরুদ্ধে তিনি সিংহবিক্রমে দাঁড়াইতেন। সত্য এবং ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতে তিনি কখনও ভীত হইতেন না। কোনও দুর্ব্বল জাতি, কোনও উপেক্ষিত সৎকার্য্য, কোনও বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হয় নাই। সেই জন্যই তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পত্নী সম্রাজ্ঞী এলেকজান্দ্রা হইতে সামান্য দরিদ্রা স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত কত দেশের কত শ্রেণীর নর নারীর নিকট হইতে সমবেদনা সূচক পত্র পাইয়াছেন। মিঃ ষ্টেড চিরদিন ভারতবর্ষের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ভারতবাসীরা তাঁহার নিকটে সাদর অভ্যর্থনা পাইতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের দেশে একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইয়াছেন।

কে তুচ্ছ ?

থাকতে এমন সোণার দেহ
সোণার চোখ মুখ,
মিছেমিছি ভাবে যে জন
কোথায় পাবে সুখ;
ব'সে ব'সে গাঁথে যেবা,
রাবণের সিঁড়ি;
আঠার মাসের বছর যার—
যায় ধীরি ধীরি;
তাকিয়ে থাকে যে জন শুধু
পরের মুখ চেয়ে,
নিজের দেহ পুষ্ট করে
দত্ত পিণ্ড খেয়ে;
বিশ্ব মাঝে তুচ্ছ অতি
তাকেই সবাই বলে,
তার মত অপদার্থ—
নাইক ধরাতলে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র সিংহ।

রামু লোহার

(সত্য ঘটনা-মূলক গল্প)

আজ রামু লোহারের বিচারের শেষ দিন। তিন দিন ধরিয়া বিচার চলিতেছে। আজ হইলেই আসামী দায়রা সোপর্দ্দ হয়। রামু খুনের দায়ে অভিযুক্ত। বেচারা নিরীহ ক্ষুদ্র জীব, দূরে পাহাড়ের গায়ে বনের ভিতর নির্জ্জনে বাস করিত। তার সম্পত্তির মধ্যে গোটা দুই কারা আর গোটা কয়েক ছাগল। এই ছাগলই তাহার কাল হইল। গ্রামের মঙ্গরা উড়াঁও এর সঙ্গে এক দিন ছাগল লইয়া তাহার ঝগড়া হয়। হতভাগ্য রাগে উন্মত্ত হইয়া বালুয়া দ্বারা দুই জন লোককে হত্যা করিয়া ফেলে। সেই মোকদ্দমার বিচার চলিতেছে। বিচারক একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান। স্থান রাঁচি জেলার অন্তর্গত খুঁটি মহকুমা। কাছারি আজ লোকে লোকারণ্য। উকীল মোক্তার আমলা ফয়লাদের হুড়াহুড়িতে আদালত গম্ গম্ করিতেছে। ছোট নাগপুরের কাছারীতে সাধারণতঃ এমন ভিড় দেখা যায় না। হাকিম আসিয়া বিচারসনে বসিলেন। অহিফেনসেবী বৃদ্ধ পেস্কার প্ল্যাটফর্ম্মের উপর সাহেবের জুতার শব্দে এবং জনৈক মোক্তারের টিপ্পুনীতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া চোক মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চাপরাশী লাল খাঁ বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাঁকিতে লাগিল, লাইয়ে সওয়াল, লাইয়ে সওয়াল। কাছারির প্রথম হিড়িকটা অতীত হইলে রামু লোহারকে

আনা হইল। তার হাতে হাত কড়ি, কোমরে দড়ি বাঁধা। আগে পাছে সিপাহী। তার উপর একজন সশস্ত্র হাওয়ালদার। আসামীকে যথাস্থানে দাঁড় করাইয়া সাক্ষীকে কাঠ গড়ায় আনিয়া হাজির করা হইল এবং লাল খাঁ তাহাকে যথারীতি হলপ পড়াইয়া দিল। সাক্ষীটী একটী স্ত্রীলোক। কাঠগাড়ায় উঠিয়া সে একবার আসামীর দিকে ঘাড় ঈষৎ উচ্চ করিয়া চাহিয়া লইল এবং তাহার পর চিত্রাপিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অচল অটল ভাবে প্রত্যেক প্রশ্নের সরল এবং স্পষ্ট জবাব দিতে লাগিল। প্রশ্ন হইল,

প্রশ্ন। তুমি আসামীকে চেন?

উত্তর। হাঁ চিনি?

প্রশ্ন। কেমন করিয়া চিনিলে?

উত্তর। ও আমার পুরুষ।

এই উত্তর শুনিয়া হাকিম একবার আসামী ও সাক্ষীর দিকে চাহিলেন এবং কলম রাখিয়া প্রশ্নকারী কোর্ট সব ইনেস্‌পেক্টার বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আপনি এক জন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের মামলায় সাক্ষী দিবার জন্য খাড়া করিয়াছেন, ধন্য আপনার সাহস।" কোর্ট বাবুও আপনার অসমসাহসিকতার কথা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিয়া লইলেন। তবে তিনি জানাইলেন যে তাঁর বিশ্বাস সাক্ষী সত্য এজাহার দিবে। স্ত্রীলোকটী বলিতে লাগিল;—

তখন জল খাউকি বেলা পার হইয়া গিয়াছে। আমি আমার ছেলেটী লইয়া পিড়ার এক পাশে বসিয়া চড়কা কাটিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার পুরুষ লাঙ্গল লইয়া বাড়ি আসিল এবং কারা দুটীকে বাঁধিয়া তামাক খাইবার উদ্‌যোগ করিতেছে এমন সময় মঙ্গরা আসিয়া সেই পুরাণ ছাগলের কথা পাড়িল। দুচার কথা হইতে না হইতেই আমার স্বামী ক্ষেপিয়া উঠিয়া চালের বাতা হইতে এক খান বালুয়া লইয়া মঙ্গরার মাথাটা কাটিয়া ফেলিল। মঙ্গরা প্রাণ ভয়ে পলাইয়া যাইতেছিল কিন্তু আঙ্গনা ছাড়িয়া যাইতে না যাইতে তাহার কাঁধে চোট পড়িল। সেই এক চোটেই তাহার শেষ প্রতিবেশী নীলু লোহার আমার স্বামীকে থামাইতে দৌড়িয়া আসিতেছিল তার ঘাড়েও এক চোট দিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। তখন বালুয়া খানা আঙ্গনার এক পাশ দিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পিঁড়ায় আসিয়া বসিল। আমি ভয়ে কাছ হইতে সরিয়া গিয়া মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। প্রাণের দায়ে আমি চীৎকার করিয়া কাহাকেও ডাকিতে পারি নাই। বা সেখান হইতে পলাইয়া যাই নাই, আমার নিজের অপেক্ষা আমার কোলের এই ছেলেটীর জন্য আমার বেশী ভয় হইয়াছিল। কাজেই হতভম্ব হইয়া চুপ করিয়া সকল দেখিতেছিলাম। অল্পক্ষণ মধ্যেই পাড়ার বীর সিং পাহান এবং দুয়ারি মুড়া আসিয়া পড়িল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের কাছে গিয়া পড়িলাম।

উৎকর্ণ হইয়া অনেকেই জবানবন্দী শুনিতেছিলেন। সকলেই স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। যতক্ষণ এজাহার হইতেছিল ততক্ষণ সাক্ষী একবারও নড়ে নাই, উত্তর দিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় নাই। অচল অটল ভাবে প্রত্যেক প্রশ্নের সরল এবং স্পষ্ট জবাব দিতেছিল। এজাহার সমাপ্ত হইলে তাহাকে কাঠগাড়া হইতে নামিয়া যাইতে বলা হইল। তখন আসামী তাহার শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দুইখানি উত্তোলন করিয়া যুক্তপুটে হাকিমের দিকে চাহিয়া, হুজুর গরীবের একটী সওয়াল আছে বলিয়া নিজের হাতের বালা দুই গাছি দেখাইয়া প্রার্থনা করিল এই দুই গাছি বালা আমার স্ত্রীকে দিবার হুকুম হউক আমি ত চলিলাম আমার স্ত্রী পুত্রের এই বালা দুগাছি হইতে তবু দুসন্ধ্যা মাড় ভাতের যোগাড় হইবে। নিঃশব্দে হাকিমের কর্ণে এই নিদারুণ প্রার্থনা প্রবেশ করিল। নিঃশব্দে তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। হাত কড়ি খুলিয়া দেওয়া হইল। বালা দুগাছি বোধ হয় বাল্য কালাবধি রামুর হাতে ছিল। অনেক চেষ্টা স্বত্বেও সে দুগাছি খোলা গেলনা। তখন রামু প্রাণপণ চেষ্টায় আর একবার চেষ্টা করিল। বালা খুলিয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু হাতের চামড়া উঠিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে

লাগিল। রামু স্ত্রীর হাতে বালা দুগাছি সমর্পণ করিয়া যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল। তাহার মুখে যেন একটু আনন্দের জ্যোতি দেখা দিল। হতভাগিনী ও স্বামীর শেষ দান গ্রহণ করিয়া একটী গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া আঁচলে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সেখান হইতে সরিয়া গেল। পর দিন রায় প্রকাশ হইবে হুকুম দিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। হাকিম উঠিয়া যাইবা মাত্র লাল পাগড়ির দল আবার আসামীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল এবং পুনরায় তাহার কোমরে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে সেখান হইতে লইয়া চলিল। কোর্ট বাবু ওসঙ্গে সঙ্গে গেলেন। দরজার বাহির হইবামাত্র একজন স্ত্রীলোক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কোর্ট বাবুর পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল এবং কাতর বচনে একটী বার রামুর সঙ্গে দুইচারিটী কথা কহিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। বৃদ্ধা রামুর মা। কোর্ট বাবুর অনুমতি অনুসারে রামুর মাও তাহার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে তাহার কাছে আসিতে দেওয়া হইল। হতভাগ্যকে দেখিবার জন্য তাহার মা, শাশুড়ী ভাই ও একটী ভগ্নী আসিয়াছিল; সকলেই তাহাকে ঘেরিয়া বসিল। কাহারো মুখে বড় একটা কথা নাই। রামুও একবারে নীরব। কিয়ৎকাল পরে রামু তার ভাইএর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল "ভাই আমি ত চলিলাম ; গ্রামের লক্ষ্মণ মুড়া চামড়ার দরুণ ৬৲ ও ভূষণ মুড়া ৩৲ পাইবে; তাহাদের দেনা গুলি শোধ করিয়া দিও। গ্রামের কাহারো সহিত ঝগড়া ঝাটি করিও না, তার পর নিজের পুত্রের দিকে হাত দেখাইয়া বলিল ইহা দিগকে একমুঠা করিয়া খাইতে দিও।" কথাগুলি শুনিয়া সকলেই অবাক্। যাহাদের সঙ্গে চির দিনের মত বিদায় লইতে আসিয়াছে, এ জন্মে যাহাদের সঙ্গে হয়ত আর সাক্ষাৎ হইবে না তাহাদের সঙ্গে এই কথা! চক্ষের সম্মুখে যাহার মা ভাই ভগ্নী স্ত্রী হাহাকার করিতেছে, যারা জীবনের শেষ আহ্বান, শেষ আলাপ শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া আসিয়াছে তাহাদের সঙ্গে এই কথা! অসভ্য মুর্খ রামু তুমি ধন্য!

শ্রীঅতুলচন্দ্র সিংহ।

অভ্যাসের দাস।

বিখ্যাত উপন্যাস লেখক সার ওয়াল্টার স্কট, তাঁহার বাল্যকালের একটী গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন স্কুলে পড়িতেন, দেখিতেন একটী বালক প্রত্যহ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া থাকে। তিনিও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাহার উপরে উঠিতে পারিতেন না। কত দিন চলিয়া গেল তিনি কোন রকমেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলেন না। হঠাৎ একদিন তিনি দেখিলেন, যে যখনই সে বালকটী প্রশ্নের উত্তর দেয় তখনই তার কোটের নিম্নতম একটী বোতাম ধরিয়া থাকে। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, যে সে প্রত্যহ ঐরূপ করে। তাহার এই যে অভ্যাস হইয়া গিয়াছে দেখিয়া একদিন কোন সুযোগে স্কট ঐ বোতামটি কাটিয়া দিলেন। পর দিবস ইহার কি ফল হয়, দেখিবার জন্য অতি উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন শিক্ষক বালকটীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উত্তর দিবার পূর্ব্বে তাহার অভ্যাস মত সেই চির পুরাতন জ্ঞানের ভাণ্ডার বোতামটী খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু সেদিন আর তাহার হস্ত বোতামের সুখ স্পর্শ লাভ করিতে পারিল না, তখন তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হইল, সে অপ্রতিভ হইয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিল, সে মনে করিল, তাহার সেই ঐন্দ্রজালিক শক্তি পরিপূর্ণ বোতামটী কি তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে? কিন্তু সে দেখিল হায় সত্য সত্যই বোতামটী নাই, তখন তাহার মাথায় যেন বজ্রপাত হইল, সে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার আর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না; বৈদ্যুতিক প্রবাহ থামিয়া গেলে যেমন তাহা দ্বারা চালিতকল কারখানা সকল স্তব্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ তাহার বোতামটী হারাইয়াসে নির্ব্বোধের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল। স্কটের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

শ্রীবসন্তী মিত্র।

অনাথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শোভনা বল্লে "রাণীমামী কিছু বোলনা, তুমি যদি সব কথা জান্‌তে তাহলে আমার উপর রাগ করতে। বাবা কেন আমার কাছে আসছেন না? বাবা আর মা মণি আমার কথা ঠিক্ বুঝতে পারতেন, আর তাঁদের কাছে কোন কথা বল্‌বার উপায় রইল না। আমি কি করি, আমার যে বড় দুঃখ হচ্ছে।"

রাণী মামী কিছুই বুঝতে না পেরে কাতরভাবে করুণার দিকে চাহিলেন, করুণা বল্লে, "শোভনা পাছে আপনাদের ছেড়ে যেতে হয়, এই ভয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল, বাবা না আসেন। এখন বাবা আরতো ফিরে আসবেন না, তাই ওর কেবলি মনে হচ্ছে, ওর প্রার্থনার জন্যেই এই বিপদ ঘটেছে।"

"আহা বাছা আমার, তাইত আমিও বুঝতে পারছিলামনা। কেন শোভনা এমন কাজ করলে, রাজা বাহাদুরকে সব কথা বলতে হবে, শোভনার এই ব্যবহারে আমার ও তাঁর মনে বড়ই আঘাত লেগেছিল। শোভা কেন মণি সব কথা আমায় খুলে বলনি? আমি কি কোন দিন তোমার উপর রাগ করেছি কি অনাদর দেখিয়েছি? তবু আমাকে বিশ্বাস হলনা?"

"শোভনা কারো রাগ সহ্য করতে পারে না, আমরা ছেলেবেলা হতে ওকে খুবই বেশী আদর দিয়েছি; সবাই বলত আমরা ওকে নষ্ট করছি, কিন্তু ওর শরীর চিরকালই এত সুকুমার, দুর্ব্বল আমরা কেউ কখনো ওকে বকিনি"!

"করুণা বেশ কথা বল্লে আদরের শোভামণিকে বল কে বকবে, কার বকতে ইচ্ছে হবে? আমার ভাগনীর বিষয় যা করা দরকার আমি বেশ জানি, সে বিষয় আর কারো উপদেশ দরকার হবে না! আমি শোভার মন কত নরম তা কি জানিনে? আমি কি কোন দিন তাকে বকেছি?"

শোভনা তাঁর কোলের উপর মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে "না মামীমা, তুমি অত ভালবাস, তাইত তুমি আমার উপর বিরক্ত হবে মনে করলে এত কষ্ট হয়। মামীমা বল, কখনো তুমি আমার উপর রাগ করবে না, আমাকে চিরকাল এমনি ভালবাসবে?" শোভন আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে বলছি, কখনো তোমার উপর রাগ করব না, তুমি সর্ব্বস্বধন! তুমি যে এখন আমারি নিজের মেয়ে তবে তুমি যদি এমন আর কাঁদ, তাহলে হবেনা। আর কিছু ভেব না, কিছু বোল না লক্ষ্মী, যদুর মত ঘুমিয়ে পড়, করুণা যদি তোমাকে কথা না কওয়ায়, কোনরূপে তোমাকে উত্তেজিত না করে, তবেই তোমার কাছে বসতে পারে। কেঁদে কেঁদে তোমার চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, কপাল যেন তপ্ত মনে হচ্ছে।"

শোভনা ব্যস্ত হয়ে বিছানায় উঠে বসে তাড়াতাড়ি করুণার হাত ধরে বল্লে, "করুণা আমার কাছে আজ থাক্‌বে, আজ রাতে আর দেওয়ানজীর বাড়ী যাবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়লে তাকে যেন পাঠিয়ে দিও না।"

"না না মণি, করুণা তোমার কাছে থাক্‌বে বই কি; যতদিন তুমি চাও ততদিন থাক্‌বে।" তারপর তিনি নীচে রাজা বাহাদুরের কাছে গিয়ে শোভনার সব কথা বল্লেন, আর পর দিন সকালে ডাক্তার বাবুকে আস্‌বার জন্যে চিঠি লিখিয়ে দিলেন। ডাক্তারের কথা লিখিয়ে খুব ভালই করেছিলেন, কেননা ভোর হতে না হতেই তাঁর প্রধান দাসী তাঁর কাছে এসে বল্লে "বৌরাণী শোভা দিদিমণি কাল সারারাত জ্বরে ছট ফট করেছে। রাত একটায় ঘুম হতে জেগে ওঠে; তার পর আদপেই ঘুমতে পারেনি। দিদিমণির ভুটিয়া ঝি, মাষ্টার ঠাকুরাণী, করুণা ও আর এক জন দাসী ও আমি সে ঘরে ছিলাম, যা দরকার সবই করেছি, কেবল আপনাকে জানাইনি, আপনি আর বেশী কি করতে পারতেন, ডাক্তার এলেই সব ঠিক হবে!"

রাণী ঠাকুরাণী বিরক্ত স্বরে বল্লেন "আমাকে তোমার সব জানান উচিত ছিল। ডাক্তার বাবু কি এসে চলে গেছেন?"

"না তিনি এখনও আসেন নি শোভনা দিদিও এখন একটু ভাল আছেন। মাষ্টার ঠাকুরাণী এসব বিষয় ভাল

জানেন, যা করবার সবই করলেন তাই আর আপনার ঘুম ভাঙ্গাইনি, তিনি ত বলছেন দিদিমণির ভারি সর্দ্দি হয়েছে। অমন বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে দৌড়ে বাছা আমার কত দূর গিয়েছিলেন, সর্দ্দি হবে তার আর আশ্চর্য্য কি !” রাণী ঠাকুরাণী আর অপেক্ষা না করে তখনি শোভনার ঘরে গেলেন। শিক্ষয়িত্রী তখনও বিছানার পাশে বসেছিলেন, শোভনার খাবার জন্য জল গরম করে চা তৈয়ারী করছিলেন। করুণাকে দেখেও মনে হল সেও যেন সারারাত শোয়নি, ভুটিয়া দাসীটিও চারিদিকে কাজ করে বেড়াচ্ছিল।

শোভনা জ্বরে বিঘোর হয়ে একবার এপাশ আর একবার ওপাশ করছিল। রাণীঠাকুরাণী যখন কেমন আছ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে যা বল্লে স্পষ্ট শোনা গেল না, তার স্বর একেবারে বসে গিয়েছিল। এলো মেলো অপরিষ্কার চুল বাঁধতে বাঁধতে শিক্ষয়িত্রী বল্লেন, শোভনার বড়ই ঠাণ্ডা লেগেছে।

রাণী ঠাকুরাণী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন “শোভা তোমার গলা ব্যথা করছেকি ?” অনেক চেষ্টায় শোভনা বদ্ধ স্বরে বল্লে “না আমার বুকে বড় বেদনা।” শিক্ষয়িত্রী বল্লেন “আমরা সারারাত ওর বুকে গরম সেক দিয়েছি, এখন ডাক্তার বাবু যতক্ষণ না আসেন, আর কিছু করবার নেই। তার আর বেশী দেরী নেই, তিনি বোধ হয় এখনি আসবেন।”

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার বাবু এসে পৌঁছিলেন। তাঁর আসাতে যেন সকলের মনের উপর হতে ভারটা কমে গেল। তাঁর মুখে হাসি লেগেই থাকত, আর খুব কথা কইতে ভালবাসতেন, রোগীর ঘরে তিনি যে আনন্দ আর হাসির হাওয়া নিয়ে আসতেন, তাতেই অর্দ্ধেক অসুখ আরাম হয়ে যেত। ছেলে বুড় সবাই তাঁর পক্ষপাতী ছিল। তিনি এসে যখন বল্লেন বুকে সেক দিয়ে খুব ভালই হয়েছে, তখন করুণার মনটা অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

ডাক্তার বাবু যতই হাসুন আর কথা কন, তবু নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ধরে শোভনার বুক পিঠ পরীক্ষা করে যখন বাহিরে এলেন, তখন তাঁর মুখ একেবারে গম্ভীর। রাজা বাহাদুর যখন জিজ্ঞাসা করলেন কোন ভয়ের কারণ আছে কি ? তখন কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে ডাক্তার বাবু বল্লেন—“অসুখ যে খুব কঠিন, তা এখনও বল্‌তে পারিনে, এ অবস্থায় যা করা দরকার সবই করা হয়েছে রাণী ঠাকুরাণীকে ব্যস্ত করবার এখনও কোন লক্ষণ দেখা যায়নি !”

রাজা বাহাদুর রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি বল্‌ছেন ডাক্তার বাবু ?”

ডাক্তার বাবু একটু হেসে বল্লেন “মেয়েটি বড় ক্ষীণ—”

হঠাৎ করুণার কাতর অব্যক্ত ক্রন্দন শুন্‌তে পেয়ে, সেদিকে ফিরে ডাক্তার বাবু বল্লেন “হ্যাঁগা, কে তুমি ?”

রাজা বাহাদুর বল্লেন “শোভনার বোন সৎ বোন করুণা এখানে তুমি কি করছ ?” করুণা বল্লে আমি ঘরে যাবার জন্যে এখানে প্রতীক্ষা করছিলাম, আমি কেবল ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, শোভনার নিউমোনিয়া হয়েছে কি ? সে যখন ছোট ছিল, তখন একবার তার হয়েছিল !

ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করলেন “সে কতদিনের কথা ? তুমি নিশ্চয়ই আমাকে সব ঠিক করে বল্‌তে পারবে।”

করুণা একটুখানি ভেবে বল্লে, “সে প্রায় তিন বৎসরের কথা। ডাক্তার বাবু আমার বোন ভাল হয়ে উঠবেত ?”

ডাক্তার বাবু আশ্চর্য্য হবার ভান করে বল্লেন, “একি শুনছি, রোগী যদি ভালই না হবে, তবে আমি এখানে এসেছি কি করতে ?”

করুণা স্পষ্টই বুঝতে পারল, ডাক্তার বাবু তার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন, কোন কথাই খুলে বল্লেন না, তার মনে বড় দুশ্চিন্তা হল সে শোভনার ঘরে যাবার জন্যে উপরে যেতে দেখলে, রাজা বাহাদুর আর ডাক্তার বাবু চুপি চুপি কথা কচ্ছেন। সে তাই সোজা শোভনার ঘরে না গিয়ে তেতলার এঘর ও ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই সব ঘরে ছেলেবেলা তার মামাও মা খেলা করেছেন, সে খেলার চিহ্নও এখনও লোপ হয় নি। তার মায়ের

ভাঙ্গা পুতুল, ছোট ঘড়া ঘটি এখনও দু একটি রয়েছে। মামা বাবুর একখানি ভাঙা ব্যাট ও একটি দোলনা ঘোড়া এখনও কাত হয় পড়ে আছে। করুণা ভাবছিল খুকু আর বীরেন দেখলে কত খুসী হত। বীরেনের বলিষ্ঠ শরীর সরল দৃষ্টি উজ্জ্বল হাসি মনে করে তার চোখে জল আস্‌তে লাগিল। মা নেই, তারা শুধু দিদিকেই জানে, আজ তারা দুজনে তার অভাবে কিকরে দিন কাটাচ্ছে না জানি। বাহিরে বর্ষার আকাশ ভেঙ্গে পড়ছিল, বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়; তার আর বিরাম বিশ্রাম ছিল না। বাতাস এক একবার হুহু স্বরে আর্ত্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের মত বয়ে আসছিল। করুণার বেদনা কাতর মন বাহিরের এই বৃষ্টি ঝড়ের সহানুভূতি অনুভব করছিল। আজ কার বুক ভেঙ্গে সকল আশা ভাসিয়ে দিয়ে সমস্ত আকাশ বাতাস পৃথিবী শোক করছে।

কাল ভোরে যখন সূর্য্য উঠেছিল, তখন আলোর মতই শান্তি পৃথিবী ছেয়েছিল, আজ আর কিছু নেই কাল যে মহা দুঃসংবাদে এসেছে বাবা আর নেই; সেইবাবার কথা সে একবার সুস্থির হয়ে বসে ভাবতে পারেনি; একবার মন ভরে কাঁদতে পারেনি; আজ রাতে যখন ছোট ভাইবোনদের কাছে যাবে, তখন সকলে একত্রে ভগবানের কাছে তাঁর জন্যে প্রার্থনা করবে। তাঁর জন্যে শোক করবে। এখন সে কিছুই ভাবতে পারছিল না একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয়ও দুশ্চিন্তায় তার মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল। তার কেবলি মনে হচ্ছিল কি হবে কি হবে? বৃষ্টিতে দূরে কিছুই ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। ধুসর আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যে একটা ছায়া যবনিকা পড়ে সব অস্পষ্ট করে রেখেছিল; বৃষ্টির সমতান রোদন তারও বিরাম ছিল না! করুণা আর বাহিরে বাহিরে না ঘুরে শোভনার ঘরে গিয়ে শুনলে শোভনা অধীর ভাবে বলছে "আমার দিদি আমার করুণা কই আমি তাকে চাই।" করুণা তার হাত ধরে বসবামাত্র সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

হরি আর গিরি।

হরি আর গিরি দুটি ভাই বোন। তাদের মা নাই, তাদের বাপ আছে আর সৎমা আছে। তারা এতই গরীব, যে রোজ দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না।

একদিন রাত্রে হরি বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পেল তাদের সৎ মা তাদের বাবাকে বল্‌ছে "হরি আর গিরিকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও। আমরা ওদের ভাল করে খেতে দিতে পারি না, নিজেরা ও পেট ভরে খেতে পাই না। ওদের তাড়িয়ে দিলে আমরা দুজনে এক রকম খেয়ে পরে থাক্‌তে পারব।"

তা শুনে তাদের বাবা বল্‌লে "কখন না, তা কি হয়। আমরা না খেয়ে মরি সেও ভাল, তবু ওদের তাড়াতে পারব না।" কিন্তু সৎ মা খুব জেদ্ কর্‌তে লাগ্‌ল "ওদের না তাড়ালে চল্‌বেই না। শেষে আমরা না খেয়ে মর্‌ব না কি? চল এক কাজ করি, কাল সকালে কাট কাট্‌তে যাচ্ছি বলে, ওদের নিয়ে বনে যাব। তার পর তারা যখন খেলা করতে করতে আমাদের কথা ভুলে যাবে, তখন তাদের ফেলে বাড়ী চলে আস্‌ব। অত বনের ভিতর থেকে তারা কখন পথ চিনে বাড়ী আস্‌তে পারবে না।" এমনি করে-অনেক বকুনি খেয়ে তাদের বাবা আর তাদের সৎমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌ল না, কাজে কাজেই সে তার কথায় রাজি হল।

হরি সবই শুন্‌লো; শুনে আর তার ঘুম হ'ল না। খানিক চুপ করে শুয়ে থেকে সকলে ঘুমুলে পর উঠে বাহিরে গেল। বাইরে পথের দুয়ারে অনেক সাদা সাদা নুড়ী পাথর পড়ে ছিল, হরি কাপড়ের কোঁচড় ভরে সেই সব পাথর কুড়িয়ে নিয়ে, ঘরে এসে রইল।

পরদিন সকাল হতে না হতেই সৎ মা তাদের জাগিয়ে বল্‌ল, "ওঠ্ ওঠ্। বনে কাঠ কাট্‌তে যেতে হবে। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে আস্‌ব। ঘরে আর কিছু খাবার নেই, দুটো রুটী আছে। তোরা দুজনে সমস্ত দিন ঐ রুটী খেয়ে থাক্‌বি" বলে সে তাদের দুজনকে দুখানা রুটী দিল। তারপর সকলে মিলে কাঠ কাট্‌তে চল্‌ল।

হরি চল্‌ছে আর কেবল পিছন ফিরে ফিরে কি যেন করছে। তার বাবা বল্‌ল "হরি কি করছিস্? অত পিছনে পড়ে থাক্‌ছিস্ কেন?" হরি বল্‌ল "জানালার উপর বেড়াল ছানাটা বসে আছে তাই দেখ্‌ছি।" তার বাবা ধমকদিয়ে বল্‌ল, "না বেড়াল ছানা দেখ্‌তে হবেনা। শীগ্‌গীর চল্।"

বেড়াল ছানার কথা কিন্তু সবই ফাকি। আসলে হরি কর্‌ছে কি, কোঁচড় ভরে যে নুড়ী পাথর এনেছে, তারি একটা একটা করে পথে ফেল্‌তে ফেল্‌তে যাচ্ছে।

বনে গিয়ে হরি আর গিরিকে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে তাদের বাবা বল্‌ল "তোরা এখানে বসে খেলা কর্। আমরা কাঠ কাট্‌তে যাই। যতক্ষণ না আমরা ফিরে আসি, ততক্ষণ তোরা কোথাও যাস্‌নে যেন।" এই বলে তারা তাদের সেখানে রেখে চলে গেল।

হরি আর গিরি ত কেবল হাস্‌ছে, আর নাচ্‌ছে, আর দুহাতে তুলে খালি মুখে দিচ্ছে।

দুটী ভাই বোন সমস্ত দিন ধরে খেলা করছে, তবু তাদের বাপ মা ফিরে আস্‌ছে না। সন্ধ্যা বেলায় তাদের ক্ষিদে পেয়েছে, ঘুম পেয়েছে, কিন্তু তখনও তাদের বাপ মা ফিরে এল না। হরি বুঝ্‌তে পারল তারা তাদের ফেলে পালিয়ে গেছে। গিরি ভয়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগ্‌ল। হরি তাকে অনেক বুঝিয়ে বল্‌ল

"ভয় নাই বোন্, একটু পরেই চাঁদ উঠ্‌বে। আমি রাস্তায় নুড়ী পাথর ফেলে এসেছি। চাঁদ উঠ্‌লেই সেই পাথর দেখে দেখে আমরা বাড়ী যাব।" খানিক পরেই চাঁদ উঠ্‌ল আর তার আলোতে নুড়ী গুলো ঝক্ ঝক্ করতে লাগ্‌ল। তখন সেই পাথর গুলো দেখে পথ চিনে যেতে তাদের কোন কষ্টই হইল না।

তারা বাড়ী ফিরে এসেছে দেখে তাদের বাবা খুব খুসী হল। তাদের সৎ মা বল্‌ল "আরে তোরা কোথায় ছিলি? আমরা যে তোদের ডেকে ডেকে না পেয়ে চলে এলাম।" সেদিন রাত্রে ও হরি শুন্‌তে পেল, তাদের সৎ মা আবার তাদের বনে ফেলে আস্‌বার ফন্দি কর্‌ছে। সে দিন ও সকলে ঘুমলে পর সে পাথর কুড়োবার জন্য উঠ্‌ল, কিন্তু তার সৎ মা আগেই দরজায় তালা দিয়ে রেখেছিল, তাই পাথর কুড়াইতে পারল না।

পরদিন ভোরে তাদের সৎ মা আবার তাদের দুজনের হাতে দুখানা রুটী দিয়ে কাঠ কাট্‌বার কথা বলে বলে নিয়ে গেল। আজ ত আর পাথর কুড়োন হয় নি, তাই হরি আজ তার রুটীখানাকেই ছিঁড়ে তার টুক্‌রো রাস্তায় ফেল্‌তে ফেল্‌তে চল্‌ল।

আজ ও তাদের এক জায়গায় বসিয়ে রেখে তাদের বাপ মা কাঠ কাট্‌তে চলে গেল, আর বলে গেল "যতক্ষণ আমরা না আসি, ততক্ষণ কোথাও যাস্‌না।" তারা ভাই বোনে সমস্ত দিন খেলা করে, একখানা রুটী দুজনে ভাগ করে খেয়ে বসে আছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, কিন্তু বাবা কি সৎ মা কারোর দেখা নেই। গিরি ত কাঁদ্‌তে আরম্ভ করল। হরি বল্‌ল "ভয় নাই। চাঁদ উঠ্‌লেই আমরা বাড়ী যাব।" চাঁদ উঠ্‌ল, তখন তারা আর সেই রুটীর টুক্‌রোর একখানি ও খুঁজে পেল না। তার আগেই পাখীতে সব খেয়ে গিয়েছিল।

এখন কি হবে! অত বড় বনের মধ্যে ছোট্ট দুটি ভাই বোন একলা, চারিদিকে বাঘ ডাক্‌ছে, ভালুক ডাক্‌ছে। তারা কোথায় যাবে, কি করবে বুঝতে না পেরে এক গাছের উপর উঠে জড়সড় হয়ে বসে রইল, ভয়েতে কারোর ঘুম হল না।

সকাল হলে পর দুজনে গাছ থেকে নেমে, বনের ভিতর দিয়া চল্‌ল। খানিক দূর গিয়ে তারা দেখল বনের ভিতরে একটি ছোট ঘর রয়েছে। সে ঘর এমনি আশ্চর্য্য যে তেমন আর কেউ দেখেনি। ঘর খানা দেয়াল থেকে চাল অবধি খালি মিঠাই মণ্ডা দিয়ে তৈরী। দেয়াল সব সন্দেশের, চাল মালপুয়ার, জানালা শার্শী সব মিছরির। এমন মজা কি আর হয়? হরি আর গিরি ত কেবল হাস্‌ছে, আর নাচ্‌ছে, আর দুহাতে তুলে খালি মুখে দিচ্ছে!

এমন সময় ঝাঁ করে ঘরের দরজা খুলে এক বুড়ী বেরিয়ে এসে বল্লে কে রে, আমার ঘর ভাঙছিস?"

বুড়ী যে সে বুড়ী নয়, সে এক রাক্ষসী। এখন সে বুড়ো হয়েছে, তার দাঁত নড়্‌ছে, তাই এখন আর শক্ত মাংস চিবিয়ে খেতে পারে না, খালি খোকা খুকী ধরে খায়; আর তাদের ভুলিয়ে আনবার জন্য মিঠাই মণ্ডা দিয়ে বনের ভিতরে ঘর বানিয়ে রেখেছে।

বুড়ীকে দেখে হরি আর গিরির এমনি ভয় হল, যে তারা দুজনেই কাঁদতে লাগল। বুড়ী তাদের ভোলাবার জন্য ভারী মিষ্টি করে বল্‌ল "কেন বাছারা কাঁদছ কেন? এস আমার ঘরে এস। তোমাদের জন্য কত খাবার রেখেছি, কেমন সুন্দর বিছানা করে রেখেছি।" তারা ত জানে না যে সেটা রাক্ষসী, তারা তার কথায় খুসী হয়ে তার সঙ্গে ঘরে গেল।

প্রথম দিন বুড়া তাদের খুবই যত্ন করল, কিন্তু তার পরদিনই হতভাগী হরিকে নিয়ে এক ঘরে বন্ধ করে গিরি কে বল্‌ল "খুব ভাল করে রান্না কর। তোর ভাই কে খাইয়ে খাইয়ে মোটা করতে হবে, তারপর আমি তাকে খাব।"

এই কথা শুনেই ত গিরি কেঁদে গড়াগড়ি দিল। কিন্তু রাক্ষুসী তা শুন্‌বে কেন। সে রোজ তাকে দিয়ে ঘর ধোয়াতে আর রান্না করাতে লাগল।

এর মধ্যে হরি আর গিরি এক ফন্দি করেছে। হরিকে যে ঘরে রেখেছিল, তার দরজা জানালা সব বন্ধ, কেবল একটা জানালায় একটা ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে তাকে

খাবার দেয়। রাক্ষুসী এসে রোজ সেই ফুটোর কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে "দেখিত কত মোটা হয়েছিস। তোর আঙ্গুল দেখি।" তখন হরি করে কি, তার আঙ্গুল না দেখিয়ে, ফুটো দিয়ে এক টুকরা হাড় বার করে দেয়। , বুড়ী ত ভাল করে চোখে দেখ্‌তে পায় পায় না, সে হাড় খানাকে টিপে বলে "বড্ড" রোগা, বড় শক্ত।"

এমনি করে, রোজ রাক্ষুসী আঙ্গুল দেখতে চায়, আর রোজ হরি তাকে হাড় দেখায়।

শেষে একদিন বুড়ী রেগে বল্‌ল "এত কোরে খাওয়াই তবু মোটা হস না? আজ তোকে খাবই খাব।"

তারপর সে গিরিকে ডেকে বল্‌ল "উনুন জ্বাল্, কড়ায় তেল ছাড়। তোর ভাইকে আজ ভেজে খাব। গিরি উনুন ধরিয়ে, এই বড় এক কড়া করে তেল চড়িয়ে দিল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই এক কড়া তেল টগ্‌মগ্‌ করে ফুটতে লাগল। রাক্ষুসী গিরিকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল "দেখ্‌ত তেল গরম হয়েছে কিনা।" গিরি বল্‌ল "তেল কেমন করে গরম হয়, তা ত আমি জানি না। তুমি এসে দেখিয়ে দাও না।"

তা শুনে বুড়ী নিজেই দেখ্‌তে গেল, তেল গরম হয়েছে কিনা। গিয়ে সবে কড়ার উপর উপুড় হয়েছে, অমনি গিরি ছুটে এসে পিছন থেকে মেরেছ তাকে এক ধাক্কা। ধাক্কা খেয়ে দুষ্টু বুড়ী হীক্ করে চেঁচিয়ে সেই তেলের উপর পড়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চিংড়ী মাছের মতন ভাজা হয়ে গেল।

তার আগেই গিরি ছুটে এসে হরিকে দরজা খুলে দিয়েছিল। তারপর, বুড়ীর ঘরে যত হীরা মাণিক ছিল, দুজনে মিলে সব সিন্ধুক থেকে বার করে পুঁটুলী বেঁধে নিল।

সেই পুঁটুলী কি তারা বয়ে আনতে পারে? অনেক কষ্টে ঠেলে ঠেলে সেটাকে তারা গড়িয়ে গড়িয়ে তাদের বাড়ী নিয়ে গেল।

তখন ত খুব মজাই হল। *

* শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত যন্ত্রস্থ '**গল্পের বই**' হইতে গৃহীত।

ভাদ্রের পল্লী।

মুকুলের পাঠক পাঠিকাগণ, তোমাদের অনেকেই পল্লীগ্রামের সহিত পরিচিত নহ; যাঁহারা চিরদিন সহরে বাস করিয়া আসিতেছেন, যাঁহারা কলের জলে স্নান করিয়া বিদ্যুতালোকিত পথে ট্রামের গাড়ীতে ক্রোশ দুই ঘুরিয়া আসিয়াই হাতপাখা ঘুরাইয়া শ্রমদূর করিতে বসেন, পল্লীগ্রামে যাইতে হইবে শুনিলে তাঁহাদের যে হৃদ্‌কম্প হইবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। শুনিয়াছি একজন কলিকাতাবাসী পূর্ব্ব বঙ্গে যাইবার জন্য গোয়ালন্দ ঘাটে নামিয়া ছিলেন, বর্ষার পদ্মার বিপুল তরঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া তিনি ষ্টীমারে না উঠিয়া কলিকাতায় পলায়ন করেন। সুখের বিষয় এরূপ সাহসী লোকের সংখ্যা এদেশে কম; আমাদের এই বাঙ্গালীই একদিন ভারতমহাসাগরের দ্বীপে দ্বীপে হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর অর্ণবজান জাতীয় পতাকা উড়াইয়া সাগরে সাগরে বিচরণ করিত! বিধাতার বিধানে সে গৌরবের দিন আর নাই বটে, কিন্তু সেই বাঙ্গালী এখন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে জর্ম্মাণীও ইটালিতে, চীনে, জাপানে আমেরিকায় জ্ঞানরত্ন আহরণ করিতেছেন, আফ্রিকার দুর্গম প্রদেশেও ইউগণ্ডা প্রভৃতি স্থানও বাঙ্গালী বাস করিতেছেন।

সহরের পাঠকবর্গ পল্লীগ্রামের কথা শুনিয়া হাসিবেন কি না জানিনা; কিন্তু তাঁহাদের মনে হইতে পারে পল্লীগ্রামে ত কেবল দুঃখ!—কেবল দুঃখ না হইলে পল্লীগ্রামের জমীদারেরা গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবেন কেন? পল্লীগ্রামে কি পাওয়া যায় যে, তাহার গৌরব করিব? সেখানে এমন গ্যাস বিদ্যুতের আলো নাই, এমন কলের জল নাই, দারুণ গ্রীষ্মে বরফ নাই; এমন প্রশস্ত পথ, এত গাড়ী পাল্‌কী, এমন জন সমারোহ, এমন সুন্দর সুন্দর জিনিষ দোকান, এত স্কুল কলেজ এমন কি, বাগবাজারের রসগোল্লা পর্য্যন্ত নাই! তবে কি সুখে সেখানে লোকে বাস করে? সহরের লোকের মনে এমন প্রশ্ন উদিত

হইতেই পারে, অনেক পল্লীবাসীর মনেও এই ভাবের উদয় হয়, তাঁহারা পাড়াগাঁ হইতে সহরে পলাইতে পারিলে বাঁচেন! এই সকল লোক মুখ বাঁকাইয়া বলেন, "সেখানে আছে ছাই! কেবল ম্যালেরিয়া, জঙ্গল পচার দুর্গন্ধ, মশার উৎপাত, আর এক হাঁটু কাদা!"—মায়ের ছেঁড়া কাপড় আর রুখু চুল দেখিয়া যাহারা লজ্জিত হইয়া মনে করে ছি, ছি, এই কি আমার মা! তাহাদের অবস্থাও এইরূপ শোচনীয়। নানা অসুবিধা সত্বেও যাহারা পল্লীগ্রামে বাস করিয়া সুখ পায়, তাহারা সত্যই মাকে চিনিয়াছে। মায়ের সেই ছিন্ন বসন ও রুক্ষকেশ দামের ভিতর মাতৃ-হৃদয়ের কি অপার্থিব সুধা সঞ্চিত আছে যে তাহা না বুঝিল, তাহার জীবন বৃথা দেশকে ভালবাসিতে হইলে গ্রামকে ভাল বাসিতে হইবে, পরকে ভাল বাসিতে কে পারে? যে আপন আত্মীয় স্বজনকেও ভাল বাসিতে শিখিয়াছে।

এখন ভাদ্র মাস, পূর্ণ বর্ষা, এখন যদি তোমরা সহর ছাড়িয়া একবার পল্লীগ্রামে বেড়াতে যাও, তাহা হইলে পল্লীগ্রামের সজল শ্যামল শোভা দেখিয়া তোমাদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।

বর্ষার চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। আকাশ কাল মেঘে পূর্ণ কোথাও ফাঁক নাই; যেন মেঘেরা কাল পাখা মেলিয়া চন্দ্রসূর্য্যকে পৃথিবীর মুখ দেখিতে দিবেনা। প্রভাতে এই মেঘের কোলে বকের ঝাঁক সাদা পাখা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে; কোনদিকে একটু বাতাস নাই, ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছও নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া সেই বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। গ্রাম্যপথে দুই একজন পথিক জানুর উপর কাপড় তুলিয়া ছাতা মাথায় দিয়া নিজের কাজে যাইতেছে। গৃহস্থের ঘরের পাশে দুই একটা গরু ঊর্দ্ধ মুখে উচ্ছিষ্ট কলার পাতা চিবাইতেছে, খোড়ো ঘরের জল নীচে মান গাছের পাতায় পড়িয়া ছড়্ ছড়্ শব্দ হইতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঘরের মধ্যে সার দিয়া বসিয়া খেলা করিতেছে আর বলিতেছে 'আগাড়ুম বাগাড়ুম ঘোড়াডুম সাজে।'—বাড়ীর মেয়েরা জলে ভিজিয়া পাতকুয়া হইতে জল তুলিতেছেন, কেহ আস্তাকুরে বসিয়া ছাই দিয়া এক রাশি বাসন মাজিতেছেন। ঘরের পাশে আমতলায় এক হাঁটু জল জমিয়াছে। কয়েকটি ছেলে মেয়ে সেই জলে নামিয়া পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইয়া দিতেছে। সজ্‌নে গাছের ডালে বসিয়া একটা কাক ভিজিতেছে। মাছ ও তরকারী বিক্রেতারা ঝুড়ি মাথায় লইয়া বাজারে যাইতেছে। রাখালেরা তালপাতের ছাতি মাথায় দিয়া মাঠে গরু চরাইতেছে; তাহাদের হাতের পাঁচন কোন কোন গরুর পিঠে পড়িতেছে। দুইচারিটা গরু নত মুখে চরিতেছে, তাহাদের গা বহিয়া জলের ধারা পড়িতেছে। কোন কোন গরু ধানের ক্ষেতের দিকে যাইলে রাখাল দ্রুতবেগে তাহার সম্মুখে গিয়া বাধা দিতেছে। পাঁচন খাইয়া গরু আবার মাঠের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে।

এ সময় ধানের ক্ষেতের শোভা দেখিলে সে দিক হইতে আর চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না। যতদূর দৃষ্টি যায় ধান্য শীর্ষের তরঙ্গ। প্রভাত বায়ুতে ধানের শীষ গুলি হেলিতেছে, দুলিতেছে, যেন মা ছেলেমেয়েদের কোলে লইয়া সোহাগ করিয়া দুলাইতেছেন। কৃষকের দল 'মাথাল' মাথায় দিয়া ধানের জমী নিড়াইতেছে; তাহারা সারি বাঁধিয়া বসিয়া নিড়ানি চালাইতেছে, আর মেঠাসুরে গান করিতেছে। তাহাদের সেই গানে যেন সন্তোষ ও শান্তি ঝরিয়া পড়িতেছে! দুবেলা দুটি খাইতে পাইলে ও নিশ্চিন্ত মনে রাত্রিতে ঘুমাইতে পাইলেই তাহারা সুখী। তাহারা অল্পে সন্তুষ্ট, প্রফুল্ল, সরল, সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র; তাহাদের ময়লা ছেঁড়া কাপড়, অপরিষ্কার হাত পা দেখিয়া তোমাদের মনে হইতে পারে, এরা জানোয়ার নাকি? কিন্তু তাহাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিও, তাহাদের সুখদুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিও, দেখিবে এই সকল চাষা অনেক ভদ্র লোক অপেক্ষা ভদ্র। তোমার নিকট যৎসামান্য উপকার পাইলে তোমার বিপদে তাহারা প্রাণ দিয়া সাহায্য করিবে, তোমার সম্পদে

পরমানন্দ অনুভব করিবে। ইহারা আমাদের দেশের হাত পা। ইহারা যদি দল বাঁধিয়া চাষ ছাড়িয়া দেয়, হঠাৎ আমাদের মত সভ্য হইয়া পল্লিগ্রামের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদের উননে হাঁড়ি উঠে না।

চাষাদের কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি অসাধারণ! ঐ দেখ, একজন বড়লোক পল্লীগ্রামের পথ দিয়া পাল্কী চড়িয়া কোথায় যাইতেছেন, চারি জন বেহারা তাঁহার পাল্কী খানা বহিয়া লইয়া যাইতেছে, আর চারিজন বেহারা পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে, পাল্কী বাহকেরা পরিশ্রান্ত হইলে, এই চারিজন তাহাদের স্থান অধিকার করিবে। ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, পথের কাদা হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, বৃষ্টির জলে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, পরিধেয় বস্ত্রও সিক্ত; কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া তাহারা দ্রুতবেগে দীর্ঘ পদ চলিতেছে। হয়ত সমস্ত দিন খাটিয়া ইহাদের প্রত্যেকে আট আনা পারিশ্রমিক পাইবে। তদ্দ্বারা তাহারা সংসার প্রতিপালন করিবে। আমাদের দেশকে ভাল করিয়া জানিতে হইলে এই সকল নিম্ন শ্রেণীর লোকের সুখদুঃখের পরিচয় লইতে হইবে। তাহাদিগকে আপনার জন মনে করিতে হইবে।

এসময় সঙ্কীর্ণ বনপথ দিয়া গ্রাম প্রান্তবর্ত্তী নদী তীরে উপস্থিত হইলে কি দেখিতে পাইবে?—দেখিবে, নদীর জল দুই তীর প্লাবিত করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। নদীর প্রবল স্রোতে কত গাছ, কত জলজ লতা ভাসিয়া যাইতেছে; টোপা পানা ও পানিফলের যে জঙ্গল ভাসিয়া যাইতেছে তাহার উপর ডাহুক জলপিপি প্রভৃতি জলচর পক্ষী বসিয়া শিকারের অনুসন্ধান করিতেছে, কখন উড়িয়া কিছু দূর যাইতেছে আবার ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ব স্থানে বসিতেছে। নদীতীরে বটগাছের ডালে একটা শঙ্খ চিল বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া আছে, জলে কোথায় কোন্ মাছটা নড়িতেছে তাহাই দেখিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকা মহাজনের পণ্যদ্রব্য লইয়া দেশ বিদেশে চলিয়াছে, নৌকার সাদা পালের ছায়া নদীর জলে প্রতি ফলিত হইতেছে। নদীর তীরে এক বুক জলে দাঁড়াইয়া জেলেরা মাছ ধরিতেছে, কোথাও বা জেলেরা জেলে ডিঙ্গী হইতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। পার ঘাটায় খেয়া নৌকা লোকজন গাড়ী গরু লইয়া পর পারে যাইতেছে।

পূর্ব্বে যেখানে স্নানের ঘাট ছিল, এখন সেখানে সাঁতার জল। কুমীরের ভয়ে লোকে এক কোমর জলে দাঁড়াইয়া স্নান করিতেছে; কিন্তু ছেলেদের ভয় নাই, তাহারা ডুব সাঁতার দিয়া গভীরজলে যাইতেছে, স্রোতের জলে গা ভাসাইয়া দিয়া বহুদূর চলিয়া যাইতেছে, এক ঘাটে নামিয়া আর একঘাটে উঠিতেছে। স্ত্রী লোকেরা মেয়েরা ঘাটে স্নান করিতে নামিয়াছেন; ছোট ছোট এক বুক জলে কলসীতে ভর দিয়া সাঁতার দিতেছে, রমণীরা ভাসমান কলসীর উপর বস্ত্র প্রসারিত করিয়া গামছা দিয়া গা পরিষ্কার করিতেছেন, কেহবা তীরে বসিয়া মাটি দিয়া শিব গড়িয়া ভক্তিভরে শিব পূজা করিতেছেন, কেহ মাটী দিয়া কলসী মাজিতেছেন।

নদীতীরে কাশ বন; শাদা শাদা কাশ ফুল ফুটিয়া নদীতীর আলো করিয়া রহিয়াছে; সেখানে নানাজাতীয় পাখী উড়িয়া উড়িয়া কীট পতঙ্গ ধরিয়া লইতেছে। এক একটা মাছরাঙা পাখী কোনও গাছ হইতে ঝুপ করিয়া জলে পড়িতেছে এবং একটি ক্ষুদ্র মাছ মুখে লইয়া আবার গাছে গিয়া বসিতেছে। নদী তীরবর্ত্তী বাগানের মধ্যে বাণের জল প্রবেশ করিতেছে, গাছগুলি এক গলা জলে দাঁড়াইয়া আছে।

সন্ধ্যার পর আকাশ পরিষ্কার হইল। শরতের চন্দ্র হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইল; উজ্জ্বল চন্দ্র কিরণে বৃষ্টি স্নাত প্রকৃতি যেন হাসিতে লাগিল। গোপপল্লীর গোয়াল ঘর হইতে সাঁজালের ধূম উঠিতেছে। দোকানদারেরা দোকানের কাজ শেষ করিয়া মাটীর প্রদীপের নিকট বসিয়া সুর করিয়া রামায়ণ মহাভারত পড়িতেছে, শ্রোতার দল তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া সেই সেই পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিতেছে। বাঁশ বনে শত শত জোনাকি মিট মিট করিয়া জলিতেছে, উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পথের ধারে ঘাসের মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকা গান ধরিয়া দিয়াছে। গর্ত্তের জলে ভেকের দল সরু মোটা নানা সুরে আনন্দ কোলাহল করিতেছে। গ্রাম্য শিবমন্দিরে কাঁশর ঘণ্টা বাজিতেছে; এবং বৈষ্ণবের আখড়ায় বৈষ্ণবের দল খোল করতাল বাজাইয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে। আর গৃহস্থের গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঠাকুরমাকে ঘিরিয়া বসিয়া তাঁহার কাছে 'ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী' 'সোণার কাটী রূপার কাটী' 'সাত ভাই চম্পা' প্রভৃতি রূপ কথা শুনিতেছে, ঠাকুরমা হরিনামের মালা লইয়া নাতি নাতিনীদের গল্প শুনাইতেছেন, এবং তাঁহার সেই সকল মধুর কাহিনী শুনিতে শুনিতে শিশুদিগের চক্ষু নিদ্রা ঘোরে মুদিয়া আসিতেছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

———

ভারতবন্ধু হিউম।

১৮শ ভাগ । আশ্বিন, ১৩১৯ । ৬ষ্ঠ সংখ্যা। ।

ভারতবন্ধু হিউম।

এই জগতে প্রতিদিন কত লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং কত লোক মরিতেছে। সাধারণতঃ মানুষ আপনাদের সুখ ও আপনাদের স্বার্থের জন্যই বাঁচে ; তাহারই অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং জীবন অতিবাহিত করে। এই জন্য যখন এমন কোনও লোক দেখিতে পাই, যিনি কেবল আপনার সুখের জন্য জীবন ধারণ করেন না, অপরের জন্য নিজের সুবিধা ও স্বার্থ অকাতরে বিসর্জ্জন দেন, তখন আমাদের মন স্বভাবতঃই তাহার নিকট সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাতে অবনত হয়। পরলোকগত আলান অক্টেভিয়ান হিউম এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার নাম, আশা করি, তোমাদের মধ্যে অনেকেই শুনিয়াছ। তিনি আমাদের দেশের জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠাতা ; জীবনের শেষভাগ ভারতের কল্যাণ সাধনে উৎসর্গ করিয়া আলান হিউম আমাদিগকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতবাসী চিরদিন ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন।

আলান অক্টেভিয়ান হিউম ১৮২৯ সালের ৪ঠা জুন

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জোসেফ হিউম প্রথম বয়সে সরকারী ডাক্তারী কার্য্য গ্রহণ করিয়া ১৭৯৭সাল ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। নয় বৎসর এদেশে থাকিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি এক ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া আপনার আর্থিক অবস্থার সমধিক উন্নতি সাধন করিয়া ছিলেন, এবং জীবনের অবশিষ্ট অংশ স্বদেশের সেবায় এবং নানা জনহিতকর কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। জোসেফ হিউম পার্লিয়ামেণ্টের এক জন সুপ্রসিদ্ধ সভ্য ছিলেন; সাধারণতঃ তিনি ব্যয়সংক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন; তৎকালীন রাজস্ব সচিবেরা তাঁহার ভয়ে অস্থির থাকিতেন। জনসাধারণের অর্থের কোনও অপব্যয় হইলে তিনি নির্ভয়ে তাহার সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিতেন। আলান পিতার সৎসাহস এবং জনহিতৈষণা প্রবৃত্তি পূর্ণ পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জোসেফ হিউম নরফোক সহরের সন্নিকটে এক খানি সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এখানেই হিউম প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। তৎপরে কিছুদিন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া সেকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারি সংগ্রহের জন্য হেলিবারীতে যে কলেজ ছিল তাহাতে প্রবেশ করেন। এই কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতের সিভিলসার্ব্বিসে নিযুক্ত হইয়া মিঃ হিউম ১৮৪৯ সালে এদেশে আগমন করেন। প্রথমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তিনি কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সিভিল সার্ব্বিসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং একজন দক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হন। সিপাহী বিদ্রোহের প্রারম্ভের সময় হিউম এটোয়া জেলায় মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এটোয়া কানপুর এবং আগ্রার মধ্যস্থল অবস্থিত; অপর দিকে গোয়ালিয়র ও এখান হইতে বেশী দূর নহে; সুতরাং এখানে বিদ্রোহের আশঙ্কা অতি প্রবল ছিল। এটোয়ার ইংরেজ অধিবাসীগণকে প্রাণ হাতে করিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। মিরাটের সিপাহীগণ বিদ্রোহের এটোয়া আক্রমণ করে। হিউম স্থানীয় পুলিস প্রহরীর সাহায্যে বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করেন। অল্প দিন পরে আর একদল বিদ্রোহী নিকটবর্ত্তী যশোবন্তী নগরের মন্দির অধিকার করে। হিউম এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার অধীনস্থ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ক্লেয়ারমণ্ট ড্যানিয়েলকে লইয়া, বিদ্রোহীদের সন্ধানে গমন করেন। মন্দিরের নিকটে পৌঁছিয়া তাঁহাদের অধীনস্থ অল্পসংখ্যক সৈন্যদিগকে অল্প দূরে সাজাইয়া হিউম মাটিতে শুইয়া বন্দুকে নিশানা করিলেন; যে বিদ্রোহী মন্দিরের বাহিরে আসিল হিউম অব্যর্থ সন্ধানে তাহাকে ভূমিশায়ী করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহযোগ ড্যানিয়েল মন্দিরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া বিদ্রোহীদের গুলিতে আহত হন। হিউম তখন একজন মাত্র পুলিস কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া বিদ্রোহীদের গুলি বর্ষণের মধ্য হইতে ড্যানিয়েলকে উদ্ধার করিয়া এটোয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যদিও মন্দির অধিকার করিতে পারিলেন না, কিন্তু বিদ্রোহীরা হিউম প্রমুখ ইংরাজের সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিছুদিন পরে এটোয়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে আগ্রায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। হিউম একদিকে যেমন বিপদে অকুতোভয়তা এবং বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, বিদ্রোহান্তে তেমনি দয়া ও সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন। যদিও অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিন্নভিন্ন বিদ্রোহী সিপাহিরা এটোয়ার চতুষ্পার্শ্বে যাওয়া আসা করিয়াছিল, কিন্তু হিউমের ধীরতা ও সহৃদয়তায় তাঁহার জেলার লোকেরা শান্তিভঙ্গ করে নাই! বিদ্রোহীরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল; অবশ্য কেহ তাঁহাকে ধরিয়া দেয় নাই। বিদ্রোহ দমনের পর হিউম প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির লেশমাত্র দেখান নাই। ১৮৬৭সাল পর্য্যন্ত তিনি এটোয়ার মাজিষ্ট্রেট ছিলেন; এবং এই সময়ে তাঁহার চেষ্টায় এটোয়ার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এটোয়ার এক অংশ এখন পর্য্যন্ত হিউমগঞ্জ নামে অভিহিত। অতঃপর মিঃ হিউম ক্রমে রাজকার্য্যে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে অধিরোহণ করেন।

করিয়াছিলেন; ইচ্ছা করিলে তিনি সিভিলসার্ব্বিসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে উন্নীত হইতে পারিতেন। কিন্তু রাজকার্য্যে দক্ষতার জন্য হিউমের গৌরব নহে; দক্ষ কর্ম্মচারী ভারতবর্ষে অনেক আসিয়াছে এবং আসিবে; হিউম যে কার্য্যের দ্বারা ভারতবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহা রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর করিয়াছিলেন।

১৮৮২সালে মিঃ হিউম উচ্চরাজপদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ ইংরাজ কর্ম্মচারিরা অবসর গ্রহণ করিয়া সঞ্চিত অর্থ এবং মোটা পেনসন লইয়া বিলাতে গিয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করেন। হিউম তাহা করেন নাই। তিনি নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই অবসর গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীদের কল্যাণ সাধনে আপনার জীবন উৎসর্গ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে ভারতবাসীদের অভাব এবং অভিযোগ জ্ঞাপনের জন্য কোনও জাতীয় সভা বা সমিতি নাই। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা, বোম্বাই, লাহোর প্রভৃতি স্থানে প্রাদেশিক সভা সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতার ভারত সভার উদ্যোগে দুইবার বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের লইয়া জাতীয় মন্ত্রণা সভা হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটী স্থায়ী জাতীয় সমিতি ছিল না। মিঃ হিউম রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অদম্য উৎসাহ ও অবিরাম পরিশ্রমের সহিত এই কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবসর গ্রহণের তিন বৎসরের মধ্যেই প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় এবং পরিশ্রমে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৮৫ সালে বোম্বাই সহরে তাহার প্রথম অধিবেশন হয়। ইহার জন্য তিনি কেবল অসাধারণ শ্রম করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাকে অজস্র অর্থব্যয়ও করিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে যে জাতীয় মহাসমিতির "জন্মদাতা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক হইয়াছে। তিনি না হইলে জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠা হইত কি না সন্দেহ। আমাদের এই বিস্তীর্ণ দেশের নানা বিভাগের নানা শ্রেণীর লোকদিগকে একত্র সমাবিষ্ট করিয়া দেশের কল্যাণ চিন্তায় নিযুক্ত করা তাঁহার ভিন্ন কখনও সম্ভব ছিল না। একদিকে দেশের লোকের ঔদাসীন্য এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ঈর্ষা অপরদিকে রাজকর্ম্মচারীদের সন্দেহ ও বিরোধ, ইহার মধ্যে অসীম সহিষ্ণুতা ও অপরাজিত উদ্যম সহকারে হিউম আপনার লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিধাতার কৃপায় তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল। অল্পদিনের মধ্যেই জাতীয় মহাসমিতি দেশের শিক্ষিত লোকগণের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পিতার ন্যায় স্নেহ ও যত্নে নয় বৎসর কাল জাতীয় মহাসমিতির কার্য্য পরিচালনা করিয়া ১৮৯৪ সালে হিউম এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। আর তিনি এদেশে ফিরিতে পারেন নাই। তিনি কখনও জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি হন নাই। যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, তিনি ইহার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়াও ভারতবাসীর কল্যাণ চিন্তাই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান ছিল। ইংলণ্ডে ফিরিয়া তিনি ভারতবাসীদের অভাব ও অভিযোগ ইংলণ্ডের লোকের গোচর করিবার জন্য লণ্ডনে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির একটী শাখা সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। যতদিন শরীরে শক্তি ছিল তিনি অক্ষুব্ধচিত্তে ভারতের কল্যাণের জন্য চিন্তা এবং পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ভারতবাসী এমন অকৃত্রিম বন্ধু অল্পই পাইয়াছে। অকপটে ভারতবাসীদিগকে ভালবাসিতেন বলিয়া তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের দোষ ক্রুটী ও দেখাইয়া দিতেন। মিঃ হিউম সর্ব্বদাই বলিতেন, যে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে হইলে সামাজিক কুসংস্কার এবং দুর্নীতি সমুদয় অগ্রে দূর করা আবশ্যক। আমাদের দেশের ব্যক্তি ও জাতিগত ঈর্ষা এবং বিদ্বেষ লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে "অনেক সময়ে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়"। বাল্যবিবাহের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন যে "এই সামাজিক কলঙ্ক মোচন জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। এবং যে ভারতবাসী এই কার্য্যের জন্য বদ্ধপরিকর না হইবেন, স্বদেশপ্রেমিক নামে তাঁহার অধিকার নাই।"

তাঁহার জ্ঞান স্পৃহা এতদূর প্রবল ছিল যে সরকারী কার্য্যের চাপের মধ্যেও তিনি সময় করিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন। প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যাতে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ভারতবর্ষে অবস্থিতি কালে তিনি বিবিধ জাতীয় ৮২০০০ পক্ষী এবং ১৬০০০ ডিম্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেগুলি এখন লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ সাউথ কেনসিংটন যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষী সম্বন্ধে তিনি একখানি সুবৃহৎ পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। মিঃ হিউম উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষার জন্য সাউথ লণ্ডন বোটানিকাল ইনষ্টিটিউশন নামক একটী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার নিজের সংগৃহীত ৪০০০০ প্রকারের উদ্ভিদের নমুনা প্রদান করিয়াছিল। একেই বলে মনুষ্য জীবন! যাঁদের জীবন এমনি ভাবে জ্ঞান আলোচনায় ও পরের সেবায় অতিবাহিত হয় তাঁহাদেরই জীবন ধারণ সার্থক!

অনাথ

একাদশ অধ্যায়।

বিজয়া দশমী।

"সে এখন বহুদিনের কথা, এক মামীমা ছিলেন তিনি খুব সুন্দর বাড়ীতে থাকতেন, পূজার সময় তাঁর সব ভাগ্না ভাগনীদের নিমন্ত্রণ করে এনে তাঁর বাড়ীতে রেখেছিলেন", এই বলে করুণা চুপ করলে, বীরেন তাড়াতাড়ি বল্লে, "দিদি গল্পত সত্যি হয়েছে"; খুকু ব্যস্ত হয়ে বল্লে "বল্ দিদি বল্ এই গল্পত আগেও বলেছিলে সেখানে পুতুলদের থাকবার এক বাড়ীছিল।" বীরেন বল্লে, একটা দোলনা ঘোড়া ছিল। খুকু করুণার মুখ ধরে নাড়া দিয়ে বল্লে "দিহু গল্প সব ভুলে গেলি কি? চুপ কল্লে কেন?" করুণা হেসে ছোট বোনটিকে আদর করে বল্লে "না যাহু, ভুলব কেন এই বলছি,—সে বাড়ীতে ছেলেদের খেলবার জন্য একটা মস্ত বড় ঘর ছিল। এই বাড়ীর মত দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর বড় বড়

সময় শরতের সোণালি আলো আর ঝুর ঝুরে বাতাস আসত; ঘরের মাঝে ফরাসপাতা, তার উপর কত রকমের সুন্দর পোষাক, খেলনা, কত রকমের মিষ্টি সাজান ছিল। বীরেন দৌড়ে গিয়ে ফরাসের উপর সাজান জিনিসের ঢাকা খুলে দেখলে সেখানে কত সুন্দর সৌখীন পোষাক, খাবার ও খেলনা। যে কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল, তাতে জরিরকাজে লেখা রয়েছে, "পূজার আশীর্ব্বাদ।" দর্জ্জির বিদ্যা কম পূজা বানান করতে হ্রস্বউ লিখেছিল, তাই দেখে ছেলেদের ভারি হাসি পেলে।

বীরেন বল্লে "দিদি টাটু ঘোড়া বাগানে বাঁধা থাকবার কথা আর বোলনা, এখনতো শীত পড়েছে, সহিস নিশ্চয়ই তাকে আস্তাবলে রাখবে।" শোভনা রোগখিন্ন বিরক্তির স্বরে বল্লে কে গল্প শুনতে চায় আমি কোন গল্পই শুনতে চাইনে। বীরেন বল্লে "আজতো বিজয়া দশমী, ব্রাহ্মণ দিদি তাইতো বল্লে।" সত্যি সেদিন বিজয়া দশমী; চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেক দিন হলো পৌত্তলিক অনুষ্ঠান উঠিয়ে দিয়েছিলেন; তবে অন্যান্য বৎসর এসময় খুব আমোদ আহ্লাদ হত। কাঙালি ভোজন, আত্মীয় স্বজনকে একত্র করা, যাত্রা, কথকতা, গ্রামের ছেলেদের নানা রকম খেলা ও পুরস্কার বিতরণ হত। কিন্তু এবৎসর শোভনার অসুখ, সবই নিরানন্দ, তাই বেদপাঠ ছাড়া আর কিছু হয় নি। গ্রামের স্কুল চিকিৎসালয় প্রভৃতিতে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শোভনা সুস্থ হয়ে উঠলে কোজাগর পূর্ণিমায় সব আবার করবেন বলে স্থির করে-ছিলেন। শোভনা একটু সুস্থ হয়েই মামীকে বল্লে, "রাণীমামী আমার ভাইবোন্দের সকলকে দেওয়ানজীর ওখান হতে আনিয়ে নাও। এপূজার সময় তারা দূরে থাকবে সে আমার ভাল লাগেনা। তাদের সকলকে আনাও, মামাবাবুর ছেলে বেলাকার খেলবার বড় ঘরে আমরা সবাই মিলে খেলব। এই অসুখের পর শোভনা যখনি যা ইচ্ছা প্রকাশ করত, তখনি তা কার্য্যে পরিণত করা হত। শোভনা অনুরোধ করবা মাত্র হীরাসিং দরওয়ান গিয়ে বীরেন আর খুকুকে দেওয়ানজীর ওখান

রাণীঠাকুরাণী শোভনাকে যতই ভাল বাসুন, তার নিয়ত আব্দারে অসুস্থ শরীরের নতুন নতুন খেয়ালে শ্রান্ত হয়ে পড়তেন, তখন খুকু তাঁর কাছে খুবই আদর পেত। তার যেমন মিষ্টি মুখ তেম্নি মিষ্টি স্বভাব। আদরে, অযথা আদরেও তাকে নষ্ট করতে পারত না। করুণা রাত্রদিন বিরাম বিশ্রাম নেই, কেবল শোভনার সেবা করত, তাকে ছেড়ে অল্প সময়ের জন্যেও কোথাও যেত না। বীরেন রাজা বাহাদুরের ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরত, তিনি শোভনার অসুখ হয়ে অবধি আরো গম্ভীর হয়ে থাকৃতেন, তাঁর প্রশান্ত মুখে দুঃখের কাল ছায়া পড়েছিল, অন্যমনস্ক ভাবে একা বসে থাকৃতেন, বীরেনের অস্তিত্ব অত সময় ভুলে যেতেন। তবু যখনই দেখতেন সে শ্রদ্ধার সহিত নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে তখনি তাঁর মনে একটা সান্ত্বনা আসৃত; তিনি স্নেহ কোমল স্বরে তাঁর সঙ্গে কথা বলৃতেন।

যে দিন খুকু আর বীরেন রাজ বাড়ীতে এল শোভনা করুণার হাত ধরে বল্লে "দিদি দেখ আমিত স্বার্থপর নই, সবাই সুখে থাকে এই আমি চাই, সেই যে পিসিমার বাড়ী আমরা হাত ধরে শপথ করেছিলাম পূজার সময় সব ভাই বোন্ একত্র হব, সে কথাও আমি রেখেছি।"

করুণা ধীর কণ্ঠস্বরে বল্লে "না সোণাময়ী তুমি কেন স্বার্থপর হবে, তুমি আমার লক্ষ্মী বোন্!"

আজ আমরা সবাই নতুন কাপড় পরে সন্ধ্যার সময় একত্র হব, আমি তোমাদের জন্য কেমন সুন্দর সুন্দর জিনিশ রেখেছি, তাত জান না। সব আমি তোমাদের দেব, তার পর সবাই হাতে ধরে গান গাইব, 'পুরাণ সেদিনের কথা ভুলবি কিলো হায়' দিদি তুমি সুখী হচ্ছনা কেন? কেন অমন মুখ ভার করে আছ?"

করুণা দুঃখিত স্বরে বল্লে, "আমি সুখী হয়েছি, তবে তুমি একেবারে সেরে উঠেছ, সুস্থ সবল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, দেখলে আমার ভাবনা যায়।"

এখুনি সেরে উঠেছি। জিনিসের দাম সব মামীমা দিয়েছেন, তবে আমিই সব সব পছন্দ করে দিয়েছি, মনে করেছি, তাহলে কি আমার দেওয়া হয় না।"

"তুমি যখন মনে করেছ, তখন তো তোমারি দেওয়া হয়েছে।"

বিজয়া দশমীর রাত্রি,—দূরে গ্রামের ভিতর বিসর্জ্জনের ফেরতা লোক ঢাক বাজাচ্ছে, তাতে সমস্ত মন উদাস হয়ে উঠছে। শোভনাকে বিছানার উপর উঠিয়ে বসিয়ে দেওয়া হইয়াছে, তার মুখ খানি একে বারে ছোট হয়ে গিয়েছে, মুখ এমন রক্তহীন সাদা, যে মনে হয় যেন মুখের চামড়া স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে, কপালের নীল শিরাগুলি সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাকে এম্নি ক্ষীণ সুকুমার কষ্ট-কাতর দেখাচ্ছিল, যে করুণা বারম্বার মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে, যে শোভনাকে যেন কখনো রাজ বাড়ীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে দেওয়ানজীর মধ্যবিত্ত সংসারে সেই সব দুরন্ত ছেলেদের সঙ্গে গিয়ে বাস না করতে হয়। সে যেন চিরকাল আরামে ও শান্তিতে থাকতে পায়। শোভনার এই সুকুমার মূর্ত্তি দেখে খুকু আর বীরেন কেমন স্তব্ধ হয়ে রইল, তাদের সব স্ফূর্ত্তি যেন চলে গেল। বিশেষতঃ যখন এক জন গম্ভীর আধা-বয়সী ভদ্র স্ত্রীলোক শোভনার পরিচর্য্যার জন্যে তার চৌকির কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাহাদের মন আরও দমে গেল। শোভনার এখনও এমন শক্তি হয়নি, যে সে নিজে কিছু করতে পারে, প্রত্যেক কাজের জন্যেই এই ভদ্র স্ত্রীলোকটির উপর তার নির্ভর করতে হত। তবুও সে এমন রূঢ় ভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইত, তাকে হুকুম করত যে, তাই দেখে তার ছোট ভাই বোন্‌রা একেবারে অবাক হয়ে গেল। কিছু ক্ষণের জন্যে তিনি যখন বাইরে গিয়েছেন, তখন শোভনা বল্লে, "আমরা এখন একা হয়েছি; নার্সটা আর আসছে না বোধ হয়, এস আমরা সবাই মিলে 'কাল সকালে উঠব মোরা' গাই। আমার গানটা খুব ভাল লাগে, গাইতে গাইতে আমার মনে আনন্দ হবে।"

ধরাধরি করতে হয়—সেই পিসিমার বাড়ী মনে নেই ?'' বীরেন ছোট্ট বোন্‌টীর স্মরণ শক্তি দেখে ভারী খুসী হয়ে বল্লে "খুকুর খুব মনে থাকে, অতটুকু পুঁচকে মেয়েটার পক্ষে খুব বাহাদুরী বলতে হবে।'' শোভনা বিরক্ত হয়ে বল্লে, "বীরে তুই ভারি অসভ্য হচ্ছিস, মেয়েটা আবার কি কথা ?" "মেজদি তুমিত সব জান, অসভ্য বলে বগলে। ছেলেরা ত অম্নি বলে থাকে ; দেওয়ানজীর ছেলে লক্ষ্মণ দাদাত তোমাকেও মেয়েটা বলে।''

অসুস্থ শোভনার চোখে জল ভরে এল, সে দুর্ব্বল কাঁদকাঁদ স্বরে বল্লে, "সে সব চাষা ছেলে কি বলে আমি শুনতে চাইনে !''

করুণাও বিরক্তির স্বরে বল্লে "বীরেন চুপ কর। শোভামণি, আমার ত ঐ দুঃখ ; বীরেন সেই সব অভদ্র ছেলের অনুকরণ করতে ভালবাসে। দেওয়ানজী কখনো ও রকম অসভ্য ভাবে কথা বার্ত্তা বলেন না। তিনি তোমার কথা বলবার সময় আমায় বলেছেন, শোভনা যেন লক্ষ্মী প্রতিমা—স্কুলের ছেলেরা কি বলে তাতে কিছু আসে যায় না। যাঁরা বড় যাঁরা ভদ্র তাঁরা কখনো তোমাকে "মেয়েটা'' বলবেন না, কোন রূঢ় কথা ব্যবহার করবেন না।" বীরেনের চোখ দুটিও ছল ছল করে এল, সেত দিদির কাছে কখনো বকুনি খায়নি।

শোভনা বল্লে ''আমি তোমাদের আমোদের জন্যে এত আয়োজন করেছিলাম, তোমরা খুসী হবে ; আমাকে ভালবলবে।'' বীরেন তাড়াতাড়ি বলে উঠলে "খুসিত হয়েছি ; ভাল বল্‌বার অবসর তুমি কই দিচ্ছ, তুমিত নিজেই নিজের প্রশংসা করছ।" করুণা দুঃখিত স্বরে বল্লে "ছি বীরেন ছি চুপ কর। শোভামণি আমরা সত্যি খুবই খুসী হয়েছি। বীরু, খুকু, দেওয়ানজীর বাড়ী কি এমন হত ? দেখত তোমাদের মেজদি অসুখ শরীরেও তোমাদের জন্যে কত ভেবেছেন, কত ভাল ভাল জিনিস দিয়েছেন, আমিত কিছুই দিতে পারতাম না !''

শোভনা বল্লে "দিদি তোমাকেও দিয়েছি।''

করুণা স্নেহ স্বরে বল্লে "হাঁ মণি আমাকেও দিয়েছ।"

দিদিও আমাদের দিত। আজ রাজাবুড়ো একটা হাফ গিনি আমাকে দিয়েছেন—আমিও তোমাদের জন্যে কত কি কিনব, দেওয়ালির দিন সব দেখতে পাবে !" করুণা বীরেনকে "রাজাবুড়ো" বলতে শুনে একেবারে আশ্চর্য্য ও হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কেবল অত্যন্ত দুঃখিত স্বরে বল্লে, "ছিঃ বীরেন ছিঃ।" বীরেন বল্লে "লক্ষ্মণ দাদাও তো রাজাবুড়ো বলে"। "রাজামামা তোমাদের এত স্নেহ করেন, এত উপকার করছেন, আর তুমি কিনা তাঁকে এমন অসম্মানের ভাবে কথা বলছ, আমার মনে কত যে কষ্ট হচ্ছে আমি কি বলব। মা যে তোমাকে এত ভাল কথা শিখিয়েছিলেন, তার কিছুই মনে রাখনি ?''

বীরেন একটু চুপ করে থেকে বল্লে "আমায় মাপ কর। কিছু আর বলবনা ; আমি রাজাবাবুকে অপমান করতে চাইনি তোমরা সব কথাতেই বল ওটা বোলনা সেটা বোলনা। দেওয়ানজীর বাড়ীতে অত গোল নেই। সেখানে থাকলেই ভাল হত।"—তারপর থালা ভরা সুখাদ্য মিষ্টান্নের দিকে তাকিয়ে বল্লে "না না দেওয়ানজী মহাশয়ের বাড়ীর চেয়ে এখানে ভাল, আর সত্যি রাজাবাবু খুব খাসা লোক, আমি তাঁকে খুব খাতির করি।" শোভনা বল্লে "দেখ আমরা সবাই আবার একত্র হয়েছি, পিসিমার বাড়ীতে ছিলাম আমাদের মনে কত কষ্ট ছিল, সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকতাম, কখন বুঝি দুষ্ট মামার জন্যে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়। কিন্তু দেখ মামাবাবুর জন্যেই আজ আমরা সকলে একত্র হয়েছি, আর তোমরা না পার, আমি অন্ততঃ তোমাদের সকলকে ভাল ভাল পূজার উপহার দিয়েছি। আমরা তো কেউ কাউকে ভুলে যাইনি, আর কখনো ভুলে যাবনা।"

খুকুমণি উর্ম্মিলা এতক্ষণ অতি ধীর ভাবে এক হাতে বীরেনের অন্য হাতে করুণার হাত ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে শোভনার কাছে এগোয়নি তাকে ভয় করত—খুকু এত কথা বার্ত্তার আর শেষ হয় না দেখে কোমল করুণ স্বরে বল্লে "কই আমাদের গান তো গাওয়া হ'লনা।''

শোভনা বল্লে ''তোমরা সবাই খুব আস্তে আস্তে গাও ; তা না হলে আমার মাথা ব্যথা করবে।'' তার পর একখানি ক্ষীণ হাত বাড়িয়ে বীরেনের অন্য খানি দিয়ে করুণার হাত ধরলে। গান আরম্ভ হ'ল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
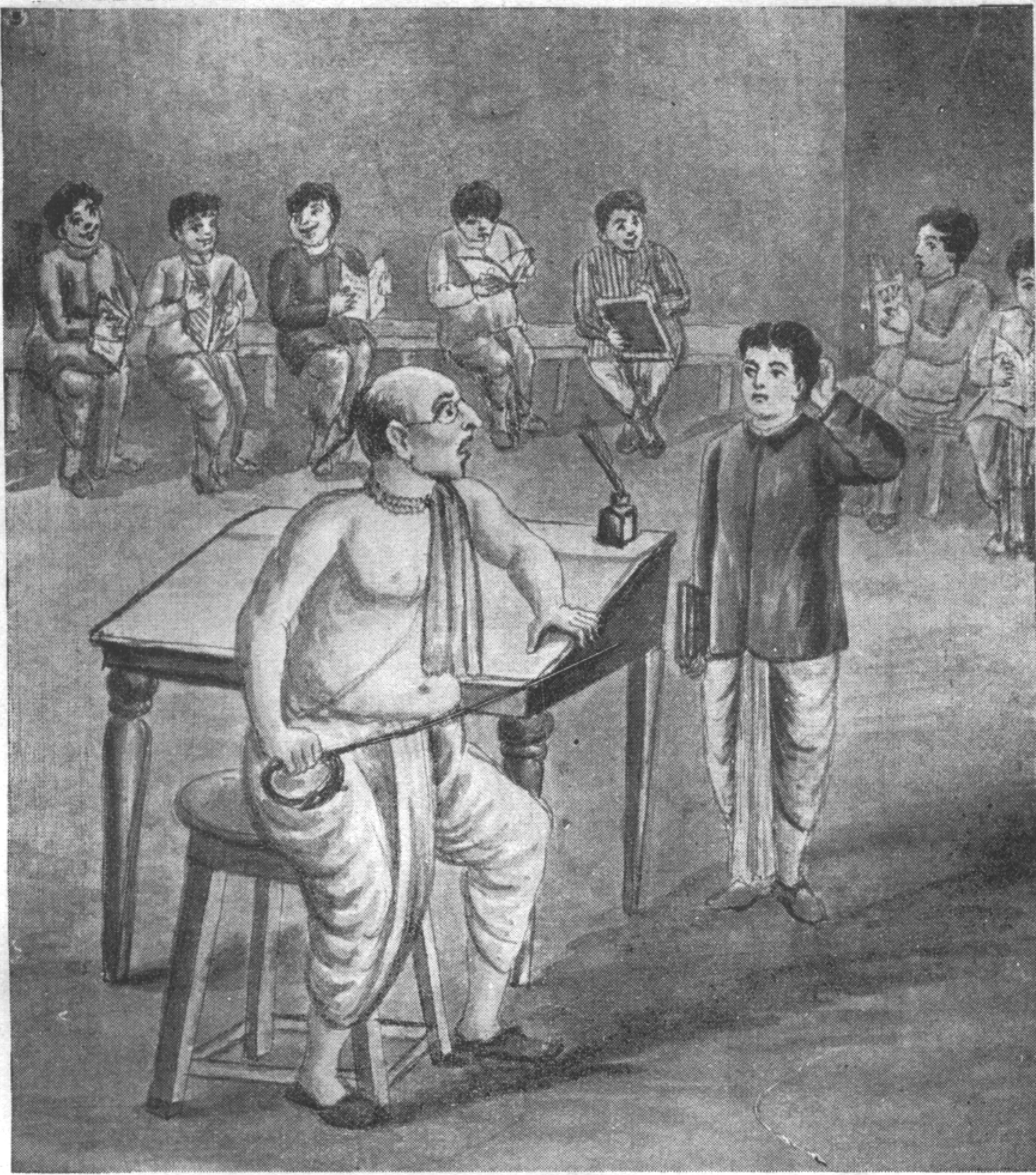
ছাত্র ও শিক্ষক।

প্রথম দিবস।

ছাত্র।

হাত কন্ কন্ গা ঝন্ ঝন্
মাথা বন্ বন্ করে,
পড়াটা তাই আজ হয় নাই
যাচ্ছি নীচে স'রে।

দ্বিতীয় দিবস।

ছাত্র।

খোকার কাশি, বাবার শ্বাসী
দেয়নি দাসী আলো,
তাইতে মশাই আজো হয় নাই
আমার পড়া ভালো।
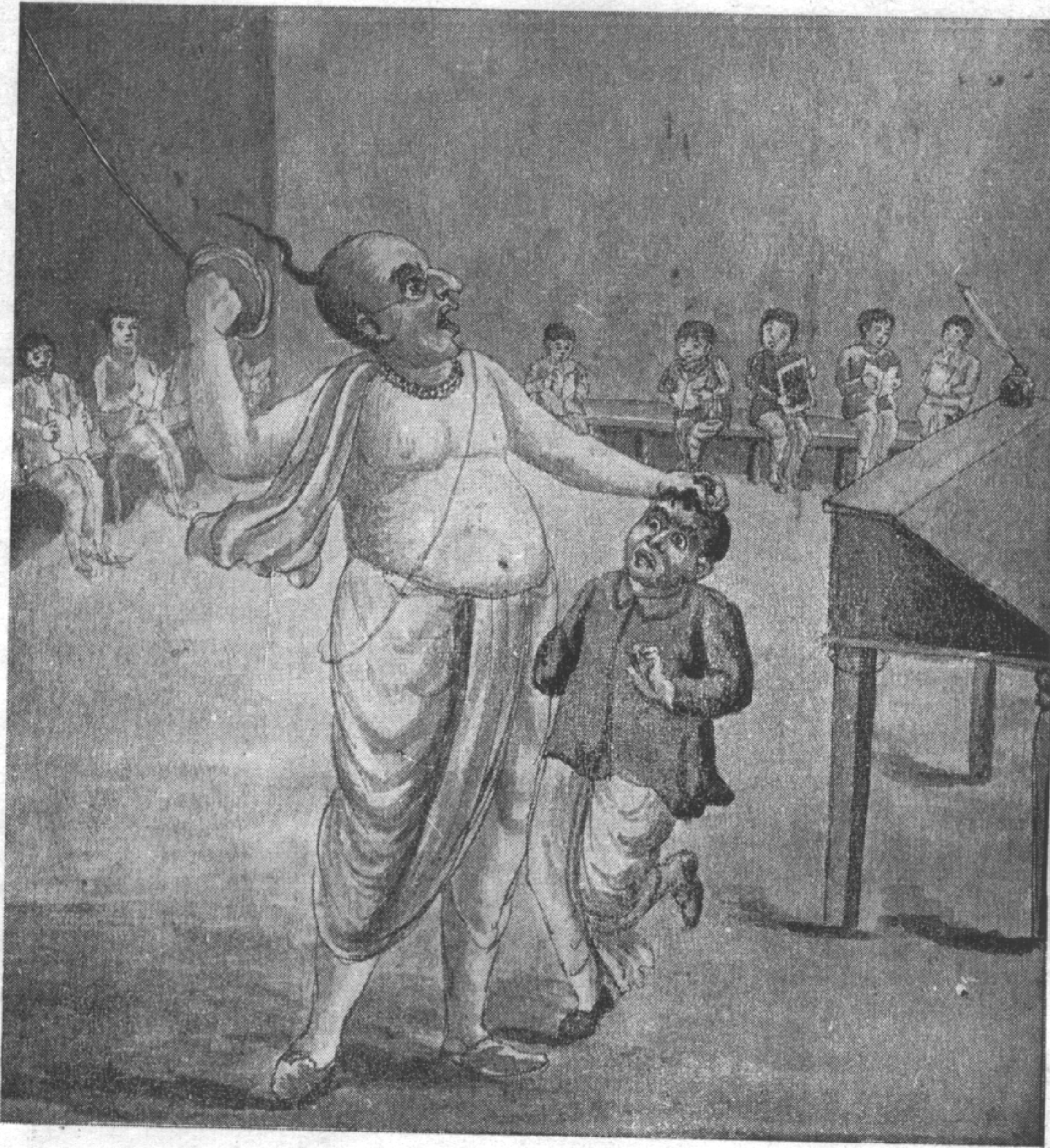
তৃতীয় দিবস।

ছাত্র !— পুঁথি পেন্সিল নিয়েছে চিল,
দোয়াত ফেলেছে ছেলে,
তাইতে পড়া হয়নি করা,—
এবার হ'তো নইলে।

শিক্ষক।—আজ্‌কে এটা কাল্‌কে সেটা
শুধুই করিস্ ভান,
কিল ঘুসিটা নইলে বুঝি
হবে না তোর জ্ঞান।
চাবুক পিটে হাতে পীঠে
ভেঙ্গে দেব হাড়,
যেন এমন বুদ্ধি কখন
হয় না কভু আর॥

গৃহশিক্ষা।

(২)

পর দিন মালতী স্কুলের ছুটীর পর আর দেরী না করিয়া বাড়ী আসিল। তাহার মাতা বাড়ীতে একাকী ছিলেন। পিতা তাহার দাদা বিনয়কে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছেন। মালতী খাইয়া মাতার নিকট যাইয়া বসিল। মাতা তখন সকল গৃহকর্ম্ম সারিয়া তাহার পিতার জন্য জামা সেলাই করিতেছিলেন। মালতী স্কুলে সেদিন কি হইয়াছিল গল্প করিতে লাগিল। সে মাতাকে আপনার সেলাই করিতে করিতে বলিল "মা, কাল রাত্রিতে তুমি যে যে কথা বলেছিলে তাহার সকল কথা আমি বুঝ্‌তে পারি নাই।"

"কোন্ কথাটা বোঝ নাই?"

"তুমি বলেছিলে যে আমি ভীরু; যে একটু আঘাত পেলে কিম্বা ভয় পেলে চাৎকার করে উঠে সে ভীরু। সুশীলা যখন একটা চামচিকা দেখে ভয়ে চীৎকার করেছিল, দাদা তা' শুনে তাকে ভীরু বলেছিলেন।"

"জান মালতী, যে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে সেইই ভীরু। সুশীলা যে সামান্য একটা চামচিকা দেখে এত ভয় পায়, এতে এই বোঝা গেল যে সে নিজের প্রবৃত্তি দমন কর্‌তে পারেনা।"

"মা! তুমি কি সব বল্‌ছ আরো বুঝতে পার্‌ছিনা।"

"আচ্ছা, সহজ ভাষায় বলি। প্রথমে সুশীলার কথা মনে কর তুমি জান যে চামচিকা ওর কিছুই কর্‌তে পারেনা, আর যত শীঘ্র পারে সে মানুষের কাছ থেকে দূরে পালাতে পার্‌লেই বাঁচে। আর যদিই বা চামচিকা কামড়াবে বলে সুশীলা ভয় পেয়েছিল তবু তার সাহসী হওয়া উচিত ছিল।"

"হাঁ আমি তা বুঝেছি, কিন্তু তুমি কি একটা নূতন কথা বল্‌লে বুঝ্‌লাম না।"

"ও; প্রবৃত্তি দমনের কথা।"

"হাঁ ওটাই বুঝি নাই।"

"আচ্ছা যদি তুমি গাড়ীতে চড়ে কখন বেড়াতে যাও পেয়ে গাড়ীর মধ্য হইতে লাফাইয়া পড়িতে চাও তবে কি হবে বলত!"

"ঘোড়াটা আমাকে ফেলে গাড়ী শুদ্ধ দৌড়িয়ে চলে যাবে।"

"হাঁ, তা হলে তুমি ঘোড়া চালাতে পারবেনা, তাকে দমনে রাখ্‌তে পার্‌বেনা আর তুমি তার কাছে পরাজিত হবে। সুশীলার ও সেই দশা হয়েছিল। তাহার ভয় ঠিক ঘোড়ার মত, সে তাকে বশে রাখ্‌তে পার্‌লনা।"

"হাঁ, এখন আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম। আরও কিছু বল।"

"আমাদের মনে যে সকল প্রবৃত্তি প্রবল হয় সেগুলিকে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। যদি আমরা তাহাদের বশীভূত করিতে না পারি তবে তাহারা দৌড়িয়া ইচ্ছামত যেদিকে পারে সেইদিকে চলিয়া যায় তখন আমরা আত্মদমন করিতে পারি না।"

"আমি তাহা বুঝিলাম। মা, এইরূপ কতকগুলি প্রবৃত্তির নাম বলনা?"

"তুমি নিজেই বলনা?"

"আমি শুধু একটার কথা জানি—ভয় একটা; আর কি হইতে পারে?"

"তুমি ও তোমার দাদা একটা জিনিষ লইতে চাও আর তুমি যদি সেটা কাড়িয়া লইয়া নিজে সেটা উপভোগ কর, তাহাকে কি বলিবে?"

"ওঃ তাহা আমার ভয়ানক স্বার্থপরতা হবে; দাদাকে আমি এত ভালবাসি, তাহার সঙ্গে ওরূপ ব্যবহার করিতে পারিনা। কিন্তু আমাদের পাশের বাড়ীর সতীশকে অবশ্য সে জিনিষটা দিতে পারিব না, তাহাকে আমার একটু ভাল লাগেনা, সে আমার চেয়ে কত ছোট, কিন্তু সে আমার সঙ্গে এমন মন্দ ব্যবহার করে।"

"কিন্তু তোমার ব্যবহারটা ত নিঃস্বার্থ হইল না। যদি তুমি সতীশের সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার কর তবে তুমি ও লাগাম ছাড়িয়া দিয়া ঘোড়াকে দৌড়াইতে দিবে। সতীশকে তোমার ভাললাগে না বলিয়া তোমার মন্দ

"তাইত, যদি আমি ঘোড়াকে দৌড়াইতে দিই তবে গাড়ীতে যদি কোন ভাল কি মন্দ ছেলে থাকে তাহাতে আসে যায় না, তাহাকে ত বিপদে ফেলা হয় ?"

"হাঁ, ঠিক্ কথা। দেখ যাঁহারা মহৎ লোক, তাঁহারা ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সকলের সঙ্গে সমান ভাল ব্যবহার করেন। তাঁহাদের সুমিষ্ট ও দয়াপূর্ণ ব্যবহারে মন্দ লোকেরও মন পরিবর্ত্তিত হয়। সাধুদের কথা ভাবিয়া দেখ।"

"হাঁ, ডাক্তারগণ যেমন রোগীদের রোগ সারান, তেমনি জগতের সাধুগণ মন্দ লোকদিগের প্রাণে পবিত্র ভাব আনিয়া দেন, একথাটা সেদিন তুমিইত আমাকে বলেছিলে।"

"এখন বুঝিতে পারছ যে যদি কেহ কিছু চায়, সে ভালই হউক কি মন্দই হউক, তাহা তাহাকে না দিয়া যদি নিজের জন্য রাখ, তবে তোমার স্বার্থপরতা হইবে।"

"হাঁ, কিন্তু—

"কিন্তু আবার কেন ?"

"যদি বাবা কিম্বা দাদা কোন জিনিষ চান তবে তাহা দিতে আনন্দই হয় ; কিন্তু সতীশ কিম্বা যাহাদের আমার ভাল লাগেনা, তাহাদের কিছু দেওয়া কঠিন।"

"যদি ও ইচ্ছা হয়না কিন্তু যদি কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাহাদিগকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত না করি, তবে তাহা না দেওয়ার চেয়ে ভাল।"

"তাহাদের দেওয়াই কি ভাল ? আর তাহাতে কি লোককে সুখী করে ?"

"সব সময়েই যে তারা সুখী হয় এমন নয় ; কিন্তু নিঃস্বার্থ হওয়াই খুব ভাল। যাঁরা ভাললোক তাঁরা যাদের একটুও ভাল লাগেনা, তাদেরও দেওয়া উচিত মনে করে দেন। তাঁরা ঈশ্বর ও মঙ্গল কাজকে ভাল বাসেন বলিয়া পরের মঙ্গলের জন্য নিজের সুখ বিসর্জ্জন করেন। এই কাজ করার পর তাঁরা মনে শান্তি পান। এই পরম লাভ।"

"মা, যদি সে কাজ করে সুখ পাওয়া না যায় তবে 'শান্তি লাভ করা যায়, তার অর্থ কি ?"

"আমি তোমায় একটা গল্প বলি তা হ'লে বুঝ্‌তে পারবে। একখানি জাহাজে অনেক নাবিক ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে দুই জন অত্যন্ত রাগী ছিল, তাহাদের মধ্যে একটুও সদ্ভাব ছিল না। সর্ব্বদা তাহারা বিবাদ করিত। দু'জনের মধ্যে রমজান অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার কর্‌ত। একদিন রমজান করিমকে অপমান করিল ও বিবাদ আরম্ভ হইলে পরে হাতাহাতি হইল। যখন ব্যাপার এতদূর পৌঁছিয়াছে, তখন কাপ্তেন আসিয়া তাহাদের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। রাত্রিতে তাহারা শুইতে গিয়া ভাবিল তাদের মধ্যে আর কোন দিন সদ্ভাব হইবে না। করিমের স্ত্রী ও চারিটি সন্তান বাড়ীতে ছিল ও রমজানের বৃদ্ধামাতা ও একটী বোন ও একটী খঞ্জ ভাই ছিল। অনেকদিন পর্য্যন্ত কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলিল না, যখন কাজের সময়ে বাধ্য হইয়া একত্র কাজ করিতে হইত, তখনও দু'জনে নীরবে কার্য্য সম্পাদন করিত। একদিন প্রবল ঝড় উঠিল, জাহাজ অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিল, জাহাজের মাস্তুল কাটিয়া ফেলিতে হইল এবং কেহ কেহ সেই ভীষণ সময়ে জলে পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারাইল। পর্ব্বত সমান ঢেউ জাহাজের ডেকের উপর আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল যে কয়টী ছোট নৌকা ছিল সে গুলি ভাঙ্গিয়া গেল আর কয়েকটা জলে ভাসিয়া গেল। অবশেষে এমন বিপদের উপর আরও বিপদ উপস্থিত হইল। জাহাজ একটা পাহাড়ে ঠেকিয়া গেল আর জল উঠিতে লাগিল। কাপ্তেন তখন সকলকে আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে বলিলেন, তবে একটা সুবিধা এই ছিল যে নিকটেই তীর দেখা যাইতেছিল। কতকগুলি লাইফবেল্ট ছিল, যে ইহার একটাও পাবেনা তাহার আর এমন ভীষণ সমুদ্র পার হইয়া বাঁচিবার আশা নাই। কয়েকজন লাইফবেল্ট পাইল আর কয়েকজন পাইলনা। তাহারা আর কোন উপায় না দেখিয়া মজ্জমান জাহাজ হইতে অন্ধকারে ভীষণ সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িল। ক্রমে সকলেই

দাঁড়াইয়া জলের নৃত্য দেখিতে দেখিতে মৃত্যুর কথা ভাবিতেছিল সে একটাও জীবন রক্ষক কোমর বন্ধ পায় নাই। এমন সময় করিম দৌড়িয়া উপরে আসিল। সে একটী মাত্র পুরাণ লাইফবেল্ট পাইয়াছিল। সে যখন অন্ধকারে উপরে আসিল তখন দেখিল, একজন লোক রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে: সে বলিল "কই, তোমরা সবাই যাও নাই, আমি ভেবেছিলাম আমিই শুধু একলা আছি।" তখন রমজান বলিল "না, শুধু তুমি আর আমি আছি।" সে এমন কাতর কণ্ঠে একথা বলিল, যে করিমের প্রাণ তাহার জন্য ব্যথিত হইল। আর সে মনে করিল রমজান জানেনা আমার কাছে লাইফবেল্টটা আছে, তবে আমি নিজের প্রাণ বাঁচাই না কেন? কিন্তু তাহার মনে কোথা হইতে স্বর্গীয় ভাব আসিল; আত্ম সুখ ত্যাগে যে কি সুখ, তাহা মনে করিয়া তাহার মুখ অপূর্ব্ব আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে পশ্চাৎ হইতে তাহার শত্রুর গলায় লাইফবেল্টটী দিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। রমজান অতিকষ্টে বড় বড় ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে অবশেষে তীরে পৌঁছিল। কিছুক্ষণ পরেই করিমের মৃতদেহ তীরে গিয়া ঠেকিল। রমজানের ইহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ ও অনুতাপ হইল; কিন্তু তাহার প্রতীকার আর এ লোকে হইবেনা। সে বাড়ী ফিরিয়া গেল, তাহার বৃদ্ধা মাতা ও ছোট বোন ও খঞ্জ ভাই তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। কিন্তু সে করিমের শান্ত ভাবে পূর্ণ মুখখানি ভুলিতে পারিলনা।"

মালতীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল, সে বলিয়া উঠিল "আহা।"

"দেখ মালতী, যদি করিম তাহার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের কাছে ফিরে যেতে পারত ত কত সুখী হত। কিন্তু সে যদি অন্যকে বিপদ থেকে উদ্ধার না করে বাড়ী যাইত তবে মনে শান্তি পাইত না। এখন দুয়ে কি পার্থক্য তা বুঝ্‌তে পারছ?"

"হাঁ, এখন বুঝেছি।"

"এক সময়ে পুরুষ স্ত্রীলোক এমনকি বালক বালিকাকেও ধর্ম্মের জন্য কারাগারে যাইতে হইয়াছে; অগ্নিতে তাঁহাদের দেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছে, কিন্তু এমন বিপদেও তাহারা ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া সব ক্লেশ সহাস্য বদনে সহ্য করিয়াছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের গৃহে সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা সত্যের উপাসক, মিথ্যা কথা বলিয়া তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী সুখ ভোগ করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন, একটী মিথ্যা কথা বলিলে বিপদ থেকে উদ্ধার পাইবেন কিন্তু মনে পরম শান্তি পাইবার জন্য অসহ্য ক্লেশ ও স্থিরচিত্তে সহ্য করিয়া ছিলেন।"

"মা, কি করে এমন কষ্ট সহ্য করিলেন! আমি শুনেছি যে তাঁহারা ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে আগুণে প্রবেশ করিলেন, আর যখন আগুনে দেহ পুড়িয়া যাইতে লাগিল, তখন একটু কাতর ধ্বনিও শুনা গেল না। আমি ত কখনও পারিতাম না, একটা আঙ্গুলই আগুনের মধ্যে দিতে পারি না সমস্ত শরীরত দূরের কথা। আমার একটুও সৎসাহস নাই।"

"তুমি যে সত্য কথা বল্‌তে ভয় পেয়েছিলে সেজন্য আমি তোমায় ভীরু বলেছিলাম, কাহাকে আমি ভীরু বলেছি মনে আছে ত?"

"যাহাদের প্রাণে ভয়ই কর্ত্তৃত্ব করে, তারাই ভীরু। এখন আমি বুঝিলাম আমি কি কি দোষ করেছি। ভবিষ্যতে আর কখন এরূপ করিব না। কখন কিছু গোপনে রাখিব না।"

"এখন রাত্রি হইয়াছে শুইতে যাও। আজ অনেক কথা হইয়াছে।"

শ্রীবাসন্তী মিত্র।

ব্যাঙ।

আমরা প্রত্যহ চতুর্দ্দিকে কত ছোট ছোট জীব জন্তু দেখি, কিন্তু কেহই তাহাদের বিষয় আলোচনা করি না। এই প্রবন্ধে ব্যাঙের সম্বন্ধে কিছু বলিব।

পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই ব্যাঙ্‌ দৃষ্ট হয়।

তন্মধ্যে ভারতবর্ষ, সিংহল, চীন, ব্রহ্মদেশ, আমেরিকা ও ইউরোপে যত অধিক দৃষ্ট হয়, এত আর কোথাও নয়।

ফাল্গুন চৈত্রমাসে ব্যাঙ খালে বিলে ডিম পাড়ে, এই ডিম হইতে ব্যাঙাচি হয়। যখন ব্যাঙাচির লেজ খসিয়া যায়, তখন উহা স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়। এক একটী ব্যাঙ ১৪টী পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে।

প্রাণিবিদ্‌গণ ব্যাঙকে তিনটী স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ জলবিহারী ব্যাঙ; ইহাদের আকার আমাদের দেশের সোনা ব্যাঙের ন্যায়। ইহাদের মুখ ছুঁচাল, চক্ষুদ্বয় করোটীর পার্শ্ব দেশে উচ্চভাবে সংস্থিত। কটিদেশের সন্ধি হইতে পশ্চাৎ পদতল পর্য্যন্ত ৪টী সন্ধিস্থান আছে। সম্মুখের পদদ্বয় দেখিতে বেশ সুন্দর, ইহাতে মনুষ্যের হস্তের ন্যায় তিনটী সন্ধি স্থান আছে। সম্মুখের পদে ৪টী ও পশ্চাতের পদে ৫টী অঙ্গুলি আছে। কিন্তু পশ্চাতের অঙ্গুলিগুলির একটু বিশেষত্ব আছে, এই অঙ্গুলি গুলি হংসের ন্যায় চর্ম্ম পটহ দ্বারা জোড়া, এই কারণেই ইহারা জলে খুব সাঁতার দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ গেছো ব্যাঙ; এই ব্যাঙগুলি স্বভাবতঃ কৃশকায় এবং ইহাদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে গোলাকার মাংস পিণ্ড আছে। আমাদের দেশের গেছো ব্যাঙ্ গুলির আকার ছোট, বর্ণ সাদা; ইহাদিগকে দালানের ছাদে, ঘরের বেড়ায় ও গাছের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ কোলা-ব্যাঙ, ইহারা আকারে অন্যান্য ব্যাঙ্ অপেক্ষা খুব বড়, ইহাদের মুখ প্রশস্ত। ইহাদিগকে বর্ষাকালে পথে ঘাটে দেখিতে পাওয়া যায়া যায়। কোলাব্যাঙের শব্দ বড়ই কঠোর। বর্ষাকালে মেঘাবৃত রাত্রিতে যখন কোলাব্যাঙ্ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করে, তখন সেই গভীর শব্দ মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভীতি উৎপাদন করে।

ব্যাঙের নিম্ন চোয়ালে দাঁত নাই। আমেরিকায় একজাতীয় ব্যাঙ আছে, তাহাদের হনু অস্থিগুলি খুব সমুন্নত, তাহা দ্বারাই তাদের দাঁতের কাজ সম্পন্ন হয়। ব্যাঙের জিহ্বার ও একটু বিশেষত্ব আছে। অপর প্রাণীর জিহ্বার অগ্রভাগ মুক্ত, মূলদেশ গলনালীর সঙ্গে যুক্ত; ব্যাঙের ঠিক উল্টা, ইহাদের জিহ্বার অগ্রভাগ যুক্ত, মূলদেশ আল্‌গা। ব্যাঙ কীট ধরিবার সময় জিহ্বার মূলদেশ উল্টাইয়া বাহিরে আনে, এবং তদ্দ্বারা পোকাটিকে জড়াইয়া ধরিয়া মুখের মধ্যে লয়।

ব্যাঙ্ বড়ই নিরীহ প্রাণী। ইহারা কীট পতঙ্গ খাইয়া জীবন ধারণ করে। শীতকালে ব্যাঙ্ গর্ত্তমধ্যে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যায়, এই সময় ইহারা কিছু খায় না।

ব্যাঙের শীকার প্রণালী বড়ই চমৎকার। শীকার ধরিবার সময় ইহাদের জিহ্বার কাজটা খুব বেশী হয়। ইহাদের জিহ্বাতে এক প্রকার আটা আছে, ঐ আটাতে কীট পতঙ্গ একবার সংলগ্ন হইলে তাহার আর পলাইয়া যাইবার উপায় থাকে না।

ব্যাঙের দৃষ্টিশক্তি অতি প্রবল। তাই মেঘাবৃত গম্ভীর নিশিতেও ইহারা অনায়াসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি ধরিয়া খাইতে পারে।

শীততাপ সহিষ্ণুতা গুণে ব্যাঙ্ জগতের সকল জীবকে পরাস্ত করিয়াছে। ১০৪ ডিগ্রি গরম জলে কিংবা গরম বায়ুতে ইহাদিগকে রাখিলে, ইহারা দুই মিনিট কাল পর্য্যন্ত নিরাপদে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

ব্যাঙের শরীরে এক প্রকার বিষ আছে, এই বিষ গরল নামে অভিহিত। এই বিষ ব্যাঙের সমগ্র গাত্র-চর্ম্ম, মস্তক, স্কন্ধ, ও পদচতুষ্টয়ে এবং শরীরাংশের কোষ বিশেষে বিদ্যমান আছে। ব্যাঙের গরল সম্বন্ধে আমাদের অনেক প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। প্রায় খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪ শতাব্দী হইতে ভারতবাসী এই গরলের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। তন্ত্রে লিখিত আছে সোণা ব্যাঙের বসা সর্ব্বগাত্রে ভালরূপে মর্দ্দন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলে শরীরে একটুও অগ্নির উত্তাপ লাগেনা। শুনা যায়, কেহ কেহ এই ক্রিয়ার পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সুসভ্য জাতি মাত্রই ব্যাঙের মাংস ভক্ষণ করেন। ফরাসী দেশে ব্যাঙের মাংসের বড়ই আদর। সেই দেশে

বড় বড় ভোজে ব্যাঙের মাংস না হইলে নিমন্ত্রণ চলে না। ব্রহ্মবাসী, চীনবাসী, ও ভারতের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও ব্যাঙের মাংস খায়। দক্ষিণ ভারতে ইউরোপাগত খৃষ্ট রমণীরা প্রতি শুক্রবারে ব্যাঙের মাংস ব্যবহার করেন।

চীনদেশে ব্যাঙ ধরিবার জন্য একদল লোক আছে, তাহারা বড়শীতে ফড়িং গাঁথিয়া কোলা ব্যাঙ ধরে এবং সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তাহারা মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ক্রমে ছাল তুলিয়া ফেলে। ইহারা ব্যঙের বিষ চিনে, ছাল তুলিবার পর, তাহারা সেই গরল মাংস হইতে পৃথক্ করিয়া লয়। এই মাংস বাজারে ওজন করিষা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করে। বড় বড় পক্ষী ও সাপ মানুষের ন্যায় ব্যাঙের প্রবল শত্রু।

ব্যাঙ যখন লাফ দেয়, তখন তাহার শরীর হইতে এক প্রকার জল বাহির হয়, ইহা তাহাদের শরীরের সঞ্চিত জলরাশি। লাফ দিবার সময় যখন দেহ সঙ্কুচিত হয়, তখন এই জল তাহাদের শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বাহির হয়। ব্যাঙকে চাপা দিলে, শোষকের ন্যায় সকল জল তাহার শরীর হইতে বাহির হয়।

পদার্থ বিদ্‌গণ ব্যাঙের শরীরে তাড়িত শক্তি সঞ্চালন ক্ষমতা সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন।

১৮২৫খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বক্‌ল্যাণ্ড কয়েকটী ব্যাঙ কোন পাত্রে অবরুদ্ধ করিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ১৩মাস কাল রুদ্ধ বায়ুতে এবং অনাহারে মাটীর নীচে থাকিয়াও ব্যাঙগুলি জীবিত ছিল এমন কি ঐ অবস্থাতে তাহাদের দৈহিক উন্নতি ও অনেক হইয়াছিল।

অনেকে ব্যাঙ পুষিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন বৃষ্টির পূর্ব্বে ব্যাঙ বৃষ্টি হইবার সংবাদ চীৎকার করিয়া সকলকে জানাইয়া দেয়।

শ্রীবিলাসমোহন চক্রবর্ত্তী

পাঁশকুড়ানী। *

পাঁশকুড়ানী একটি ছোট্ট মেয়ে, রান্না ঘরের ছাই ফেলে ব'লে তাকে "পাঁশ কুড়ানী' ব'লে ডাকে। পাঁশকুড়ানীর দুই সৎ বোন আছে, তারা তাকে বড় কষ্ট দেয়। নিজেরা কত ভাল খাবার খায়, আর তাকে খেতে দেয় ভাতের ফেন। নিজেরা কত ভাল ভাল কাপড় পরে; তাকে পরিয়ে রাখে ছেঁড়া কাপড়। তাকে দিয়ে বাড়ীর সব কাজ করায়, রান্না ঘরের ছাই ফেলায়, আর রাত্রে শুতে দেয় কয়লার উপরে। তাই পাঁশকুড়ানীর ছেঁড়া কাপড় খানি সব সময়ই ময়লা থাকে। সে কিন্তু বড় লক্ষ্মী মেয়ে, কখনও কারোর সঙ্গে ঝগড়া করে না। একবার সে দেশের রাজার বাড়ী মস্ত ভোজ হ'ল। তিন দিন ধরে রাজা দেশের সব বড় বড় লোকেদের খাওয়া-বেন, তাদের নিয়ে আমোদ কর্‌বেন। পাঁশকুড়ানীর বোনেরা সেই ভোজে যাবে। সকাল থেকে তারা শুধু ভাব্‌ছে কোন শাড়ী খানা পর্‌বে, কি কি গহনা পর্‌বে, কেমন করে চুল বাঁধ্‌বে, এই সব। বিকাল হ'তে সাজ গোজ কর্‌বার ধুম পড়ে গেল।

তাই দেখে পাঁশকুড়ানী এসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তোমরা কোথায় যাবে?" বোনেরা বল্‌ল, "জানিস্ না, রাজার বাড়ী নেমন্তন্ন!" শুনে পাঁশকুড়ানী বল্‌ল, "আমাকে নিয়ে যাবে না?" বোনেরা মুখ শিঁটকিয়ে বল্‌ল, "তুই যাবি কি করতে? তোর না আছে ভাল কাপড়, না আছে চল্‌বার ফিরবার ছিরি! সেখানে গেলে যে তোকে দেখে লোকে হাস্‌বে।"

ভাল কাপড় চোপড় পরে, ভাল গাড়ীতে চড়ে, বাড়ীর সকলে নেমন্তন্ন খেতে গেল, পাঁশ কুড়ানী বেচারী একলা একলা রান্না ঘরে বসে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। এমন সময় সে শুন্‌তে পেল, কে যেন তাকে ডাক্‌ছে "তুমি কে গো, কাঁদ্‌ছ কেন গো?" চেয়ে দেখে একটি ছোট্ট পরী, তার রূপলী ডানা দুটি মেলে, হাতে সোণার লাঠি নিয়ে তার কাছে এসেছে। পরী আবার জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কাঁদ্‌ছ কেন বাছা?" তখন পাঁশকুড়ানী বল্‌ল, "আমাকে ওরা খালি 'দুর দুর' করে, ভাল ক'রে খেতে পরতে দেয় না, আমার নমন্তন্নে যেতে বড় ইচ্ছো কর্‌ছিল, তবু আমাকে নিয়ে যায় নি;—তাই আমি কাঁদ্‌ছি।"

* [illegible]

খুসী হয়েছি। আচ্ছা, এক কাজ করত। বাগান থেকে একটা কুমড়ো নিয়ে এস।" পাঁশকুড়ানী তখনি ছুটে গিয়ে বাগান থেকে একটা কুমড়ো নিয়ে এলো। সেই কুমড়োটাকে পরী তার লাঠি দিয়ে ছুঁয়ে দিতেই কুমড়োটা চমৎকার একখানা গাড়ী হয়ে গেল পরী বল্‌ল, "গাড়ী হয়েছে এখন ঘোড়া চাই। দুটো ইঁদুর ধরে আন্‌তে পার ?"

পাঁশকুড়ানী জান্‌ত, কোথায় সেই অন্ধকার ঘরে হাঁড়ির পিছনে মেলাই ইঁদুর থাকে। সেইখান থেকে সে ছয়টা বড় বড় ইঁদুর ধরে নিয়ে এল। সেই ইঁদুর গুলোকে পরী তার লাঠি দিয়ে ছোঁয়া মাত্রই তারা ঝক্‌ঝকে সাজ পরা এই বড় বড় ছ'টা ঘোড়া হয়ে তড়াক্ তড়াক্ করে লাফাতে লাগ্‌ল।

তা দেখে পরী হেসে বল্ল, "গাড়ী হয়েছে, ঘোড়া হয়েছে, এখন সহিস্ কোচয়ান হলেই হয়। আচ্ছা, দুটো টিকটিকি ধরে আন।"

পাঁশকুড়ানী দুটো টিকটিকি খুঁজে আন্‌ল। সে দুটোকে যেই পরী তার লাঠি দিয়ে ছুঁয়েছে, অমনি তার একটা সহিস্ আর একটা কোচয়ান হয়ে গিয়েছে। তারা দুজন উঠেই অমনি ঘোড়া ছয়টাকে গাড়ীতে জুতে ফেলেছে।

এ সব দেখে শুনে ত পাঁশকুড়ানীর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না, সে এমনি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছে! সব কাজ শেষ করে পরী তাকে বল্‌ল, এইবার তুমি এই গাড়ী চড়ে রাজার বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে যাও।" সে বল্‌ল, "কিন্তু আমার এই ময়লা কাপড় নিয়ে কি করে যাব ?" পরী তখন সোণার লাঠি দিয়ে তার কাপড় ছুঁয়ে দিল, আর সেই ছেঁড়া ময়লা কাপড় দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঝকঝকে রেশমী কাপড় হয়ে গেল; পাঁশকুড়ানীর গা ভ'রে হীরা মতির গহনা হ'ল, আর তার পায়ে চমৎকার মাণিকের মল হ'ল। তখন সেই ছয় ঘোড়ার গড়ীতে চ'ড়ে পাঁশকুড়ানী নেমন্তন্ন খেতে গেল। যাবার সময় পরী তারে ব'লে দিল, "দেখো সাবধান! রাত বারোটার বেশী ওখানে থেকোনা। রাত বারোটা বাজতেই কিন্তু এই সব কাপড় গহনা, গাড়ী ঘোড়া সব চলে যাবে, আর তোমার ছেঁড়া কাপড় ফিরে আসবে।"

পাঁশকুড়ানী যখন রাজার বাড়ীতে গেল তখন তাকে দেখে সকলে ভাব্‌ল, "ছয় ঘোড়ার গাড়ী চড়ে না জানি এ কোন রাজার মেয়ে এসেছে! কি সুন্দর পোষাক, আর কি সুন্দর দেখতে! আর গাড়ী ঘোড়াই বা কি সুন্দর!" সত্যি সত্যিই পাঁশকুড়ানীকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে তার সৎ বোনেরাও তাকে দেখে চিন্‌তে পারেনি। রাজার ছেলে ভাব্‌লেন, এমন চমৎকার মেয়ে কখন দেখিনি। যতক্ষণ পাঁশকুড়ানী সেখানে রইল, ততক্ষণ তিনি কেবল তার সঙ্গেই গল্প করলেন।

বারটা বাজতেই পাঁশকুড়ানী তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বাড়ী চলে এল। তখন তার গাড়ী ঘোড়াও নেই, সে পোষাক ও নেই। যে ছেঁড়া কাপড় সেই ছেঁড়া কাপড়।

তারপর সৎ বোনেরা রাজবাড়ী থেকে ফিরে এসে তার কাছে কত গল্পই কর্‌ল! তারা বল্ল "আমরা কেমন রাজার বাড়ী নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম। তুই যেতে পার্‌লি না। সে কি চমৎকার বাড়ী, কত লোকজন! আর, এক রাজার মেয়ে যে এসেছিল, তেমন কেউ দেখেনি! তার ছয় ঘোড়ার গাড়ী, কি চমৎকার পোষাক, কি চমৎকার দেখতে!" শুনে পাঁশ কুড়ানী বুঝ্‌তে পারল, যে তারা তার কথাই বল্‌ছে। সে মনে মনে খুব খুসী হল কিন্তু কিছু বল্ল না।

পরদিন আবার তারা পোষাক প'রে, গাড়ী চড়ে নেমন্তন্ন খেতে গেল, পাঁশকুড়ানীকে নিয়ে গেল না। সে দিনও আবার সেই পরী এসে তাকে গাড়ী ঘোড়া কাপড় চোপড় দিয়ে রাজার বাড়ী পাঠিয়ে দিল। সেদিনকার পোষাক আগের দিনের চেয়েও সুন্দর। শাড়ীখানা রূপোলী, আর গহনা আরো ঢের দামী, আর পায়ে সেই চমৎকার মাণিকের মল। রাজার বাড়ীর সকলে তাকে দেখে অবাক্! রাজার ছেলে আর কারোর দিকে চেয়েও দেখলেন না, কেবল তারই সঙ্গে গল্প কর্‌লেন। কিন্তু যেই বারোটা বাজল অমনি সে যে কোথায় চলে গেল কেউ দেখতে পেল না। পাঁশকুড়ানী

ততক্ষণে বাড়ী এসে, তার ছেঁড়া কাপড় পরে বসে আছে।

সে দিন ও তার সৎবোনেরা বাড়ী এসে খুবই গল্প করল, "আজকে যে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল কি বলব! তার শাড়ীখানার আগা গোড়াই রূপোলী, ঝক্‌ঝক্ করছে; আর তার পা দুখানি কি সুন্দর, এমন ছোট্ট পা কখনো দেখিনি।"

তার পরদিন আবার নেমন্তন্ন। সে দিন শেষ দিন। যার যত ভাল কাপড়, গহনা আছে, বেছে বেছে প'রেছে। সে দিনও পাঁশকুড়ানীর সৎবোনেরা সেজে গুজে গাড়ী চড়ে রাজবাড়ী গেল, পাঁশকুড়ানীকে নিয়ে গেল না।

কিন্তু সেই পরী তাকে ভোলেনি। সকলে চলে যেতেই পরী আবার এসে দেখা দিল। পাঁশকুড়ানীর আজকের পোষাক যার পর নাই আশ্চর্য্য! সোণার শাড়ী, তাতে মণি মুক্তার কাজ; গায়ের গহনা, মাথার মুকুট, এমনি চমৎকার যে দেখলে মনে হয় যেন জ্বলছে।

আজ তাকে দেখে সকলে ভাবল, "এ কে? মানুষ, না পরী?" রাজা রাণী ভাবলেন, "এমন সুন্দর মেয়েকে আমাদের বৌ করলে তবে ঠিক হয়।" রাজার ছেলে ভাবলেন, আমি একে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।" আজকে শেষ দিন, সকলে খুব আমোদ করছে। পাঁশকুড়ানী ও সকলের সঙ্গে গল্প করছে, হাসছে. কত রাত হয়েছে, তা তার খেয়ালই নেই। হঠাৎ ঘড়ীতে টং টং ক'রে বারটা বেজে উঠল! তখন তার মনে হল, 'ঐ যা, কি করলাম! পরী ত আমাকে বারটার বেশী এখানে থাকতে মানা করেছে!" অমনি কাউকে কিছু না বলে কারোর কথা না শুনে সে একেবারে দৌড়ে বাইরে এল। রাজার ছেলেও তার পিছু পিছু ছুটে বাইরে এলেন, কিন্তু সে যে কোন দিকে পালিয়ে গেল কিছু বুঝতে পারলেন না, কেবল দেখলেন সিঁড়ীর উপর এক গাছি ছোট্ট মল প'ড়ে আছে। পাঁশকুড়ানী দৌড়ে যাবার সময় কেমন করে তার পা থেকে সেই মল খুলে পড়ে গিয়েছিল। রাজার ছেলে মল গাছি তুলে নিলেন, দেখলেন তা'তে আশ্চর্য্য কাজ করা, সে রকম কাজ সে দেশের কোন সেঁক্‌রা করতে পারে না।

রাজার বাড়ীর দরজা পার হতে না হতেই পাঁশকুড়ানীর সে সোণার পোষাক, ছেঁড়া ময়লা কাপড় হয়ে গেল। দরজায় এসে দেখে তার গাড়ীও নেই ঘোড়াও নেই, কিছুই নেই। কাজেই তাকে হেঁটে বাড়ী যেতে হ'ল।

রাজার ছেলে সব পাহারাওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এখান দিয়ে কোন রাজার মেয়ে গিয়েছেন? তোমরা কাউকে বাইরে যেতে দেখেছ?" তারা বলল, "না, কাউকে ত দেখিনি। কেবল এক ভিখিরী মেয়ে যাচ্ছিল; আমরা তাকে ধরতে গেলাম, সে ছুটে পালিয়ে গেল।"

রাজার ছেলে জেদ্ করে বসলেন, সেই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবেন না। কিন্তু সে মেয়েত পালিয়েছে, এখন তাকে পাবেন কোথায়? সে কার মেয়ে, তার বাড়ী কোনখানে তা কেউ বলতে পারে না। এখন উপায়? তখন, যে মল কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, সেই মলের কথা হটাৎ তাঁর মনে হ'ল। তিনি বললেন, "এই মল যার পায় হবে, তাকেই আমি বিয়ে করব। এত ছোট মল কখনো যে সে মেয়ের পায় হবে না।"

তখন রাজার লোক মল নিয়ে সকলের বাড়ী বাড়ী ফিরতে লাগল। এমন মেয়ে কার বাড়ীতে আছে, সেই মল যার পায় ঢোকে? যার বাড়ীতেই মেয়ে আছে, সে মেয়ের এসে মল পরতে কতই না চেষ্টা করল। কিন্তু সে মল কারোর পায়ে ঢুকল না। ঘুরে ঘুরে রাজার লোক পাঁশকুড়ানীদের বাড়ী এল। পাঁশকুড়ানীর সৎবোনেরা সেই মল নিয়ে কত টানাটানি করল, তাদের মোটা মোটা পা ফেটে রক্ত পড়তে লাগল, কিন্তু কিছুতেই মল ঢুকল না। পাঁশকুড়ানী তামাসা দেখবার জন্য সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজার লোকেরা তাকে বলল, "তুমি একেবার পরে দেখত। তোমার পা খুব ছোট

দেখাচ্ছে।" অমনি পাঁশকুড়ানীর সৎ বোনেরা ব্যস্ত হয়ে দুজনে একসঙ্গে বলে উঠ্‌ল, "ওর পায়ে কথ্‌খন হবে না। ও সেদিন যায় ও নি। আর ও যে পাঁশকুড়ানী!" রাজার লোক বল্‌ল, "রাজার হুকুম, সকলের পায়ে দিয়ে দেখাবে!" তখন পাঁশকুড়ানী আস্তে আস্তে মলখানি নিয়ে যেই পায়ে দিল, অমনি ফস্ ক'রে মল ঢুকে গেল তারপর সেই পরী এসে আরেক গাছা মল পাঁশকুড়ানীর অন্য পায়ে পরিয়ে দিল, আর সোণার লাঠি ছুঁইয়ে তার সোণার কাপড়, হীরের গহনা করে দিল।

রাজার লোকেরা হাস্‌তে হাস্‌তে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছুটে গিয়ে রাজ বাড়ীতে খবর দিল। সেই খবর শুনে ত রাজার ছেলের আর সুখের সীমাই রইল না।

তারপর রাজার ছেলের সঙ্গে পাঁশকুড়ানীর বিয়ে হ'ল। আর তাতে কি ধুমধামটাই হ'ল। পাঁশকুড়ানীর সৎ বোনেরা খুব সাজগোজ করে সেই বিয়ে দেখ্‌তে গেল, আর পেট ভরে নেমন্তন্ন খেল।

তারপর আর কেউ তাকে পাঁশকুড়ানী' বলে ডাকৃত না।

নূতন ধাঁধার উত্তর।

১। সেই ব্রাহ্মণ ১৫টী ফুল আনিয়াছিল এবং ১৬টী ফুল দ্বারা পূজা করিয়াছিল।

২। দিন গেল সন্ধ্যা হল ফুরাইল বেলা,
আইল যামিনী মরি প্রদীপ মেখলা।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন।

শ্রীঅমৃতলাল দে, সচ্চিদানন্দ দত্ত, শ্রীনলিনকুমার বসু শ্রীসুখময় গুহ, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীশশাঙ্কশঙ্কর রায়, শ্রীঅন্নদাচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীতুষাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ-সুহাসিন সিংহ, শ্রীবিমলচন্দ্র দাসগুপ্ত শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুহ, শ্রীমিহিরনাথ রায়, শ্রীমতী স্নেহলতা সরকার

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,—

শ্রীঅমিয়কান্তি চৌধুরী, শ্রীবিমলচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীকমলাভূষণ ঠাকুর, শ্রীসরোজকুমার বসু, শ্রীজিতেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন, শ্রীশক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্য, শ্রীললিতকুমার দে, শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[কার্য্যাধ্যক্ষের অসুস্থতা বশতঃ কার্য্যালয়ে অনুপস্থিতি কালে টেবিলের উপর হইতে কএক জন গ্রাহক ও গ্রাহিকার চিঠি হারাইয়া গিয়াছে। সেজন্য বোধ হয় কাহার ও কাহার নাম বাদ পড়িয়াছে। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ তজ্জন্য অপরাধ লইবেন না। ইতি মুঃ কাঃ]

নূতন ধাঁধা।

১। ধীরে ধীরে চলি আমি লাগে গায় ধূলি,
মানুষ আদর করে আমা লয় তুলি।
কিছুদিন চলি আমি হামাগুড়ি গিয়া,
তারপর অপরের কাঁধে চড়ি দিয়া।
সাড়া নাই শব্দ নাই, চলি কিন্তু আমি,
মানুষ বা জন্তু নই, জীব তবু আমি
দু অক্ষরের নাম মম, খড়িতে কসিলে,
ভোজনের দ্রব্য হই উল্টিয়া বসিলে।
উলটি পালটি আমি নৃত্য গীত গাই,
সোজা হইলে শত্রু মোর হাতে হাতে পাই।

২। কোন ও সমুদ্র হইতে একটি মৎস্য ধরা হইয়াছিল। উহার মাথার দীর্ঘতা ৯ইঞ্চি এবং লেজের দীর্ঘতা মাপিয়া দেখা হইল যে তাহার দীর্ঘতা ও পিঠের দীর্ঘতার অৰ্দ্ধেক। তাহার পিটের দীর্ঘতা, লেজ ও মাথার দীর্ঘতার সমান ছিল। বলী দেখি মৎস্যই বা কত বড় ছিল ও উহার লেজের বা দীর্ঘতা কত?

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ব্রাহ্মমিশন শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।
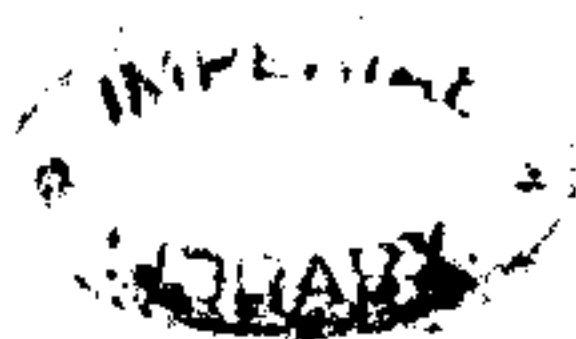
"বাঙ্গলার প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ও তাঁহার পত্নী।"

কার্ত্তিক।

১৮ বর্ষ] ১৩১৯ [৭ম সংখ্যা।

বাঙ্গালার প্রথম গভর্ণর।

রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যখন ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তাকে "গবর্ণর" আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা লেফটেনাণ্ট গভর্ণর নামে অভিহিত হইতেন। ইহা কেবল নামের পরিবর্ত্তন নহে, নমের সঙ্গে শাসনকর্ত্তার শক্তি ও সম্মানেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংরেজ রাজত্বে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদের আনুক্রমিক পরিবর্ত্তন কৌতুহলজনক। ইংরেজ অধিকার এবং শাসন প্রণালী বাঙ্গালা দেশেই প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখান হইতে ক্রমে অন্যত্র প্রসারিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, বাণিজ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল, এই সকল কুঠীর এক এক জন অধ্যক্ষ থাকিতেন, তাঁহাদিগকে "ফ্যাক্টর" বলা হইত। কুঠী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহাদের অধীনে কিছু সৈন্য থাকিত, এবং কয়েকটী দুর্গও নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফ্যাক্টরেরা স্ব স্ব সীমার মধ্যে সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন; তাঁহাদিগকে শাসন, বিচার, ব্যবসা, যুদ্ধ সময় মত সকল কার্য্যই করিতে হইত।

কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহারা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে যখন ভারতবর্ষের নানা অংশে ইংরেজ অধিকার প্রসারিত হইতে লাগিল, তখন বাণিজ্য অপেক্ষা রাজকার্য্যই অধিকতর প্রয়োজনীয় হইল এবং রাজ্যশাসনের প্রকৃষ্টতর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইল। এই সময়ে বাঙ্গালাতেই ইংরেজের প্রতিপত্তি ও অধিকার অধিক ছিল বলিয়া বাঙ্গালার এক জন শাসনকর্ত্তা গভর্ণর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। অধিকার ক্রমে যত পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল, তৎসমুদয় বাঙ্গালার গভর্ণরেরই অধীন করা হইতে লাগিল। এইরূপে বেহার, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ সমুদয়ই বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অধীন হইল; এখনও কোনও কোনও বিষয়ে এগুলিকে বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত করা হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকার বিস্তৃত হইলে বাঙ্গালার গবর্ণরকে গভর্ণর-জেনারেল আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তখনও তিনিই বাঙ্গলার গভর্ণর থাকিলেন, তাঁহার অধীনে কলিকাতায় এক জন ডেপুটী গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যখন সমুদয় ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনাধীন হইল এবং গবর্ণর জেনারেলের কাজ বাড়িয়া গেল, তখন বাঙ্গলা দেশের শাসনের জন্য একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু সকল বিষয়ে তিনি গবর্ণর জেনারেলের সম্পূর্ণ অধীনে থাকিলেন। অপর দিকে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিভাগের শাসনকর্ত্তাদিগকে গবর্ণর আখ্যা দিয়া অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দেওয়া হইল। গবর্ণর জেনারেলই বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা, লেফটেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহার সহকারী মাত্র ছিলেন। এত দিন এই প্রকার ব্যবস্থা ছিল; বর্ত্তমান বৎসর হইতে বাঙ্গলা দেশকে এক জন পৃথক গবর্ণরের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর গবর্ণরের যে ক্ষমতা এবং সম্মান, বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তারও এখন সেই ক্ষমতা এবং সেই সম্মান হইয়াছে। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর মত বাঙ্গলার গবর্ণরেরও একটী মন্ত্রী সভা হইয়াছে। লেফটেনাণ্ট গবর্ণরকে His Honour বলা হইত, গবর্ণর His Excellencey উপাধি পাইবেন। ভারত সচিব লর্ড ক্রু স্বয়ং আমাদের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তা লর্ড কারমাইকেলকে বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণরের পদে মনোনীত করিয়াছেন। লর্ড কারমাইকেল কিছু দিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজের শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বাঙ্গালার জন্য এক জন গবর্ণর নিয়োগ স্থিরীকৃত হইল, তখন লর্ড ক্রু লর্ড কারমাইকেলকেই সেই নূতন পদের জন্য মনোনীত করিলেন। লর্ড কারমাইকেল অল্প দিনের মধ্যে মান্দ্রাজে জনসাধারণের প্রীতি ও সম্মান আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মান্দ্রাজ পরিত্যাগ সংবাদে মান্দ্রাজের লোকেরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া ছিলেন। বাঙ্গালা দেশেও লর্ড কারমাইকেল এই কয়েক মাসের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার অমায়িকতা ও মহোদয়তার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। তিনি দেশীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রজনোচিত সৌজন্য প্রদর্শন করেন। অনেক স্থলে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরা অধীনস্থ দেশীয় কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগকে যথোচিত ভদ্রতা প্রদর্শন করেন না। কিন্তু শুনা যায়, লর্ড কারমাইকেল সামান্য কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গেও অতি ভদ্র ব্যবহার করেন। কোনও ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বসিতে আসন দেন। তিনি স্বয়ং সকল পরিদর্শন করিয়া দেশের অবস্থা অবগত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। শুনা যায়, তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। লর্ড কারমাইকেলের সময় হইতে বাঙ্গালা দেশের শাসন প্রণালীর নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আশা ও প্রার্থনা করি, যে তিনি বাঙ্গলা দেশে সত্য সত্যই নূতন যুগ আনিয়া চির স্মরণীয় হইবেন।

জাট চাষা ও বেনের কথা।

একটি ছোট গ্রামে এক বেনে বাস করিত। তাহার চাল, ডাল, তেল, নুন প্রভৃতির একটি দোকান

ছিল। সেই দোকান খানি গ্রামের অধিবাসীদের দরকারী ছোট খাট সব জিনিষ যোগাইত। এক দিন দোকানের জিনিষপত্র কিনিবার জন্য সহরে যাইবার পথে সে এক গরীব জাট চাষাকে দেখিল। সেই কৃষকও মহাজনের ঋণ শোধ করিবার জন্য, সহরে যাইতেছিল। এই কৃষকের প্রপিতামহ তাঁর নিজের প্রপিতামহের শ্রাদ্ধের জন্য এই ঋণ করিয়াছিল। মূল ঋণ মাত্র এক শত টাকা ছিল, কিন্তু চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ যোগ করিতে করিতে পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহা এখন দশ গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেচারা কৃষক যখন মহাজনের কবল হইতে পৈতৃক জমিগুলি রক্ষা করিবার উপায় ভাবিয়া অস্থির হইতেছিল, সেই সময় বেনে আসিয়া বলিল, "কি হে চৌধুরীভায়া, তুমি দেখছি মহাজনের টাকা শোধ করতে চলেছ। জমিগুলো রক্ষা করবার কি কোনও উপায় নাই?" বেচারা কৃষক বলিল, "হায়, শাহজি, সে বড় দুঃখের কথা। তুমিত জানই আমার প্রপিতামহ একশ টাকা ধার করেছিলেন। এখন তাই হাজার টাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমার এই ক' বিঘা মাত্র জমি দিয়ে কি করে এ ধার শোধ করব বল দেখি?"

"দুঃখ কোরোনা চৌধুরীভায়া, যার কপালে যা লেখা আছে তা' ঘটবেই ঘটবে। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য কেঁদে কেটে আর কি হবে? তার চেয়ে এস বরঞ্চ গল্প বল্‌তে বল্‌তে পথের শ্রমটা দূর করা যাক্।"

"বেশ বলেছ শাহজি, তোমার কথাই ঠিক। ভাগ্যে যা আছে তার জন্য কেঁদে কোনও লাভ নেই। এস গল্প বলেই এত খানি পথ কাটান যাক্। কিন্তু একটা সর্ত্ত করতে হবে। যতই কেন মিথ্যা আজগুবি গল্প হোক কেউ তাকে মিথ্যা কিম্বা কল্পিত বল্‌তে পাবে না। যে সর্ত্ত ভাঙ্গবে তাকে হাজার টাকা দিতে হবে।

বেনে বলিল, "আচ্ছা তাই হবে; আমি এখন গল্প আরম্ভ করি।" এই বলিয়া সে গল্প আরম্ভ করিল।

"তুমি বোধ হয় জান, বেনেদের মধ্যে আমার প্রপিতামহ আর সকলের চেয়ে সম্ভ্রান্ত ছিলেন, আর খুব ধনীও ছিলেন।"

কৃষক বলিল, "হাঁ, হাঁ, শাহজি, ঠিক্ ঠিক্।"

"আমার সেই পূর্ব্বপুরুষ মহাশয় একবার চল্লিশ খানা জাহাজ সাজিয়ে চীন দেশে যাত্রা করেছিলেন, আর সেখানে হীরা জহরতের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

কৃষক বলিল, "হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক্ ঠিক্।"

"তার পর সে দেশে অনেক কাল কাটিয়ে অনেক টাকা কড়ি জমিয়ে, তিনি নানা রকম আশ্চর্য্য জিনিষ নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। তার মধ্যে একটি খাঁটি সোনার মূর্ত্তি ছিল। সে কথা বল্‌তে পারত, আর যে কোনও কথার উত্তরও সে দিতে পারত।"

কৃষক বলিল "হাঁ, হাঁ, শাহজি ঠিক্ ঠিক্।"

"তার পরে তিনি যখন দেশে ফিরে এলেন, কত লোক নিজেদের ভাগ্য শোনবার জন্য সেই মূর্ত্তির কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল, আর তার উত্তর শুনে খুসী হয়ে ফিরে যেতে লাগ্‌ল। এক দিন তোমার প্রপিতামহ আমার প্রপিতামহের বাড়ী সেই মূর্ত্তির উত্তর শুন্‌তে এলেন। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সকলের থেকে বুদ্ধিমান কোন্ জাত্?' সে বলিল বেনে জাত্।' তিনি আবার প্রশ্ন কর্‌লেন, 'সকলের থেকে বোকা কোন্ জাত্?' সে বলিল 'জাট।' সকলের শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বলত আমার বংশে সকলের থেকে বোকা কে হবে?' মূর্ত্তি বলিল, 'চৌধুরী লহরী সিং।" লহরী সিং কে জান? যে কৃষকের কথা আমরা বল্‌ছি, সেই হচ্ছে লহরী সিং। বেনের কথা যদিও তার মনে অত্যন্ত বেদনা দিল, তবুও সে বলিল, "হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক্ ঠিক্।"

কিন্তু সে মনে মনে বেনের কথার শোধ তুলিতে পণ করিল। এমন শোধ তুলিবে, যে ইহজন্মে বেনে তাহা আর ভুলিবে না।

বেনে আবার আরম্ভ করিল।

"সেই মূর্ত্তির যশ চারিদিকে দেশে দেশে ছড়িয়ে গেল। রাজা সেই কথা শুনে আমার প্রপিতামহকে ডেকে পাঠালেন, আর এই মূর্ত্তিটার বদলে তাঁকে প্রধান মন্ত্রী করলেন।"

কৃষক বলিল, "হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক্ ঠিক্।

"তার পর তিনি অনেক দিন রাজার বিশ্বস্ত মন্ত্রীরূপে তাঁকে মন্ত্রণা দিতেন। শেষে যখন তিনি মারা গেলেন, আমার ঠাকুরদাদা তাঁর পদ পেলেন। তিনিও খুব সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতেন, কিন্তু রাজার মনের মতন করে কাজ কর্ম্মে মন দিতেন না। কাজেই রাজা অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর উপর চটে গেলেন, আর তাঁকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে মেরে ফেল্‌তে হুকুম দিলেন। তখন তাঁকে একটা পাগ্‌লা হাতীর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল; কিন্তু হাতীটা তাঁকে দেখে বেশ শান্ত শিষ্টের মতন মাথা নীচু করে শুঁড় দিয়ে তাঁকে পিঠের উপর তুলে নিল।"

কৃষক বলিল, "হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক্ ঠিক্।"

"রাজা যখন দেখলেন যে হাতীটা আমার ঠাকুর দাদাকে মারলনা, তখন তিনি আর কি করেন? ঠাকুর দাদাকে আবার তাঁর পদ দিয়ে তাঁকে খুব আদর অভ্যর্থনা করলেন। ঠাকুরদাদা মারা গেলে বাবা মন্ত্রী হলেন। কিন্তু বাবার নানা দেশ দেখবার বড় সখ ছিল। তাই কাজ ছেড়ে দিয়ে ভ্রমণে বাহির হলেন। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে তিনি কত আশ্চর্য্য রকমের জিনিষ দেখলেন; কোথাও কতকগুলো এক পেয়ে লোক মাথা নীচু করে গাছের ডাল থেকে ঝুলে রয়েছে, কোথাও একচক্ষু রাক্ষস, কোথাও বা দৈত্য দানব; এই রকম কত কিছুই না দেখলেন। একদিন আমার বাবা দেখলেন, যে একটা মশা তাঁকে কামড়াবে বলে কানের কাছে ভন্ ভন্ করে বেড়াচ্ছে। বাবা কি করবেন ভেবে না পেয়ে মহা মুস্কিলে পড়লেন। জানই ত আমাদের বেনে জাতে জীব হত্যা করতে নেই।"

কৃষক বলিল, "হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক্ ঠিক্।"

"কাজেই মহা বিপদে পড়ে বাবা হাঁটু গেড়ে বসে মশার কাছে দয়া ভিক্ষা কর্‌তে আরম্ভ করলেন। অত সাধাসাধি করাতে মশা ব'ল্লে, 'শাহজি, আপনার মতন মহৎ লোক আমি আর কখনও দেখি নাই। আমি আপনার একটা মস্ত উপকার করবো।' এই বলে সে প্রকাণ্ড এক হাঁ করল। বাবা তার মধ্যে আগুনের মতন জল্‌জ্বলে সোনার মস্ত এক প্রাসাদ দেখ্‌তে পেলেন। তার কত হাজার হাজার জানালা, কত শত শত দরজা। সেই জানালার একটির ধারে এক পরমা সুন্দরী কন্যা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রাসাদের দরজার কাছে একটা চাষা সেই রাজকন্যাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল। আমার বাবা প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন ও স্ত্রীলোকের মান ইজ্জত রক্ষা করতে জান্‌তেন। তিনি এক লাফে মশার মুখে ঢুকে একেবারে তার পেটের মধ্যে চলে গেলেন। সেখানে কি ভীষণ অন্ধকার! তিনি মশার পেটের ভিতর হাত্‌ড়ে বেড়াতে আরম্ভ করলেন।"

কৃষক বলিল, "হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক্ ঠিক্।"

"কিছু ক্ষণ পরে অল্প অল্প করে অন্ধকার দূর হয়ে গেল। বাবা আবার সেই প্রাসাদ, সেই রাজকন্যা, সেই চাষা সব দেখতে পেলেন। আমার বাবা খুব সাহসী ছিলেন। তিনি গিয়ে সেই চাষাটার ঘাড়ে পড়লেন; সে লোকটা হচ্ছে তোমার বাবা। এক বৎসর ধরে তাঁরা সেই মশার পেটের মধ্যে লড়াই করতে লাগলেন। তার পর তোমার বাবা হার মেনে রাজকন্যার দাবি ছেড়ে দিলেন। আবার বাবা তখন সেই কন্যাকে বিবাহ করে প্রাসাদে বাস কর্‌তে লাগলেন। কিছু দিন পর সেইখানে আমার জন্ম হ'ল। তোমার বাবা আমার বাবার দরওয়ান হয়ে সমস্ত দিন রাত দরজায় পাহারা দিতেন। আমি যখন পনের বৎসরের তখন একদিন খুব ঝম্ ঝম্ করে ফুটন্ত জল বৃষ্টি হয়ে, আমাদের বাড়ী ঘর সব গলে গেল। আমরা এক জ্বলন্ত সাগরের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। অনেক কষ্টে, আমার মা বাবা, তোমার বাবা আর আমি, এই চারি জনে গিয়ে তীরে পৌঁছলাম। আমরা এক লাফে গিয়ে তীরে হাজির হলাম। ওমা! গিয়ে দেখি কার এক রান্না ঘরে ঢুকে পড়েছি; রাঁধুনী ত আমাদের দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে যখন সে দেখ্‌ল যে আমরা ভূত নই মানুষই, তখন তার কথা ফুটল। সে বল্‌ল, 'তোম্‌রা ত বেশ লোক দেখছি! আমার ঝোল টোল সব মাটি করে দিলে। আমি মাছ

মশার পেটের ভিতর চাষার বাবা ও বেনের বাবার যুদ্ধ।

[শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "হিন্দুস্থানী উপকথা" হইতে গৃহীত]

রাঁধব বলে জল চড়িয়েছিলাম। তোমাদের তাতে ঢোকবার কি দরকার ছিল? বাবা, এমন করেও লোককে ভয় দেখাতে হয়!' আমরা আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগলাম, বল্‌লাম, 'আমরা না জেনে এসেছি, আমরা কিছুই জান্‌তাম না, এই পনের বৎসর ধরে আমরা এক মশার পেটের ভিতর প্রকাণ্ড এক রাজপ্রাসাদে আছি।' রাঁধুনী বলিল, 'ওহো, বুঝেছি। এই পনের মিনিট আগে একটা মশা আমার হাতে কামড়াচ্ছিল; এই দেখ না এইখানটা ফুলে উঠেছে। মশাটা বোধ হয় তোমাদের শুদ্ধ আমার হাতে বিঁধিয়ে দিয়েছিল। বাবা, যে রকম লেগে ছিল! আমি বিষটা টিপে বের করবামাত্র সরষের মতন ছোট্ট কাল একটা কি দেখলাম, সেটা আবার কপালগুণে এই গরমজলে পড়ে গেল। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, যে তোমরা তার ভিতর ছিলে।' বাবা বল্‌লেন, 'ঠাকরুণ, আমরা কি করে তোমার রান্নার মধ্যে এসে পড়েছি, তা ত এখন বেশ ভাল করেই বোঝা যাচ্ছে। তুমি যে পনের মিনিটের কথা বল্‌ছ, সেই বোধ হয় আমাদের পনের বৎসর।' আসল কথা, যদিও আমি দেখতে পনের বৎসরের ছেলের মতন ছিলাম, তাহ'লেও আমার বয়স মাত্র পনের মিনিট ছিল। আমরা অবাক হয়ে ভাবছিলাম, যে মাত্র পনের মিনিটে কি করে এত কাণ্ড হ'ল। এর মধ্যে আমার জন্ম হ'ল, আমি এত বড় হ'লাম, আর আমার মা, বাবার পনের বৎসর বয়স বেড়ে গেল। এখন যদিও আমি পঁচিশ বৎসরের জোয়ানের মত দেখতে, কিন্তু আমি একটা দশবৎসরের ছেলে মাত্র, মশার আগুনের মত গরম পেটে পনের মিনিট ছিলাম বলেই এখন আমি এমন অদ্ভুত রকম বেড়ে উঠেছি।''

কৃষক বলিল, "হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক্ ঠিক্।"

বণিক বলিল, "বাহিরে এসে দেখলাম যে আমরা আর এক রাজ্যে এসে পড়েছি। আসলে আমরা এই গ্রামে এসে পড়লাম। কাজেই আমার বাবা, যদিও আগে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, শেষে দোকান করতে আরম্ভ করলেন, আর আমি তাঁর সাহায্য করতে লাগলাম। আর আমার রাজকন্যা মা যে সেদিন স্বর্গে গেলেন, তা ত তুমি জানই। এই আমার গল্প।''

কৃষক বলিল, "হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক্ ঠিক্। তোমার গল্পটা ভাই, একেবারে খাঁটি। আমার গল্পটাও যদিও খাঁটি সত্য, কিন্তু তোমার মতন আশ্চর্য্য নয়। তাহলেও আমার গল্পের প্রত্যেকটি কথা সত্য। এখন মন দিয়ে শোন।''

"আমার প্রপিতামহ গ্রামের মধ্যে সকলের থেকে বড় চাষী ছিলেন। তাঁহার জমকাল চেহারা, ভদ্র ব্যবহার আর গভীর জ্ঞান দেখে সকলেই তাঁর প্রশংসা করত। সমাজের সকলে তাঁকে মান্য করে চল্‌ত, তিনি গ্রামের মোড়ল ছিলেন বলে দুর্ব্বলেরা তাঁর আশ্রয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাত। গ্রামের যত মজলিসে তাঁকেই ভাল আসনটা দেওয়া হত আর হুঁকোটা সবার আগে তাঁরই হাতে দেওয়া হত। তাঁর গুণের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসত। কোন গরীব দুঃখীকে কষ্টে পড়তে দেখলে তিনি যথাসাধ্য তার সাহায্য করতেন; চাষের জন্য অন্য লোককে খুসী হয়েই নিজের বলদ জোড়া ধার দিতেন। অন্য চাষীর ধান কাটবার লোক কম পড়লে নিজের লোকদের পাঠিয়ে দিতেন, আর গ্রামের দশ জনকে তিনি নিজের ইচ্ছায় খেতের ফসলের আর গোয়ালের দুধ ঘির ভাগ দিতেন। গ্রামের লোকের ঝগড়া হলে তিনিই মিটিয়ে দিতেন, তাঁর কাজে কোন লোকই বাধা দিত না। এক কথায় বল্‌তে গেলে, রাজার হুকুম কিম্বা কাজির বিচারের থেকেও তাঁর কথার বেশী জোর ছিল। দুষ্ট লোকে তাঁর ভয়ে অস্থির হয়ে থাক্‌ত; তাঁর গায়ে রুস্তম কি ভীমের থেকেও বেশী জোর ছিল বলে কোন লোকে অপরাধ করে তাঁর কুদৃষ্টিতে পড়তে সাহস করত না।''

বণিক বলিল, "হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক্ ঠিক্।''

"তার পর একবার আমাদের গ্রামে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হল। আমাদের অঞ্চলে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ল না, নদী পুকুর সব শুকিয়ে গেল, গাছপালা মরে গেল। গরু বাছুর না খেতে পেয়ে মরবার যোগাড় হ'ল, আর চারি দিকে হাজার হাজার জীবজন্তু মরতে

লাগল। যখন আমার প্রপিতামহ দেখলেন যে, তাঁর ভাড়ার প্রায় শেষ হয়ে এল, এখন আর কোন উপায় না দেখলে সমস্ত জন মানব না খেতে পেয়ে মরবে, তখন তিনি সমস্ত চাষাদের ডেকে জড় করে বললেন, 'হে কৃষকগণ, ইন্দ্রদেব নিশ্চয়ই আমাদের উপর রাগ করেছেন, তা না হলে এত দিন কখনই অনাবৃষ্টি থাকৃত না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, যদি এর কোন উপায় না করা হয় তাহ'লে আমাদের সকলকেই না খেতে পেয়ে মরতে হবে। যদি তোমরা আমার পরামর্শ শোন তাহলে আমি যতদিন দুর্ভিক্ষ থাকৃবে ততদিন তোমাদের খাবার জোগাড় করে দেব। এখন তোমরা যদি ছমাসের জন্য তোমাদের জমীগুল আমার হাতে ছেড়ে দাও তা হলেই হয়। আমি তা'তে ফসল ফলাব।' সকলেই তাঁর কথাতে রাজি হল। তখন তিনি খুব কষে কোমর বেঁধে একটানে সেই হাজার বিঘা জমি শুদ্ধ সমস্ত গ্রামটা তুলে মাথায় করে নিলেন।"

বেনে এই সব আজগুবি কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিল, কিন্তু মুখে বলিল, "হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক্ ঠিক্।"

"তার পর সেই সমস্ত গ্রামটা মাথায় করে নিয়ে তিনি বৃষ্টির সন্ধানে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলেন। যে দেশে বৃষ্টির সন্ধান পেতেন, তিনি সেই দেশেই গিয়ে উপস্থিত হতেন। এই রকম করে সমস্ত জমি বৃষ্টিতে ভিজিয়ে নিয়ে আর সমস্ত পুকুর, ডোবা জলে ভরে নিয়ে তিনি চাষাদের চাষ করতে আজ্ঞা করলেন। এমনি করে ছমাস ধরে নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়ে তিনি সমস্ত মেঘের জল নিজের গ্রামে সংগ্রহ করে নিলেন। সেই সময়ে চাষীরা খুব চাষ করল। সেবারকার মতন শস্য আমাদের দেশে আর কখনও হয়নি। গমের শীস্ জল পেয়ে এমন বাড়তে লাগল যে শেষে গিয়ে আকাশে ঠেকল।"

বেনে বলিল, "হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক্ ঠিক্।"

"আমার প্রপিতামহ গ্রামটা মাথায় করে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে এসে আবার যেখানের গ্রাম সেইখানেই তাকে বসিয়ে দিলেন। সেবারে তাঁর খুব লাভ হল। সমস্ত গ্রামটাই তখন তাঁর। গম ভুট্টা সবই সেবার আশ্চর্য্য রকম বেড়েছিল। এক একটা দানা তোমার মাথার সমান।"

বণিক বলিল, "হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক্ ঠিক্।"

"তারপর সমস্ত গম জড় করে এত বেশী হল, যে রাখবার জায়গাই হ'ল না। নানাদেশ থেকে লোকে এই আশ্চর্য্য ফসলের কথা শুনে শস্য কিন্‌তে আমাদের গ্রামে এল। শস্য বিক্রী করে আমার প্রপিতামহ খুব লাভ করলেন। তিনি হাজার হাজার টাকা দরিদ্রদের দান করে দিলেন। কত লোককে বিনা মূল্যে গম দিলেন। যারা টাকা দিতে পারে তাদের কাছে হক দরে বিক্রী করলেন।"

কৃষকের গল্প যখন এতটা বলা হইয়াছে, তখন তাহারা সহরে প্রবেশ করিল। কৃষক বলিতে লাগিল, "সেই সময় তোমার প্রপিতামহ অত্যন্ত গরীব লোক ছিলেন। সেইজন্য আমার প্রপিতামহ তাঁকে শস্য ওজন করে দেবার জন্য চাকর রাখলেন।"

বেনে বলিল, "হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক্ ঠিক্।"

"বেচারা সমস্ত দিন রাত গম ওজন করতেন, কিন্তু এমন বোকা ছিলেন যে বিক্রীর হিসাবে ক্রমাগতই ভুল করতেন; সেই জন্য তিনি মনিবের কাছে প্রায়ই মার খেতেন।"

বেনে বলিল, "হাঁ হাঁ, চৌধুরী ঠিক্ ঠিক্"।

ঠিক্ সেই সময়ে তাহারা জাট চাষার মহাজনের দোকানে প্রবেশ করিল। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা "রাম, রাম" বলিয়া নমস্কার করিয়া মেজেতে বসিল। কৃষক মহাজনকে কিছু না বলিয়া গল্প বলিয়া চলিল।

"তারপর যখন সব শস্য বিক্রী হ'য়ে গেল, তখন তোমার প্রপিতামহকে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি যাবার সময় আমার প্রপিতামহের কাছে একশ' টাকা ধার চাইলেন। তিনি দয়া করে টাকা দিলেন।"

বেনে বলিল, "হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক্ ঠিক্।"

তখন কৃষক খুব উচ্চৈঃস্বরে মহাজনকেও শুনাইয়া বলিল, "কিন্তু তোমার প্রপিতামহ সে ধার শোধ করেন নাই।"

বেনে বলিল, "হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক্ ঠিক্।"

"তার পর তোমার ঠাকুরদাদা, বাবা, এমন কি তুমিও সে টাকা আজ পর্য্যন্ত শোধ কর নাই।"

বেনে বলিল, "হাঁ হাঁ, চৌধুরী ঠিক্ ঠিক্।"

কৃষক বলিল, "সেই টাকা এখন সুদে আসলে এক হাজার টাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি আমার কাছে এত টাকা ধার।"

বেনে বলিল, "হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক্ ঠিক্।"

"তুমি মহাজনের সামনে এ কথা স্বীকার করলে, এখন টাকাটা তাঁকে দিয়ে দাও। তা হ'লে আমার জমিটা খালাস হ'য়ে যায়।"

বেনের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে ঋণ স্বীকার করিয়া উভয় সঙ্কটে পড়িল। যদি ইহাকে গল্প বলিয়া টাকা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাদের গল্প বলার সেই সর্ত্ত অনুসারে এক হাজার টাকা দিতে হয়; সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে নিজ কথামত ঋণ শোধ করিতে হয়। সুতরাং যে কোন প্রকারেই হউক না কেন তাহাকে এক হাজার টাকা দিতে হইল। তাহাকে সমস্ত জীবন নিজের বেকুবীর জন্য আপশোস্ করিতে হইল। *

অনাথ।

যখন রাজা বাহাদুর আর রাণীমা সে ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তাদের শিশু কণ্ঠের মৃদুমধুর সঙ্গীত তরঙ্গ আঘাতের মত সমতালে উঠ্ছিল, আর পড়্ছিল, কথাগুলি বড় সকরুণ,

আজকে রাতে হাস্‌ব মোরা
গাইব মৃদু গান,
কালকের খেলা কেমন হবে
জানেন ভগবান!

গান শেষ হলে তারা কিছু ক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, রাণীমা আস্তে আস্তে এগিয়ে হেসে বল্লেন, "একি মোহিনী মন্ত্র গাওয়া হচ্ছে?" শোভনা তাড়াতাড়ি বল্লে, রাণীমা, ওটা আমাদের গান, ভারী গোপনীয়, জিজ্ঞেস কর্ত্তে নেই, তোমরা বড়রা শুনলে শুধু হাস্‌বে!"

শোভনার সুকুমার মুখ, অতি ক্ষীণ দেহ দেখে রাণীমার মুখে হাসি আর ছিল না, তিনি তার চৌকীর কাছে হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, "মাণিক, ভাল আছত? এরা এসে তোমার খুব ভাল লাগ্‌ছে বুঝি?"

শোভনা শ্রান্ত কাতর সুরে বল্লে, "ভাল লাগছে বইকি রাণীমামী, তবে এখন আমার বড্ড কাহিল বোধ হচ্ছে, নার্সকে ডাক আমায় শোবার ঘরে নিয়ে যাবে।"

রাজা বাহাদুর আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "শোভা আমি তোমায় নিয়ে যাই!" শোভনা বল্লে না, রাজা মামা, নার্সের বেশ নরম হাত, তার কোলে যেতে আমার বেশী ভাল লাগে!"

শোভনার এ উত্তরে রাজাবাহাদুরের মনে ব্যথা লাগল জেনে করুণা বড় কষ্ট বোধ করলে। তিনি কিছুই বল্লেন না সত্যি, তখনি সরে এসে হাসিমুখে বীরেনকে তার দোলনা ঘোড়ার খবর জিজ্ঞাসা করলেন, তবুও করুণা বেশ বুঝতে পারলে, তাঁর স্নেহপূর্ণ আগ্রহের প্রত্যাখ্যানে তাঁর মহৎ অন্তঃকরণে কত আঘাত লেগেছিল। রাণীমাও সে কথা বুঝতে পেরে ছিলেন, তাই নার্সের কোলে চড়ে গিয়ে শোভনা যখন সুকোমল শুভ্র বিছানায় শুয়ে একটা আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শ্রান্ত চোখ বন্ধ করে, স্থির হয়ে রইল, তখন রাণীমা নার্সকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, স্নেহপূর্ণ মৃদুস্বরে বল্লেন, "শোভামণি, তোমার মামাকে আরো ভালবাস্‌তে চেষ্টা কোরো, তোমার ব্যবহারে তিনি মনে কত কষ্ট পান!"

শোভনা মামীর গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে, "রাণীমামী, তোমায় আমি খুব ভাল বাসি। করুণাকে ছেড়ে দিলে

---

* শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত হিন্দুস্থানী উপকথা হইতে গৃহীত। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র। প্রবাসী কার্য্যালয় ২১০।৩।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পৃথিবীতে আমি তোমাকেই সব চেয়ে ভালবাসি। করুণাকে আমি না ভাল বেসে থাকতে পারি না আমি যত দোষই করিনে কেন, তাই বলে, সেত আমায় কখন কম ভাল বাসবে না!

"মা মণি আমার, চাঁদ আমার, তুমি আবার কি দোষ করতে পার? তুমি যে দেবতার দুতের মত শুধুই পবিত্র আর সুন্দর!

যখন খানিক পরে নার্স খেতে গেল, আর করুণা এসে শোভনার কাছে বসলে, তখন সে দেখলে শোভনা বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, তাকে দেখে বল্লে, "দিদু আমার মনে বড় কষ্ট আমি কি করি!" করুণা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ধন কিসের কষ্ট? তোমার কি তবে শরীর ভাল বোধ হচ্ছেনা?" শোভনার অসুখ আবার বাড়বে মনে করে তার সর্ব্ব শরীর যেন কাঁপতে লাগল!

শোভনা বল্লে "না না শরীরে কিছু হয়নি, তবে রাত গুলো আমার আর সহ্য হয় না। আমি জানি নার্স কাছেই শুয়ে আছে, ঘরে প্রদীপ জ্বলে, তবু আমি অনেক রাত ঘুমতে পারিনে, আমি বাবার কথা ভাবতে চাই; কিন্তু তাওতো পারিনে, তিনি অত দূরে অত উপরে স্বর্গে আছেন, তাই বুঝি কিছুতেই তাঁর নাগাল পাইনে। কিন্তু দিদি, যারা ঠকায় প্রতারণা করে, তারাতো কখনো স্বর্গে যেতে পায়না। আমি জানালার দিকে চেয়ে বাবা মণি আর মা-জননীর মুখ মনে করতে চেষ্টা করি, কিন্তু যত বারই ভাবি, মনে হয় যেন তাঁরা রাগ করে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

"না, শোভা না, তাকি কখনো হতে পারে? বাবা কি কখনো তোমার উপর রাগ করেছিলেন? তোমার শরীর কাহিল হয়ে গেছে, তাই ওরকম মনে হয়!"

"কিন্তু দিদু, আমি সত্যি কথা বলতাম কিছু ঢাকা ঢাকি করতাম না, তাই তো আমায় তোমার চেয়ে ও সবারি চেয়ে ও বেশী ভাল বাসতেন, কিন্তু এখন!"

করুণা বল্লে, "তুমি সব কথা খুলে বলতে আমি ত তা পারতাম না, আমার কেমন লজ্জা করত!" তাদের বাবার সরল খোলা মন, ভোলানাথের মত উদার ব্যবহার মনে করে করুণার বড়ই কষ্ট হতে লাগল। কোন নীচতা, কোন সত্য অপলাপ তিনি কত ঘৃণা কর্ত্তেন। শোভনা বল্লে, "দিদি আমি সত্যি কথা বলতে চেয়ে ছিলাম, সেই যে দিন আমি পালিয়ে যাই, সেই দিন তার পর আমার যে বড্ড অসুখ হ'ল কিছুই বলা হ'ল না।"

কিন্তু আজ রাতে যখন বাবা মাকে মনে মনে প্রণাম জানাতে চাইলাম, তাঁদের বাদ দেওয়া কত নিষ্ঠুরতা বুঝতে পারলাম, তখন মায়ের সেই রাঙা শাড়ী, শাঁখা সিঁদুর পরা সুন্দর মুখ আমার মনে পড়ে গেল, তার হাসিটি যেন আমার কানে বাজতে লাগল। তখন আমার বড় কান্না পেল, কেবলি চোখের জল পড়তে লাগল। মায়ের মত কে আর আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ভগবানের নাম করতে শেখাবে! আমার মনে হতে লাগল, আমি যেমন মায়ের বুড়িখুকি হয়ে তাঁর কোলের উপর শুয়ে পড়তাম, আর তিনি আমাকে কচি ছেলের মত দোল দিতেন, তেমনি যদি আবার পাই, তবেই আমার সব কষ্ট যায়!

কিন্তু আমার তাঁর কথা ভাবতে সাহস হয় না, তিনি কি এ মিথ্যা সহ্য করতেন? সেই মুহূর্ত্তেই সব সত্যি কথা বলতেন।" করুণা মৃদুস্বরে বল্লে, "সব দোষই আমার আমি বড়, আমিই সব ঠিক করতে পারতাম। "তোমার কথা কে বলছে আমি আমার কথাই বলছি রাঙ্গামামা মামা এতে শুধু আমার দোষই দেখবেন। আর রাণী মামী আমায় এত ভাল বাসেন, আমার তাইতো এমন দুঃখু হচ্ছে!"

"শোভন, তবে কি সব কথা পরিষ্কার করে বল্লে তোমার ভাল লাগবে তুমি সুখী হবে?"

"হ্যাঁ দিদু হ্যাঁ, এখনি সব কথা তাঁদের জানাও, তানা হলে আমার আবার যদি ভয় আসে, তবে আর কিছুই বলতে পারবো না। আজ রাতে ঘুমিয়ে পড়বার আগে তাঁদের ক্ষমা আমি চাই!"
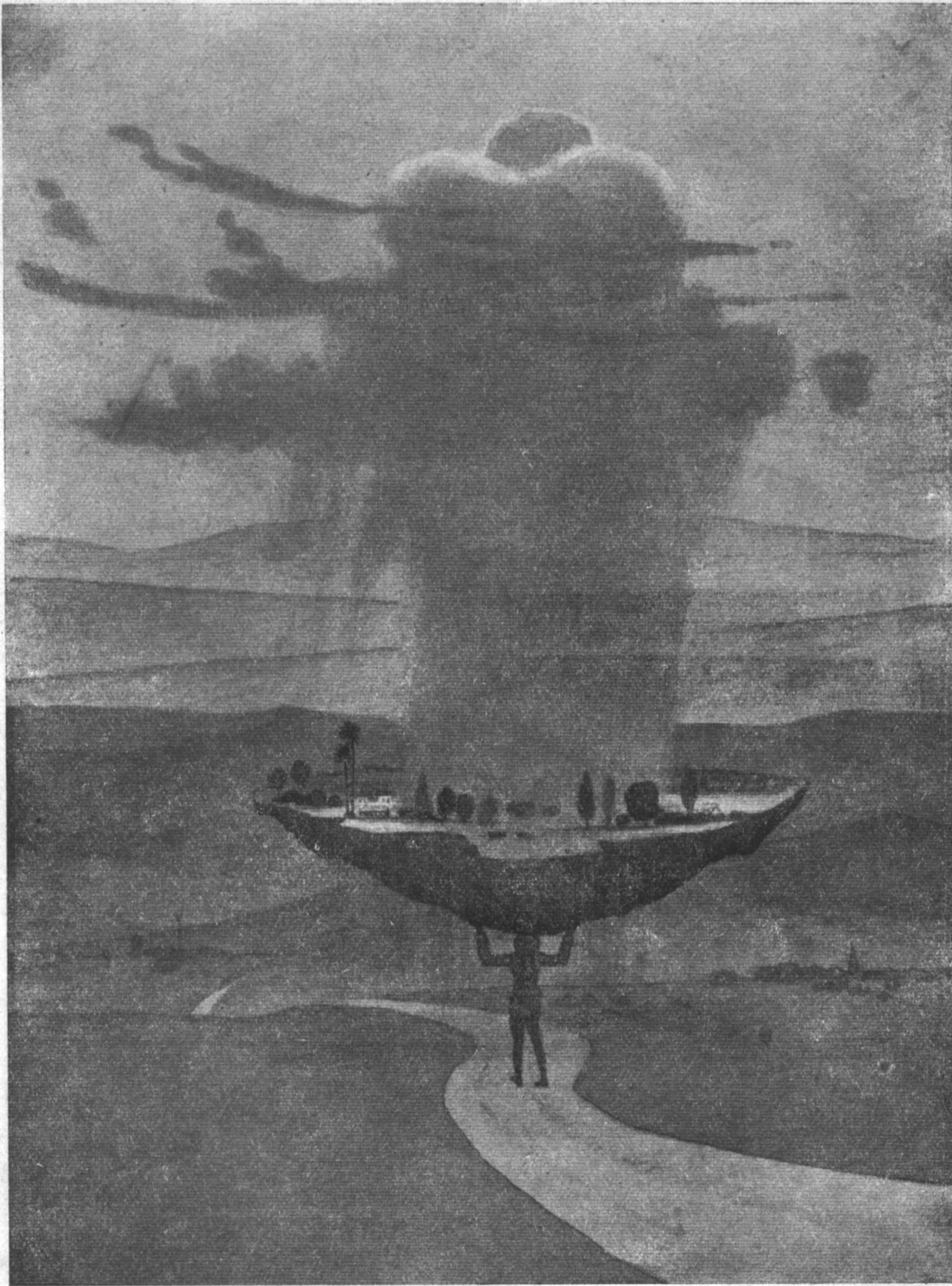
চাষার প্রপিতামহ গ্রাম মাথায় করিয়া পৃথিবীময় বৃষ্টি ধরিয়া বেড়াইতেছেন।

[শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "হিন্দুস্থানী উপকথা" হইতে গৃহীত]

করুণার মুখ যদিও ভয়ে লজ্জায় একেবারে পাংশু বর্ণ হয়ে গেল, তবুও সে দৃঢ় স্বরে বল্লে, "আচ্ছা আমিই তাঁদের সব বলব। আমি এখনি গিয়ে রাজামামাকে সব বলব। ভয় কোরনা মাণিক, তাঁদের কখনই তোমার উপর রাগ কর্‌তে দেবনা, বলব, সব দোষই আমার।"

শোভনা উত্তেজিত হয়ে বল্লে, "না, না আমিই বল্‌ব, আমি বল্লে, আমার সব দোষ খণ্ডে যাবে। তাহলে তাঁরা কখনই আমাকে স্বার্থপর কি মিথ্যাবাদী বলতে পারবেন না।"

"আমি কি কর্‌ব শোভা, তুমি যদি অত ব্যস্ত হও, অত জোরে কথা বল, তাহলে আবার তোমার অসুখ কর্‌বে।"

শোভনা বল্লে, "তা অসুখ করে করবে আমি আর কিছুই কেয়ার করিনে। তুমি তাঁদের দুজনকে এখুনি উপরে নিয়ে এস। এখনি আমি সব বলব।"

করুণা বল্লে "আচ্ছা" তার পর অনিচ্ছায় আস্তে আস্তে যখন দুয়ারের কাছে উপস্থিত হ'ল, তখনি ডাক্তার বাবু এসে পড়লেন, সানন্দ স্বরে বল্লেন, "কিগো মা লক্ষ্মী, কি হচ্ছে? একি আবার চোখে জল? এত চলবে না শোভা ঠাকুরাণী। আমি একটু দেরী করেছি আর কান্নাকাটি করছ। বড্ড ধরা পড়ে গেছ। ভেবেছিলে বুঝি আমি আর এলামনা!" ডাক্তার বাবু শোভার কাছে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার রাঙা মুখখানি নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলেন।

শোভনা বল্লে, "আমি বেশ ভাল আছি, ডাক্তার বাবু, আমায় আবার একটু করুণার সঙ্গে কথা কইতে দাও!"

করুণা, শোভনার গলার আওয়াজ পেয়ে ফিরে এসে বিছানার কাছে ছোট বোনটির মুখের উপর ঝুঁকে স্নেহ কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "কি মণি?" শোভনা তখন শ্রান্তি এবং মানসিক দুশ্চিন্তায় একেবারে অবসন্ন হয়ে হাঁপাচ্ছিল, ফিস্ ফিস্ করে ভাঙা গলায় বল্লে, "তুমিই সব কথা বলগে যাও। যতক্ষণ ডাক্তারবাবু এখানে আছেন, তারি মধ্যে সব কথা বোল, তার পর আমি ঘুমিয়ে পড়বার আগে তাঁদের একবার উপরে ডেকে নিয়ে এস, আমি ক্ষমা চাইব। বোন, ডাক্তারবাবু না এসে পড়লে আমিই সব বলতাম। আর দিদু বোন, বুঝিয়ে বোল আমার উপর যেন বেশী রাগ না করেন, বাবা মা আমার উপরে কখনই রাগ কর্‌তেন না। যাও যাও, এখনি যাও, আজ রাতে তাঁদের ক্ষমা না পেলেই হবেনা।"

* * * * *

রাজা বাহাদুর বৈঠক খানার এক খানা বড় কোচে আধ শোয়া আধ বসা ভাবে এক খানা খবর কাগজে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন, কত ক্ষণে ডাক্তার বাবু আস্‌বেন, তিনি কি বল্‌বেন, জান্‌বার জন্য তাঁর মন ভারী উৎসুক হয়েছিল।

রাণী ঠাকুরাণী পড়বার কোনও ভান না করে ভারী চিন্তিত ভাবে পায়চারি করছিলেন। যতবার আসছিলেন, আর যাচ্ছিলেন, তত বারই খবর কাগজের উপর তাঁর ছায়া পড়ে, সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু রাজা বাহাদুর কিছুই আপত্তি করছিলেন না। প্রকাণ্ড সিঁড়ি দিয়ে করুণা দ্রুতপদে নেমে এল, থেমে থেমে আস্‌তে তার ভরসা হচ্ছিল না, সে জানত একবার যদি ভয়ের বশ হয়, তবে তার কর্ত্তব্য সে কিছুতেই করতে পারবে না। কি হবে না হবে, সে কথা কিছুই মনে স্থান না দিয়ে একেবারে তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল, আর দৃঢ় স্বরে বল্লে, "আমি আপনাদের দুজনের কাছে কিছু বলতে চাই।"

রাজাবাহাদুর তৎক্ষণাৎ খবর কাগজখানি রেখে দিয়ে তাঁর স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, করুণা যে কোন বিশেষ কথার জন্যে তাঁদের কাছে এসেছে, তা আর বুঝতে বাকী রইল না। করুণা তাঁদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কথা বলবার সময় গম্ভীর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সে কেবল তার মামার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"আমারি সব দোষ, কেবল আমারি দোষ, আপনারা শোভনার উপর যেন রাগ করবেন না। সে নিজেই আপনাদের কাছে সব কথা বলতে চেয়েছিল, আমি আপনাদের ডাক্‌তে আসব, এমন সময় ডাক্তার বাবু এসে পড়লেন, তাই আর হ'ল না। সে ঘুমিয়ে

পড়বার আগে আপনাদের ক্ষমা চায়। আমিই আপনাদের প্রতারিত হতে দিয়েছিলাম, তবু ভুল আপনারাই প্রথম করেছিলেন কিন্তু।”

রাণী ঠাকুরাণী আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, “করুণা পাগল হয়ে গেলে কি? এ সব কি বলছ?” রাজা বাহাদুর আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, “তার পর বল।”

করুণা হাত যোড় করে বল্লে, “যত রাগ সব আমারি উপর করুন, তবু আপনি যদি আমার খুব বেশী রাগ করেন, তবে আমি মরে যাব। আমি ভালর জন্যেই সব করেছিলাম। আপনারা শোভনাকে আমি বলে ভুল করেছিলেন সেটা স্বাভাবিক, সে দেখ্‌তে অমন সুন্দর, তা ছাড়া আপনার উপহার বেনারসী শাল খানি সেই গায়ে দিয়েছিল, কিন্তু এমন ভুল যে হওয়া সম্ভব, সে কথা তখন আমরা একবারও মনে করিনি!”

“তাইত!” রাণী ঠাকুরাণীর রাজা বাহাদুরের মত বুদ্ধি নাই থাকুক, তবুও সব কথার গূঢ় অর্থটুকু তিনি খুবই চট করে ধরতে পারতেন!

কান্না কোন রকমে রোধ করে বড় বড়, দুটি বিষণ্ন চোখ তারা মামার মুখের উপর রেখে করুণা বল্লে, “দোষ আমারি। যখন আপনারা ভুল করেছিলেন, তখন আমারি এগিয়ে এসে সব কথা বলা উচিত ছিল, কিন্তু আপনারা এত সুখী হয়েছিলেন, যে আপনাদের নিরাশ করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল!”

রাজাবাহাদুর কঠোর গম্ভীর স্বরে বল্লেন, “এসব কথা হতে কি বুঝ্‌তে হবে?”

করুণা হতাশ ভাবে বল্লে, “আমায় শাস্তি দিন, কিন্তু একবার উপরে যান, শোভনাকে ক্ষমা করে আসুন, তার এত অসুখ, যেদিন বাবার মৃত্যুর কথা শোনে, সেই দিনই সব কথা বল্‌তে চেয়েছিল, তবে নাকি আপনাকে অত্যন্ত ডরায়, আর রাণীমামী তার উপর যদি বিরক্ত হ'ন, আর না ভাল বাসেন, সেই ভয়ে সে পারে নাই। আমায় জেলে পাঠিয়ে দিন সেত ঠিকই হবে। আপনি এখানকার সকলের কর্ত্তা, রাজা, রাজা সবই করতে পারেন, তবে আমার সব দোষ, পায়ে ধরি, তাকে আপনারা ক্ষমা করুন। যদিও সে আপনার নিজের ভাগ্‌নী নয়, তবুও তাকেই ভালবাসবেন বলুন।”

রাণী ঠাকুরাণী বল্লেন, “কি বলছ করুণা? শোভনা আমাদের ভাগ্‌নী নয়! এই কি তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে বল? একটু ভেবে চিন্তে সামলে কথা কও, কি আবোল তাবোল বকৃছ?”

“আমি করুণা, আমিই আপনাদের ভাগ্‌নী, মায়ের নামে আমার যে সুরমা নাম, তা বলে কেউ ডাকে না।”

“তবে তুমি কি বল্‌তে চাও, শোভনা কচি মেয়ে আমাদের এমনি করে ঠকিয়েছে! এতদিন ধরে আমাদের আপন ভাগ্‌নী হবার অভিনয় করেছে। সে ব্যবহার সবই মিথ্যে।”

“সেত কোন মিথ্যে নাম নেয়নি, শোভনাই তার নাম। আপনারা একবার জিজ্ঞাসাও তো করেননি। সে প্রথম ঘরের ভিতর গিয়েছিল। আপনারা সহজেই ভুল করে ছিলেন, সে দেখ্‌তে সুন্দর, আমার চেয়ে মাথায় বড়, তাকে কোলে নিয়ে যখন নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন সে তার ঠিক্ নামই বলেছিল, কিন্তু সেটা আপনারা তার আদরের ডাক নাম ঠিক্ করেছিলেন!” রাজা বাহাদুর কিছু বল্লেন না, শুধু দু হাত তুলে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলেন। করুণা কাতর ভাবে বল্লে, “আমি সব কথাই খুলে বল্‌ছি, যেদিন আমরা এলাম, সেই রাতে আপনি যখন শোভনাকে দেখতে আমাদের শোবার ঘরে এলেন, তখন আমি জেগে ছিলাম, আমি তখনি আপনাকে সব কথা বল্‌ব মনে করেছিলাম, কিন্তু আপনার সঙ্গে মোক্ষদা দাসী ছিল, তাই আমার কেমন সঙ্কোচ হল, আমি মনে করলাম সে গেলে আপনাকে সব কথা বল্‌ব। আপনি মোক্ষদাকে বল্লেন, শোভনা যে আপনার ভাগ্‌নী তাতেই আপনি খুসী, আমি ভাগ্‌নী হ'লে আপনার ভাল লাগ্‌ত না, রাজাবাহাদুরও বাবার চেহারার সঙ্গে আমার বেশী মিল আছে দেখে বিরক্ত হয়েছিলেন। তাই আমার মনে হ'ল, ভগবান নিশ্চয়ই চান, যে আমি সবই শোভনার জন্যে ত্যাগ করি, আমি আপনাদের মনের মত

সুন্দর কি সপ্রতিভ নই, আমার কিছুতেই অধিকার নেই। পরে যদিও আমি বেশ ভাল করেই বুঝাতে পেরেছিলাম কাজটা অন্যায় হল, তবুও সব কথা বুঝিয়ে বলার চেয়ে, যেমন চলছিল তেমনি চল্‌তে দেওয়াই ভাল আর সহজ মনে হ'ল। এর ভিতর কোনই অভিনয় ছিল না।"

"এখন কি করতে হবে, তুমি কি চাও?" "শুধু তাকে ক্ষমা করুন, আর কিছুই চাইনে। অত ছোট মেয়ে তাই সে অবুঝ, আর আপনি কত বড়, কত মহৎ, ভু'ল প্রথমে আপনারাই করেছিলেন, কেউতো ভোলায়নি! সে যদি আপনাদের নিজে হতে না জানাতে চাইত, তাহলেও কখনই আপনারা কিছুই জান্‌তে পারতেন না। আর আজ বিজয়া দশমীর রাত্রি, এ বাঙ্গালা দেশে কেউ কারো উপর কোন বিদ্বেষ আজ রাখবে না। সবাই সবাইকে ক্ষমা করবে, এত দিন যাকে এত ভাল বেসেছেন, আজ তাকে একটু ক্ষমা করুন।"

রাণীঠাকুরাণী অপ্রসন্ন মুখে বল্লেন "এই করুণা যে আমাদের ভাগ্‌নী তাই বা কি করে জান্‌ব? ননীর পুতুল শোভনার স্থান, ইনি অধিকার করবেন?"

"না, না আমাকে নিতে হবে না, আপনারা তাকেই সব চেয়ে ভাল বাসেন, তাকেই কাছে রাখুন। আমিত প্রথম হতে সবই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তাকে ক্ষমা করুন, শুধু এই চাই। যা হয়েছে ভালই হয়েছে, আমি তো আমার ছোট ভাই বোনদের ছেড়ে থাকতে পারব না। দেওয়ানজীর বাড়ীতে আমরা সুখেই আছি, তাঁরা আমাদের ভালবাসেন, তবে বীরেন খুকু ছোট, তাঁরও অনেক গুলি কচি কাঁচা, আমি না থাকলে ওদের কে দেখবে? খুকু গরমে কষ্ট বোধ করে, শোবার ঘরে পাখা নেই, রাতে আমি কাছে না থাকলে কে তাকে বাতাস করবে, আমি কাছে থাকলে তার সবই পারব। কিন্তু রাণীমামী শোভনাকে তুমি কখনই সে বাড়ীতে পাঠিও না। তার সুকুমার শরীর, কত যত্ন আদরে সে লালিত পালিত।" রাজাবাহাদুর স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর তুমি, আমাদের কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আমি কি করব আমার তো আপনাদের ছেড়ে চলে যেতেই হবে। আপনারা তো আমাকে ভালবাসেন না, তা আমি জানি। আমাকে ক্ষমা করবেন না। এত করেও কি আমি আপনাদের বোঝাতে পারলাম না যে শোভনাকে ক্ষমা করুন, আমি শুধু এই চাই!" রাজা বাহাদুর কঠোর ভাবে বল্লেন, "আমি আমার ভালবাসা কি ক্ষমার কথা ভাবছিনে, আমি শুধু ভাবছি, কত তুচ্ছ জিনিষের জন্য সে আমাদের ঠকিয়েছে, সামান্য খেলনা, কাপড় আর গহনা!"

"আমার পুতুল ভালবাসবার বয়স গিয়েছে, শোভনার যে সব জিনিশ ভাল লাগে, সে সবের জন্যে আমার কোনই টান নেই। বাবা কতবার বল্‌তেন, আমার শাড়ী দাম দিয়ে কেনা নয়। সে এসব জিনিসের জন্যে আমি কাঁদছিনে, রাজা মামা আমি কি নাবুঝ খুকি?"

"করুণা, তাহলে তোমার কোন দুঃখই হচ্ছেনা। তোমার মায়ের বাল্যকালের সুখের ঘর বাড়ী, তাঁর আত্মীয় স্বজন ছেড়ে যেতে তোমার কোন দুঃখই হবে না, তোমার ছোট ভাই বোন আর শোভনা সুখে আছে, জানলেই তুমি সুখে থাকবে?"

করুণার দুই চোখ দিয়ে কেবলি জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, ছোট দুখানি হাত বাড়িয়ে তার মামার হাত ধরে বল্লে, "দুঃখ হবেন মামাবাবু, এত যত্ন এত আদর আমরা সকলেই তোমাদের কাছে হতে পেলাম, আর প্রতিদানে কি দিলাম, শুধু প্রতারণা। তবে আমি যখন আমার সবই ছেড়ে দিয়েছিলাম, আমি যে তোমার আপন ভাগনী, তোমার সহোদর বোনের মেয়ে, একথা ও ভুলতে চেষ্টা করেছিলাম। তখন খাওয়া পরা খেলনা পুতুল গহনা এ সবের কথা কি করে মনে হবে? তুমি যে আমার মামা না হয়ে শোভনার মামা হয়েছিল, তাতেই আমার বেশী কষ্ট হয়েছিল, সে করে মাকে আমি আমি হারিয়েছি, মামাবাবু তোমাকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে কি সহজ!" রাজা বাহাদুর এতক্ষণ দুহাতে মুখ ঢেকে বসে ছিলেন, একে একে সব কথা তাঁর মনে

সুকোমল ওষ্ঠাধর, শুধু চোখের রং আর গায়ের বর্ণ একটু তফাৎ, তাই কি সব ভিন্ন হয়ে গেল? বাপের মত গায়ের বর্ণ, তাঁরি মত সোজা চুল, তাই কি সুরমার মেয়ে রইল না? সে কি অপর এক জন হল? কেমন করে এমন ভুল সম্ভব হল? মাথা নীচু করে বসে বিষণ্ণ মুখে তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে কেবলি সেই কথা ভাবতে লাগলেন! করুণা অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করে থেকে কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্লে, "শোভনা যে আপনাদের রাস্তা চেয়ে জেগে বসে আছে!"

রাজাবাহাদুর বল্লেন, "তাকে মার্জ্জনা করা সহজ নয়।"

রাণী ঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি বল্লেন, "আমি এখনই যাচ্ছি। আমি গিয়ে তাকে সব কথা বলব, করুণা তুমি যেখানে আছ, সেই খানেই থাক, আমি তোমাকে চাইনে! আমি যাকে আমার পালিত কন্যা করেছি, সেই আমার থাকবে, তোমার মামা যেমন ইচ্ছা করতে পারেন।" রাণী ঠাকুরাণী তখনি উপরে চলে গেলেন।

রাজাবাহাদুর অতি মৃদু স্নিগ্ধ সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "করুণা তুমি কি আমার ক্ষমা চাও?" করুণা মামার হাঁটু জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্লে, "মামাবাবু দয়া করে যদি ক্ষমা কর, কতবার তোমাকে সব কথা বলবার জন্যে আমার মন ব্যাকুল হ'ত, তোমাকে এমন করে প্রতারণা করছি, বলে আমার এমন ভয় হ'ত। দোষ করে পরে দুঃখ করায় কোন ফল নেই জানি, তবু আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।" রাজা বাহাদুর করুণাকে কোলের কাছে তুলে বসিয়ে বল্লেন, "আমি তোমায় ক্ষমা করলাম, রাণী যদিও শোভনাকে রাখেন, তোমাকে দেওয়ানজীর বাড়ী আবার ফিরে যেতে হয়, তা হলে তুমি যে আমার বোনের মেয়ে আমাদেরি করুণা, তার আর কোন বদলত হবে না, তবু আমি তোমার মামাই থাকব।"

করুণা মুখে হাসি চখে জল, মামার হাত ধরে বল্লে, "মামা বাবু, আমি সুখী হয়েছি, আমার আনন্দ হচ্ছে!"

"কেন তোমার আনন্দ হচ্ছে, করুণ মণি?"

করুণা মামার হাতের উপর মাথা রেখে সলজ্জ ভাবে বল্লে, "তোমায় যে আমি খুব ভাল বাসি। করুণার চোখের সেই সলজ্জ ভীরু স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মনের সব সন্দেহ অন্ধকার দূর হয়ে গেল। তিনি তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বসে রইলেন, কতক্ষণ যে, এমন ভাবে কেটে গিয়েছিল, কিছুই তাঁরা জানতে পারেন নি! কখন যে রাণী ঠাকুরাণী এসে দাঁড়িয়েছেন তাও বুঝতে পারেন নি।

কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখ দুটি রাঙা হয়ে ফুলে উঠেছিল, সুন্দর মুখখানি একেবারে মলিন হয়ে গিয়েছিল, রাজা বাহাদুরের হাত ধরে অশ্রু গদ গদ কণ্ঠে বল্লেন, "এস একবার উপরে চল, তাকে ক্ষমা কর, আজ যদি তাকে ক্ষমা না কর, তা হলে চিরকাল তোমায় অনুতাপ করতে হবে! করুণা ঠিক কথা বলেছে, তার উপর রাগ করবার আর অবসর নেই। ডাক্তার বাবু যে বল্লেন তার স্বর্গযাত্রার আর বিলম্ব নেই। মায়ের বিসর্জ্জনার বাদ্য বেজেছে, কোজাগর পূর্ণিমা সে আর দেখতে পাবে না, তাকে আমাদের ভাসিয়েই দিতে হবে।"

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

দয়াময়ী।

(গাথা)

১

গণেশ নামেতে ব্রাহ্মণ এক
আছিল কমল পুর
দীনতার সাথে কিবা যে সাধুতা
সম্বল সুমধুর!
দয়াময়ী তার রূপসী বালিকা
দীনের কুটীর আলো,
সারাটী গ্রামের হৃদয় মাণিক
সর্ব্বজনে বাসে ভাল!
সুদূর দেশের ধনবান এক
শুনি রূপ গুণ তার,

আপন তনয়ে পরিণয় দিয়ে
লয় গৃহে আপনার।
দয়াময়ী সেথা দয়া মমতায়
হরিয়ে সবার মন,
সুখের স্বপন এক খানি যেন
বিরচিল অতুলন!

২

একদা নিশায় ব্রাহ্মণীর সনে
বামন যুক্তি করে
আগামী বছর শরৎ বাসরে
জননী আনিবে ঘরে!
সারাটি বরষ করি প্রাণ পণ
জমাল তঙ্কা দশ,
এত কি হরষ পায় কোটি পতি
কুবেরে করিয়া বশ!
এল শারদীয়া, কুমারের ঘরে
গণেশ কহিল গিয়ে,
"মায়ের প্রতিমা গড়িয়ে দে ভাই,
আধুলিটী শুধু লয়ে!"
হাসিল কুমার বলিল, "ঠাকুর,
আধুলিতে কিবা কাজ,
দেবীর প্রতিমা গড়িয়া অমনি
দিব তোমা আমি আজ!"
নাহি মানে দ্বিজ, আধুলীটী দিয়ে
প্রতিমা আনিল ঘরে,
কত দিবসের কামনা সফল
সুখ আর নাহি ধরে!

৩

ব্রাহ্মণী কহে, "শুন হে ঠাকুর,
এক মা তো দয়া করি'
দীনের কুটীরে আসিলেন আজ,
আর মা কি রবে পড়ি'?
আমার দয়ারে, যাও আনিবারে,
মা যে গেছে বহু দিন,
আজও হাসি মাখা মুখখানি তার
মরমে বাজায় বীণ!"
কহিল বামন "আমিও যে তাই
ভাবিতেছি বারে বারে.
তাদের বাড়ীতে পূজা যে রয়েছে
আসিতে কি দিবে তারে?"
জননীর মন প্রবোধ না মানে
কহিল, "তথাপি যাও,
হয়ত বাছারে দিবে আসিবারে
সবিনয়ে যদি চাও!"

৪

উপনীত দ্বিজ বেহায়ের বাড়ী
রবি ধীরে ডুবে যায়,
শুষ্ক আনন মলিন বসন
ধূলি ধূসরিত কায়।
উৎসব গৃহে কত লোক জন,
কত কত দাস দাসী,
সঙ্কোচে দ্বিজ চারি ধারে চায়,
সারাদিন উপবাসী।
কিছুকাল পরে ধনী বৈবাহিকে
অদূরে হেরিয়া হায়,
সকল মনের আকুল বাসনা
নিবেদিল ধীরে তায়!
উচ্চে হাসিয়া কহে ধনীবর
"বিচিত্র সাধ বটে,
পাগল না হলে এমন বুদ্ধি
রবে আর কার ঘটে!
আপন বাড়ীর পূজাটী ফেলিয়া
বধূ কি পারিবে যেতে,
বুঝেছি ঠাকুর, ঘরে নাহি ভাত,
আসিয়াছ কিছু খেতে!"
ব্রাহ্মণ দুখে রাগে ম্রিয়মান
বাক্য নাহিক সরে,
দরিদ্রের সনে ধনীর মৈত্র
বিষম অবনী পরে।

৫

গণেশ ঠাকুর ফিরিছে কাঁদিয়া
আপন আবাস পানে,
এমন সময় দয়া দিল দেখা
কোথা হতে কেবা জানে!
পিতার গলাটী জড়ায়ে ধরিয়া
আঁচলে মুছায়ে আঁখি
কহে দয়াময়ী "বাবাগো কেঁদনা,
আমি কি সেখানে থাকি?
শত অনুনয়ে সবারে বুঝায়ে
আমি যে আসিনু চলি'
কত দিন গেল দেখি নাই মায়
চল ত্বরা কুতুহলি!"
বিস্ময়ে হায় পুলকে ঠাকুর
দয়ায় আশীষ করে,
মনে মনে নমে বিশ্ব-মাতায়
আঁখি দুটী আরো ঝরে!

৬

দীনের কুটীরে যদ্যপি নাহি
ধন জন কোলাহল,
বুকভরা তবু আছেতো ভকতি
নির্ম্মাল্য নিরমল!
পূজার প্রথম দুইটী দিবস
সেই পূত উপচারে
কাটিল হরিষে নবমীর দিন
দয়া কহে বারে বারে
বাবাগো "আজিকে বামন ভোজন
দিবার নিয়ম আছে।"
উত্তরে দ্বিজ "জননী অর্থ
কোথায় আমার কাছে!"
বালিকা না শুনে, সারাটী গ্রামের
সবারে ডাকিয়ে আনে,
ব্রাহ্মণ ভীত কুপিত অতি যে
খোঁজে দয়া কোন্‌খানে।

কাছে এসে দয়া হেসে বলে বাবা,
ভাবনা কিসের তরে,
যে জগৎ-মাতা খাওয়াবেন সবে
তিনি যে তোমার ঘরে।
তাঁহার প্রসাদে হবে কি অভাব,
তুমি শুধু হের বসে,
নিজ হাতে আমি দিব সবে তা'ই
দেখি আজ কেবা রোধে!"
নীরব ঠাকুর, উচ্চে বালিকা
সকলে ডাকিয়া কয়,
"দরিদ্র পিতা তুষিবে ফলারে
তেমন শকতি নয়!
তবু তোমাদের ডাকিয়া এনেছি
মহা প্রসাদের তরে,
এসগো হেথায় সবারে দিতেছি,
লওগো করুণা করে!"
দয়াময়ী সুখে নৈবেদ্য সবে
করে ধীরে বিতরণ,
স্বল্পে সবাই তৃপ্ত মহান্,
লভে বাস অতুলন!
বিস্মিত হয়ে আশীষ করিয়ে
সকলে ফিরিল গেহে;
মুগ্ধ গণেশ দাঁড়ায়ে তেমতি
কথাটী নাহিক কহে!

৭

সারা গ্রামময় বিজয়ার বাঁশী
উঠিল করুণে বাজি'
বরষের লাগি মায়েরে ছাড়িতে
কাঁদিছে পরাণ আজি!
গণেশ ঠাকুর দধি কড়মায়
রচি শেষ উপচার
নিবেদিতে মায় আসিল, বালিকা
সাথে সাথে রহে তার।

ধেয়ানে মগন ঠাকুর যখন
দয়াময়ী খায় সব,
মেলিয়া নয়ন কুপিত বামন
করে রোষে কলরব
কাঁদে দয়াময়ী বামনী আবার
দধিও কড়মা আনে,
উচ্ছিষ্ট পুনঃ করিল বালিকা
কিবা ছলে কেবা জানে !
গণেশ আগুণ, করে গালাগালি
দয়া শুধু মুছে আঁখি,
জননী আবার আন উপচার
লয় বালা আগে থাকি !
ব্রাহ্মণ আর না পারি সহিতে
বলে রোষে, "হও দূর !"
মায়ের আঁচল ধরে দয়াময়ী
কহে হেসে সুমধুর
"মাগো, তিন দিন উপবাসী আমি
এখনি যে হ'ত যেতে,
ক্ষুধা পেয়েছিল বড়ই আমার
তাই লেগেছিনু খেতে !
পিতা রাগ ভরে দিলা দূর করে
এবার তবে মা, যাই।"
সস্ত্রীক দ্বিজ বিস্ময়ে হেরে
দয়াময়ী সেথা নাই !
বৈবাহিক গৃহে ছুটিল ঠাকুর
ভুলি সব অপমান,
কোথা দয়াময়ী শুধায় আকুলি
হারায়ে সকল জ্ঞান !

দয়া ধেয়ে আসি নমিল জনকে
জড়ায়ে তাহারে বুকে
"কেমনে মা ফেলি' আসিলি আমায়"
বামন বলিল দুখে !
বিস্মিতা দয়া না পারে বুঝিতে
পিতা যে কহেন কিবা,
উত্তরে কহে "আমি তো এখানে
রয়েছি রজনী দিবা !
তোমার সেখানে যাতায়াত মোর !
কি কহ বুঝিতে নারি !"
ব্রাহ্মণ রহে স্তব্ধ হইয়ে
ঝরে পড়ে আঁখি বারি !
কিছু কাল পরে সংজ্ঞা লভিয়া
আবেগে যুক্ত করে
কহিল ঠাকুর ঊর্দ্ধে চাহিয়া
বিষাদ কাতর স্বরে
"অয়ি দয়াময়ী, বিশ্ব-জননী,
অবোধ তনয় সনে
তিন দিন ধরি একি গো চাতুরী
করিলি মা, অকারণে।
যদি কৃপা করে অধমের ঘরে
দিলি মা চরণ ধূলি,
'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকলি আমারে
সকল মহিমা ভুলি'
তবে গো মা কেন অন্ধ নয়ন
ফুটায়ে দিলি না মোর,
ধন্য হইত এ ছার জীবন
নিরখি ওরূপ তোর !"

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

———

সান্ত্বনা।

ওরে আমার সোণার মাণিক,
ওরে আমার চাঁদ,
কে বকেছে, কে মেরেছে,
গায় দিয়েছে হাত ?
এমন করে আমার চাঁদ
কাঁদছে কেন হায়,
চুমো খাব, বুক জুড়াব
আয় রে কোলে আয়।
আমার চাঁদে যে কাঁদালে
তাকে ধরে নিয়ে,
তাহার কনের সাথে দিব
আমার চাঁদের বিয়ে।
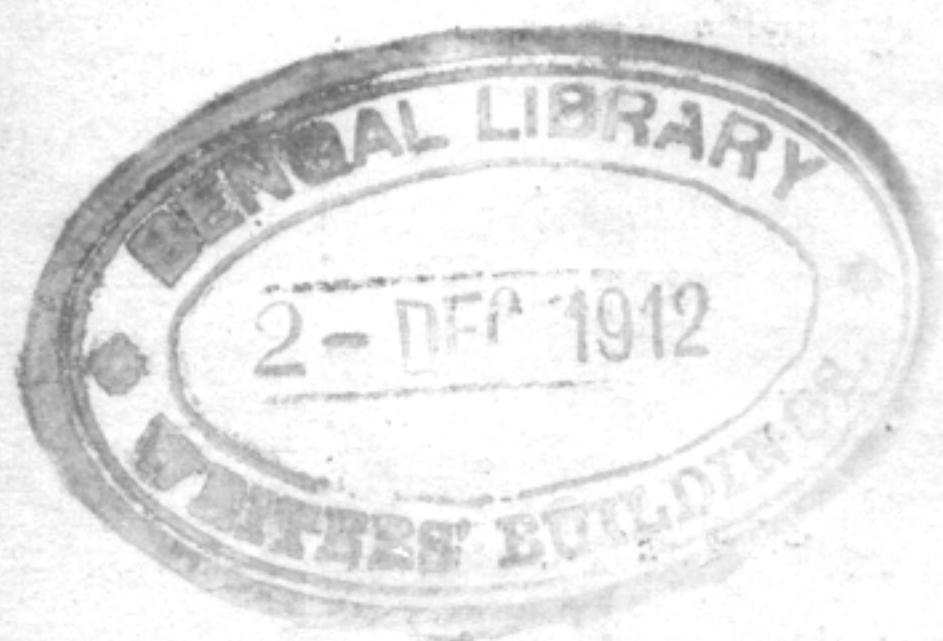
বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থানাভাবে ধাঁধার উত্তর ও নূতন ধাঁধা প্রকাশিত হইল না।
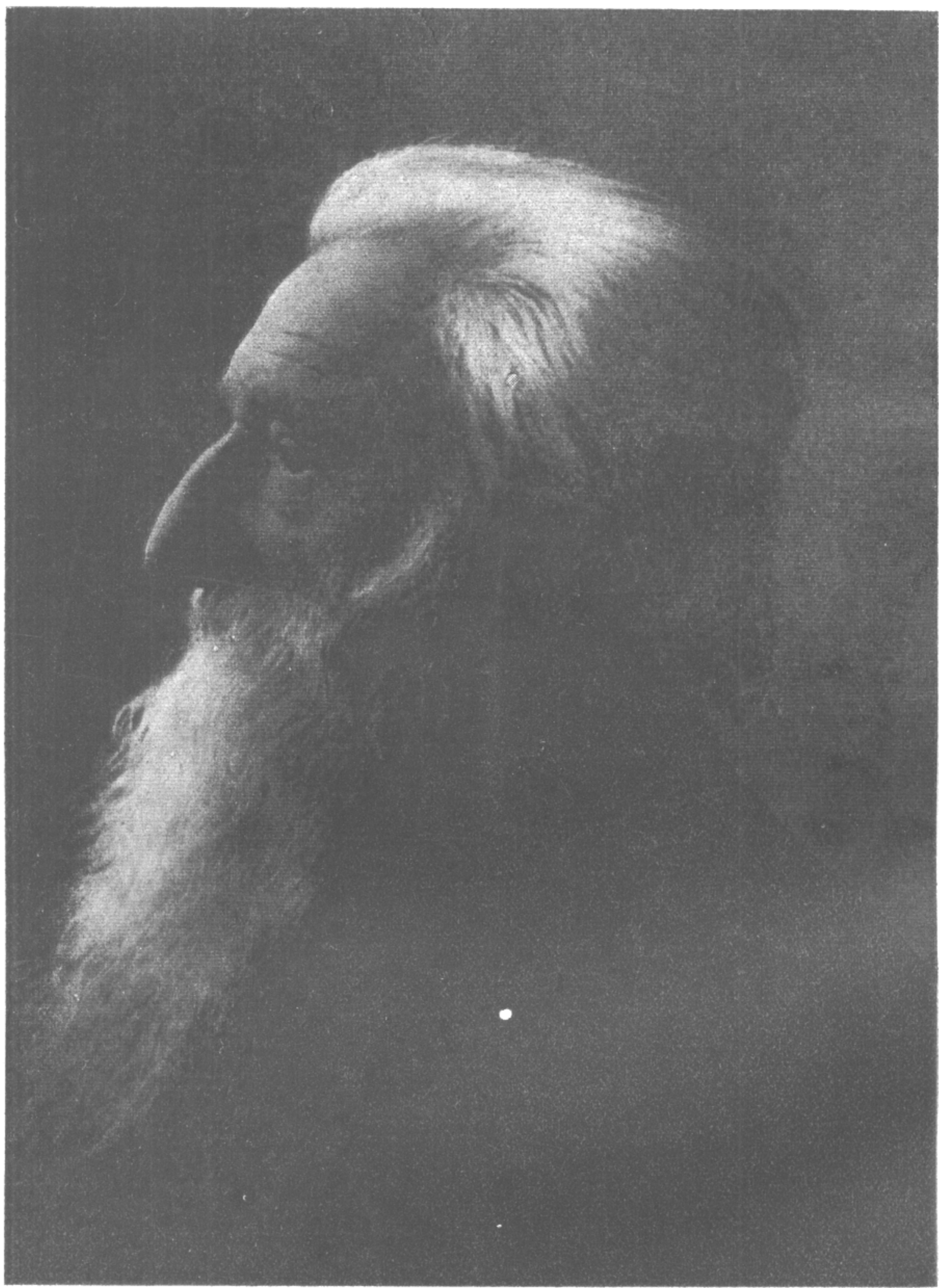
জেনারেল বুথ।

অগ্রহায়ণ।

১৮শ বর্ষ]　　১৩১৯　　[৮ম সংখ্যা

জেনারেল বুথ।

মানবজাতির ইতিহাস পড়িতে পড়িতে সময়ে সময়ে মনে হয় প্রাচীনকালে যেমন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিতেন, এখন বুঝি তেমন হয় না। সেকালে এক একজন সাধু জগতে কি আশ্চর্য্য কার্য্যই করিয়াছিলেন; তাঁহাদের উপদেশে হাজার হাজার লোক পাপ দুর্নীতি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে মহাত্মা বুদ্ধদেবের জীবনে দেখা যায়, যে তিনি যখন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অল্পদিনের মধ্যে হাজার হাজার নরনারী সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া নগ্নপদে একবস্ত্রে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কত ধনী আপনার সমুদয় সম্পত্তি ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কত যুবক, কত পদস্থ লোক সংসারের সুখৈশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন। প্রাচীনকালের অন্যান্য

ধর্ম্মের ইতিহাসেও এইরূপ দেখা যায়। মধ্যযুগে ইউরোপে এই শ্রেনীর অনেক সাধুর বিবরণ পাঠ করা যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইটালী দেশে সেণ্ট ফ্রান্সিস নামে এক সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে হাজার হাজার নরনারী কঠোর দারিদ্র্য স্বীকার করিয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সকল সাধুদের কি এক আকর্ষণী শক্তি ছিল, যে দুই চারি বৎসরের মধ্যে হাজার হাজার লোক ইঁহাদের আহ্বানে অদ্ভুত ত্যাগশীলতা দেখাইয়াছিলেন। অনেক সময় মনে হয়, এখন বুঝি আর তেমন বিশ্বাস, তেমন বৈরাগ্য হয় না। প্রাচীনকালের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অতিকায় জন্তুর মত, এই প্রকার মহাপুরুষের বংশও লোপ পাইয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইংলণ্ডে এক জন অদ্ভুত ধর্ম্মপরায়ণ সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার জীবন সেকালের মহাপুরুষদের কথা মনে পড়ে। তাঁহার নাম জেনারেল বুথ। ইনি দরিদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের প্রতিভাগুণে যে মহাকার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার তুলনা কেবল প্রাচীনকালের সাধুদের জীবনেই পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু যদি এই প্রশ্ন করা যায়, যে কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের দুঃখ দূর করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয় সকলেই জেনারল বুথের নাম করিবেন। তিনি কত নর নারীকে পাপের জীবন হইতে উদ্ধার করিয়া সৎপথে আনিয়াছিলেন, কত দুর্ভাগ্য অনাথকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, কত দরিদ্রের জীবনোপায় করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহার জীবন দেখিয়া মনে হয়, বিশ্বাসের যুগ, ত্যাগের যুগ এখনও আসিতে পারে।

১৮২৯ সালে ইংলণ্ডে নটিংহাম সহরে এক দরিদ্র পরিবারে জেনারেল বুথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গৃহ নির্ম্মাণের কাজ করিতেন। স্বীয় পরিশ্রমে সামান্য যাহা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। দারিদ্র্য বশতঃ উইলিয়ম বুথকে বাল্যবয়সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। এই সময়ে তিনি অসৎসংসর্গেও পড়িয়া যান। অতিশয় শোচনীয় অবস্থার মধ্যে উইলিয়মের জীবন আরম্ভ হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাঁহার জীবনে এক পরিবর্ত্তন আসে। তিনি অনুভব করেন যে এই ঘৃণিত জীবন তাঁহার জন্য নহে; ইহাতে তিনি কখনই সুখী হইতে পারিবেন না। অনেক চিন্তা ও সংগ্রামের পর তিনি ধর্ম্মপথে চলিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইলেন। এই সময়ে আমেরিকার এক জন ধর্ম্মপ্রচারক নটিংহাম নগরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ উইলিয়ম বুথের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। উইলিয়ম অনুভব করিলেন, যে তিনিও এই প্রকারে সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পনর বৎসর। উইলিয়ম, নটিংহাম সহরের যে অংশে দরিদ্র লোকের বসতি, সেখানে গিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া বাইবেল পাঠ করিতেন; তাঁহার কয়েকজন ধর্ম্মপ্রাণ সঙ্গী তাঁহাকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া দরিদ্র লোকদের বাড়ীতে এবং মাঠে উপাসনা করিতেন, পীড়িত লোকদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন, এবং রবিবারে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে যাইতেন। বাল্যকাল হইতেই বুথের জীবনে তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। দরিদ্র এবং দুর্ভাগ্যদের সহিত তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল।

এদিকে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য উইলিয়মকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইতেছিল। ১৮৪৯ সালে কুড়ি বৎসর বয়সে চাকরীর সন্ধানে উইলিয়ম নটিংহাম পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডনে আসেন। লণ্ডনে তিনি এক আফিসে কেরাণীর কাজ পান। সারাদিন আফিসে কাজ করিয়া সন্ধ্যাকালে সমুদয় অবসর সময় তিনি ধর্ম্মকার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। উইলিয়মের পিতা চার্চ্চ অব ইংলণ্ডের সভ্য ছিলেন; কিন্তু অল্পবয়সেই উইলিয়ম মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; চার্চ্চ অব ইংলণ্ডের নিয়মে বাঁধা উপাসনায় উইলিয়মের তৃপ্তি হইতনা। তাঁহার

ব্যাকুল প্রাণ মেথডিষ্টদের উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা ও সঙ্গীতে অধিক আনন্দ পাইত। মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া উইলিয়ম বুথ লণ্ডনের দরিদ্র পল্লীতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যে সকল দরিদ্র লোক কখনও ধর্ম্মমন্দিরে যাইত না, বা যাইতে সাহস করিত না, উইলিয়ম রাস্তার ধারে তাহাদের মধ্যে গিয়া ধর্ম্মের উপদেশ দিতেন।

ক্রমে উইলিয়ম বুথ আপনার সমগ্র শক্তি এবং সময় ধর্ম্মকার্য্যে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তিনি চাকরী পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম যাজকের ব্রত গ্রহণ করিতে সংকল্প করিলেন। বুথ প্রথমে কংগ্রিগেশনাল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজক মণ্ডলীতে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে ১৮৫২ সালে উইলিয়ম বুথ মেথডিষ্ট নিউ কনেকসন নামক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ধর্ম্মযাজক ব্রতে গৃহীত হন, এবং কিছুকাল শিক্ষাধীন থাকার পরে ধর্ম্মাচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হন। ইহার তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি ক্যাথারাইন রমফর্ড নাম্নী এক জন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; সৌভাগ্যক্রমে এই রমণী সর্ব্বপ্রকারে জেনারেল বুথের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। তিনি এই সময় স্বামীর সাধু আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ সহানুভুতি করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং উত্তর কালে তাঁহার সকল কার্য্যে সহকারিণী হইয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রী ঈশ্বরের সেবার জন্য প্রফুল্লচিত্তে দারিদ্র্য দুঃখ বহন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তাঁহাদের সম্মুখে আর এক পরীক্ষা উপস্থিত হয়।

কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রথমে তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া যে সকল লোক ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন, কখনও ধর্ম্মমন্দিরে পদার্পণ করে না, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার দিয়াছিলেন। বুথ এই শ্রেণীর কাজই ভাল বাসিতেন। প্রথম হইতেই পতিত পাপীদের জন্যই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাহাদিগকেই ধর্ম্মের পথে আনিবার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা কিছু দিন পরে তাঁহাকে একটী ধর্ম্ম মন্দিরের স্থায়ী আচার্য্যের পদে নিযুক্ত করেন। সাধারণতঃ লোকে এইরূপ পদই প্রার্থনা করে, কারণ তাহাতে অল্প পরিশ্রম এবং বিশেষ কোনও কষ্ট বা ত্যাগ নাই। বুথ এ কাজ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার প্রাণ দরিদ্র পল্লীতে যইয়া, পাপী, দুর্ব্বৃত্ত উচ্ছৃঙ্খল, মাতাল প্রভৃতিকে ঈশ্বরের নামে ডাকিয়া সাধুতার পথে আনিবার জন্য ব্যাকুল। এ কাজে অর্থ নাই, সামাজিক সুখ সুবিধা নাই, মান নাই; অপরদিকে বিপদ আছে, অজস্র শ্রম করিতে হয়। তবু তিনি এই কাজই করিতে চাহিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার এ প্রার্থনা শুনিলেন না। তখন বুথের সম্মুখে একটী কঠিন সমস্যা আসিল; তিনি যদি কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুসারে না চলেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান থাকে না, অপরদিকে তাঁহাদের কথা শুনিলে যে কাজের জন্য তিনি আহুত হইয়াছেন তাহা হয় না। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে তিনি প্রকৃত খৃষ্ট শিষ্যের মত কল্যকার চিন্তা না করিয়া ভগবানের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই সঙ্কটকালে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সংকল্পের অনুমোদন করিয়াছিলেন। অসহায় বুথ দম্পতী পথে দাঁড়াইলেন; তাঁহারা কি খাইবেন, কোথায় থাকিবেন, তাহার সংস্থান নাই, ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্যও একটী স্থান নাই। তখন তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে প্রতিদিন চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দুঃখী, দরিদ্র, পাপীদিগকে ঈশ্বরের নামে সাধুতার পথে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। যেখানে যান এই শ্রেণীর লোক আগ্রহের সহিত তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন, এবং অনেকে অশ্রুজলে ভাসিয়া বহুদিনের পাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করতঃ নূতন জীবনের পথে অগ্রসর হইতে সংকল্প গ্রহণ করিতে লাগিলেন। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যে যাহা দান করিতেন, তাহাতেই কষ্টে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। এই রূপে ধীরে ধীরে তাঁহার কার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে লণ্ডনের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত দরিদ্রপল্লী তাঁহাদের

কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া বুথ দম্পতী সেখানে আসিয়া ইষ্ট লণ্ডন মিশন নামে একটী প্রচার সমিতি স্থাপন করিলেন। ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক লোক তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন; অবশেষে ১৮৭৮ সালে ইষ্ট লণ্ডন মিশন এর নাম Salvation Army বা মুক্তি ফৌজে পরিবর্ত্তিত হইল, এবং বুথ জেনারেল নাম গ্রহণ করিলেন। অনেক লোকে তাঁহাকে কত উপহাস বিদ্রূপ নির্য্যাতন করিয়াছে। কিন্তু পদে পদে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এখন মুক্তি ফৌজ জগতের সর্ব্বত্র আপনার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। মুক্তি ফৌজের সাহায্যে সহস্র সহস্র নরনারী দারিদ্র্য দুঃখ, দুর্নীতি, পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দ ও সাধুতার জীবন যাপন করিতেছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ইঁহারা নানা সৎকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। দরিদ্রের সাহায্য, রোগীর সেবা, অশিক্ষিতের শিক্ষা দান, পাপীর পরিত্রাণ পতিতের উদ্ধারের জন্য নানাস্থানে নানা প্রকারের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। লণ্ডনের মত জনাকীর্ণ স্থানে যেখানে হাজার হাজার নরনারী অর্থ ও আশ্রয় অভাবে অনাহারে পথের ধারে দারুণ শীতে পড়িয়া থাকে, মুক্তিফৌজ দরিদ্র লোকদের জন্য আহার ও শয়নের স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সেখানে অতি সামান্য ব্যয়ে দরিদ্র লোকেরা পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া নিদ্রা সুখ উপভোগ করিতে পারেন। মুক্তিফৌজের 'পেনি ডিনার" ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রদের যে কি কল্যাণ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। দরিদ্র শ্রমজীবী সারাদিনের পরিশ্রমের পরে এক পেনি দিয়া পুষ্টিকর সুখাদ্য ভোজন করিয়া পরিতোষ লাভ করিতেছে। যে সকল লোকেরা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কাজ পাইতেছে না বা কঠোর পরিশ্রম করিয়াও জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিতেছে না, মুক্তিফৌজ তাহাদিগকে কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে, যেখানে এখনও হাজার হাজার বিঘার উপর জমি পড়িয়া রহিয়াছে, এবং যে কেহ অল্প পরিশ্রমে সুখে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, লইয়া যাইতেছেন; ঘরবাড়ী জমি প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিতেছেন। এই উপায়ে নূতন দেশে শত শত সুখের পরিবার স্থাপিত হইয়াছে। মুক্তিফৌজের চেষ্টায় বহুসংখ্যক মাতাল পুরুষ ও স্ত্রী, অশেষ দুর্গতির কারণ দুর্দ্দমনীয় ঘৃণিত পানাসক্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পানাসক্তি ছাড়াইবার জন্য মুক্তিফৌজের লোকেরা স্থানে স্থানে সংশোধনাগার স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা কারাগারে গিয়া কয়েদী-দিগকে সদুপদেশ দেন, এবং কারামুক্তির পরে তাহাদিগকে সৎপথে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেন। পতিতা স্ত্রীলোকদিগকে পাপের পথ হইতে উদ্ধার করিয়া পবিত্র জীবন যাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। অশিক্ষিত জাতি সকলের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্য অনুষ্ঠানের দ্বারা মুক্তি ফৌজ মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন। জেনারেল বুথ এই সকল সৎকার্য্যের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। আর এক জন লোকের দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে এত অধিক হিত কার্য্য হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সুদীর্ঘ জীবন পরের সেবাতে অতিবাহিত করিয়া সম্প্রতি জেনারেল বুথ পরলোকে গমন করিয়াছেন তিনি মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত অদম্য উৎসাহে মুক্তি ফৌজের কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধাবস্থায়ও তিনি পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা উপদেশাদি দ্বারা লোককে উৎসাহিত করিতেন। বার্দ্ধক্যে তাঁহার মনের উৎসাহ ও উদ্যমের কিছু মাত্র হ্রাস দেখা যায় নাই। বাস্তবিকই জেনারেল বুথ বর্ত্তমান সময়ের এক জন মহাপুরুষ ছিলেন।

অনাথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সবে মাত্র বসন্ত যখন অশোক চম্পক শিরীষে প্রকৃতির অঙ্গরাগ আরম্ভ করেছে, অলকে আম্র মুকুল দুলিয়ে দিচ্ছে, আকাশ সূর্য্য কিরণে উজ্জ্বল, বাতাস অতি স্নিগ্ধ কোমল, সেই সময়ে তাঁর বিস্তৃত বক্ষে দূর্ব্বা শ্যাম প্রান্তরে ছায়া প্রসারিত করে কোন অতিথি দেবদূত এসে উপস্থিত হলেন। রাজবাটীর নিভৃত কক্ষে চারিটি ভাই বোনে মিলে পৃথিবীতে যেখানে স্বর্গ রচনা করে সুখে শান্তিতে

ছিল, তারি মধ্য হ'তে একটিকে নিয়ে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন, নিমেষেই জীবনের নন্দনবন শূন্য শ্রীহীন হয়ে গেল।

রাণী ঠাকুরাণী আর করুণা স্বভাবের সব বিভিন্নতা বিসর্জ্জন দিয়ে অভিন্ন হৃদয়ে প্রাণ প্রিয় শোভনাকে কেমন করে মৃত্যুর হাত থেকে, চির বিচ্ছেদের মুখ হতে রক্ষা করবেন, প্রাণপণে তারি চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের দিনে নিয়মিত আহার ও রাত্রিতে বিশ্রাম ছিল না। শোভনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তাঁরা নিজের সব আবশ্যক আরাম ভুলে গিয়েছিলেন। একটিবার ভুলেও কেউ তাকে কোন তিরস্কার করেননি, কিম্বা অযত্ন প্রকাশ করেননি, করুণা যখনি সেই কথা স্মরণ করত, তখনি তার সমস্ত মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠ্‌ত। ননীর পুতুল মত চির আদরের শোভা শেষ পর্য্যন্ত তার সেই অধিকার অক্ষুন্ন রেখেছিল। যেদিন হতে ডাক্তার বাবু হঠাৎ হাত তুলে ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে রাণীঠাকুরাণীর উত্তেজিত কথা বার্ত্তা, চঞ্চল চলা ফেরা বন্ধ করেছিলেন, সেই দিন হতেই শোভনার অসুখের কষ্ট দিন দিন বেড়ে চল্‌তে লাগল। যখন সকলেই বুঝলেন, ফুলের মত সুকুমার এই জীবন অধিকদিন আর রক্ষা হবার নয়, তখন কি করে তাকে দ্বিগুণ আরামে আদরে রাখা যায়, তারি জন্যে সকলের আগ্রহ বেড়ে গেল। শোভনার শারীরিক দুর্ব্বলতা দিন দিন যত অধিক হল, তার সৌকুমার্য্য যখন ক্রমে শীর্ণ ক্ষীণতায় পরিণত হল, তখনও তার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হলনা। সে তেমি অভিমানী, আদর-কুড়ান, ক্ষণে উচ্ছ্বসিত ক্ষণে বিষণ্ণ প্রকৃতিরই রয়ে গেল। কেবল আদর যত্ন; সুন্দর সামগ্রী, সুগন্ধ দ্রব্য, পুতুল খেলনা পেলেই সে সন্তুষ্ট থাকত। রাজা রাণী দুজনেরি খুব ইচ্ছা ছিল তাকে অধিক-তর স্বাস্থ্যকর কোন জায়গায় বায়ু পরিবর্ত্তন করতে নিয়ে যান। কিন্তু তার নিতান্ত ক্ষীণ অবস্থা দেখে ডাক্তার বৈদ্যরা সে প্রস্তাবে বাধা দিলেন; বল্লেন, এসময় অন্যত্র গেলে পথের কষ্টে উপকার না হয়ে সমূহ অপকার হবে, কাজেই কোথাও আর যাওয়া হলনা। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে তাঁরা আসন্ন দিনের প্রতীক্ষা করে রইলেন। সব যত্ন সব চেষ্টা সব আগ্রহ বেদনা ব্যর্থ করে দিয়ে অকস্মাৎ সেই দিন এসে উপস্থিত হ'ল। বীরেন আর খুকু তখনি সকালে বাগানে বেড়িয়ে ফিরে আসছে; তাদের সুগোল নিটোল গাল দুটি স্বাস্থ্যের আনন্দে আপেল ফলের মতন রাঙা হয়ে উঠেছে মুখ ভরা হাসি, চোখ ভরা আলো হাত ভরা ফুল নিয়ে তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সেই ফুলের রাশ শোভার হাতে দিয়ে সঙ্কুচিত ভাবে তার মুখে চুমো খেয়েছে। করুণা কত যত্নে শোভনার রেশমের গুচ্ছের মত অতি নরম চুলের রাশি চিরুনী দিয়ে পরিষ্কার করে তার মুখ হাত ধুইয়ে মুছিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। এমন সময় তার পাণ্ডু সুকুমার মুখ যেন হঠাৎ পাংশু হয়ে গেল, ভোরের আলোতে ও পদ্মের দলের মত সুন্দর চোখ দুটি যেন নিদ্রার ভারে শ্রান্তিতে ঢলে পড়ল। তখনও সে বুকের কাছে ভাঙ্গা পুতুলটি ধরেছিল; তার পাণ্ডু গণ্ডের পাশে পুতুলের লাল টক টকে মুখ আরো অধিক রাঙা আর বিসদৃশ দেখাতে লাগল। বহুকাল পরেও করুণা যখন সে কথা ভাবত, তখন তার মনে পড়ত, গুরুমা সারারাত্রির জাগরণে ক্লান্ত ভাবে হাঁই তুলতে তুলতে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে একবার সেই মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে চমকে যেন জেগে উঠলেন, আর তখনি দৌড়ে গিয়ে রাণী ঠাকুরাণীকে ডেকে নিয়ে ফিরে এলেন। রাণী মামী বিছানার পাশে হাঁটু পেতে স্বপ্নাবিষ্টের মত বারম্বার বলতে লাগলেন "এমন করে না যাদু, এমন ঘুমিয়ে নয় মণি, একবার একটি কথা বলে যাও ধন!" করুণা তখনি সব বুঝতে পেরে আর্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করে বোনের পাশে গিয়ে আছড়ে পড়ল সেই পরিচিত কণ্ঠ স্বরের ব্যথিত শব্দে শোভনা একবার অতি ধীরে চোখ দুটী মেললে, হেসে আশ্চর্য্যি হয়ে বল্লে, "আমিত খুব ভাল আছি।"

নীচে রাজামামার সঙ্গে বীরেনের খেলার আওয়াজ গানের সুর সব স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। বাগানের সুরকির উপর দিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে বীরেন গাইলে

আজকে শুধু খেলব মোরা

করব মোরা গান।
কালকে যদি ইচ্ছে হয়
করব অভিমান!

শোভনার চোখে হাসির উজ্জ্বলতা ক্রমে মিলিয়ে এল. করুণা তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে শুনলে, সে অতি নিদ্রা-শ্রান্ত মৃদু স্বরে বলছে "দিদু, আমার সোণা, তবে আমি ঘুমাই।"

উপসংহার।

এখনও যদি তোমরা কেউ রাজাবাহাদুরের সেই পল্লী গ্রামে যাও তবে একজন ভদ্র মহিলাকে দেখতে পাবে তাঁর প্রথম যৌবনের উজ্জ্বল লাবণ্য, আর সেই তাঁর প্রশান্ত শুভ্র মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর দৃষ্টি, প্রশস্ত প্রসন্ন ললাট দেখে তাঁর পরিচয় তাঁর জীবনের রহস্যকথা জানবার জন্য সকল অপরিচিত লোকের বিশেষ কৌতুহল হয়। ইনি আর কেউ নন, আমাদের পরিচিত দয়ার প্রতিমা সেই করুণা। তার শিশু জীবনের নিঃস্বার্থ সেবার কথা তোমরা সবাই জান। এখনও সেবাধর্ম্মেই জীবন উৎসর্গ করেছেন। বৃদ্ধ মাতুলকে ছেড়ে যেতে হবে বলে আত্ম সুখ ভুলে বিবাহ করেন নি। শোভনার মৃত্যুতে রাণী ঠাকুরাণীর মনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, অল্পদিনের মধ্যে উর্ম্মিলা সেই স্থান অধিকার করে পরিপূর্ণ করে দিলে। সে দিনে দিনে যেমন শরীরে তেমি স্বভাবে সুন্দর হয়ে উঠেছিল। এক জন এমন সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে যে, যে পিসিমা নিস্তার ঠাকুরাণী একদিন তাদের বিদায় করে শান্ত হয়ে ছিলেন, তিনিই তাকে ১৫০০ টাকার কোম্পানী কাগজ ভাঙ্গিয়ে একটি সুন্দর গহনা কিনে উপহার দিয়ে তবে ক্ষান্ত হলেন। আজকাল কার দিনে উর্ম্মিলার মত সুন্দরী পাওয়া যায়না, কেউ তাকে লক্ষ্মীসরস্বতী কেউ বা তাকে রাজ রাজেশ্বরী অন্নপূর্ণার সঙ্গে তুলনা করেন। যথার্থই তার সৌন্দর্য্যে পৃথিবীর কোন মলিনতা ছিলনা, তার মনে দেবলোকের মাধুরী বিরাজ করিত।

বীরেন বাবু আজ একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার। ছেলে বেলায় রাণীর ঘর বাঁধতেই যাঁর অধ্যবসায় দেখা যেত, খেলার ইট পেলে আনন্দের পরিসীমা থাকৃতনা, আজ তাঁরি আদেশে কত রাজ প্রাসাদ গড়ে উঠছে তার ঠিক নেই। বীরেনও পিসিমার মন হরণ করেছিলেন; তবে কেমন করে এমন দুঃসাধ্য সাধন হল, তা সে নিজে কিছু জানতনা, জান্‌বার চেষ্টা ও করেনি, কেননা সে আপনার সম্বন্ধে চিরকালই অবোধ ছিল। পিসিমা এখনও সেই বামন দি দিকে বিদায় করবার ব্যর্থ চেষ্টায় দিন যাপন করছেন। বড়মার বয়স বীরেনের ছেলে বয়সেই তার গণণা শক্তির অতীত ছিল, এখন তো গাছ পাথরেও শেষ হচ্ছেনা। তবু ও অন্য বিষয়ে তাঁর যতই বিস্মৃতি হউক বীরেন সম্বন্ধে তিনি খুব সজাগ ছিলেন। বীরেন এখন ছফুট লম্বা কবাট—সে প্রকাণ্ড বীর পুরুষের মত বেড়ে উঠেছে, কেবল চোখ দুটি এখনও সরল শৈশবের কোমল মাধুরী ছাড়াতে পারেনি, আর মন খানি তার খাঁটি সোণা। রাজ বাড়ীর বৃহৎ উদ্যানের নিভৃত কোণে ক্ষুদ্র একটি সমাধি মন্দির আছে; বেড়ে উঠা ভাই বোনদের চোখে সেটি বড়ই ছোট মনে হয়। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসে, তারা সেটি ভাল করে দেখতেই পারনা। সেই খানে সুষমার অনুপম মূর্ত্তি, বহুযত্নের চঞ্চলা শোভনা চির নিদ্রায় শান্তি লাভ করেছে। তার দেহের শেষ ভস্ম লেশটুকু এই খানেই প্রোথিত করে রাজা বাহাদুর একটি শুভ্র মর্ম্মর মন্দির নির্ম্মাণ করে দিয়েছেন। সেইখানে প্রতিদিন পুষ্পপাত্রে ফুল আর ধূপ দানে ধূপ জ্বালিয়ে রেখে আসা হয়। সন্ধ্যায় একটি গন্ধদীপ উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

কত ফুল প্রভাতের বনে ফুটে উঠে যারা মধ্যাহ্নের উগ্রতাপ কিম্বা শীতের তীব্র হিম সহ্য করতে পারেনা। অসময়ে দিন সম্পূর্ণ হবার আগেই ঝরে পড়ে যায়। কত সুকুমার প্রকৃতি দেখা দেয় তাদের উপর গুরুমহাশয়ের কঠিন শাসন সয়না, দুঃখ বিপদের আঘাতে যারা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, অথচ গোপন মনের ভিতর দিব্য শক্তি একেবারে নষ্ট হয়না, তারি বলে একদিন জেগে উঠে সবভুল ভ্রান্তি দোষ পাপ ক্ষালন করে চলে যায়।

অতি শিশুকালেই শোভনার মৃত্যু হইয়াছিল ভ্রান্তি

তাহাকে স্পর্শ করেও অধিকার করতে পারেনি। আনন্দ উজ্জ্বল চোখ দুটী শৈশবের নির্ম্মল আকাশের ছায়াতেই মুদ্রিত হয়ে গেল, সংসারের মোহ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন প্ররোচনায় কে আর তাকে জাগ্রত করতে চায়!

করুণা এখনও সেই স্বপ্নমুগ্ধ, স্বর্গ-সন্ধানী প্রাণ, এখনও নিঃশব্দে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করেই চলেছে। ছেলে বেলায় ছোট ভাই বোনের ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে, তাদের সব অভাব পূরণ করে আরাম দিয়ে সন্তুষ্ট মনে দিন কাটাত। এখন সে সব বিষয়ে তার শ্রদ্ধাভাজন মাতুলের দক্ষিণ হাত, প্রধান সহায়।

নভেল নাটকের নায়িকা হতে পারে এমন গুণ তার নেই সত্যি, নূতন বন্ধু সে বড় একটা সংগ্রহ করতে পারে না, চেষ্টাও করে না; কিন্তু যারা তার প্রিয় তাদের জন্যে সে অকাতরে দিনের পর দিন আহ্লাদিত মনে পরিশ্রম করে যায়, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করতেও অসম্মত নয়।

রাজাবাহাদুর কেবল জানেন সে কি অমূল্য রত্ন। তার অজস্র স্নেহ, অশ্রান্ত সেবা, অনন্ত সহানুভূতি তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন।

আর সকলের মনে শোভনার স্মৃতি ক্ষীণ অস্ফুট হয়ে গিয়েছে সেই কেবল তাকে ভুলতে পারেনি। তার স্মরণ কখনো ছায়াচ্ছন্ন হয় না, কখনো কল্পনায় পরিণত হয় না, তার কাছে স্মৃতি একেবারে জাগ্রত জীবন্ত সত্য, সে জানে দেবদূততুল্য নিরুপম সুন্দর সেই তার ছোট বোনটী এখনও নীরবে দুই হাত প্রসারিত করে তাকে স্বর্গের অনন্ত আনন্দলোকে আহ্বান করছে। (সমাপ্ত)

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ইতর প্রাণীর ভাষা।

যাঁহারা যত্ন সহকারে ইতর প্রাণীদিগের কার্য্য প্রণালী লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে সকল প্রকার জন্তুই কোন না কোন উপায়ে পরস্পরের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করে। জন্তুগণের মধ্যে সর্ব্বনিম্ন পতঙ্গ জাতির ভিতরও এই মনোভাব প্রকাশের শক্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পতঙ্গগণের যে সকল শব্দ আমরা সচরাচর শুনিতে পাই, তদ্দ্বারা যে ইহারা মনোভাব প্রকাশ করে, এরূপ মনে হয় না। উহারা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা পরস্পরকে নীরবে যে ইঙ্গিত করে, তাহাতেই উহাদের মনোভাব ব্যক্ত হয়; এইরূপ দেখা যায় যে, পিপীলিকা ও মক্ষিকাগণ কেবল পরস্পর শুণ্ড ঘর্ষণ দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করে। এই শুণ্ড এইরূপে নির্ম্মিত, যে সামান্য স্পর্শেই ইহা দ্বারা ভাবের উপলব্ধি হয়।

পিপীলিকাগণ কিরূপে সংবাদ আদান প্রদান করে, ফ্রাঙ্কলিন তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলেন। তিনি তাকের উপর এক পাত্র গুড় রাখিয়াছিলেন। পিপীলিকারা তথায় উপস্থিত হইয়া মহা সুখে তাহা খাইতেছিল। ফ্রাঙ্কলিন দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। তৎপরে গুড় ভালরূপে রক্ষা করিবার জন্য এক গাছি দড়ি দিয়া পাত্রটী কড়িতে ঝুলাইয়া দিলেন। ঘটনাক্রমে একটী পিপীলিকা সেই গুড়ের পাত্রে ছিল। অল্পক্ষণ পরে সে পাত্রটী ত্যাগ করিয়া দড়ি ও ছাদ অতিক্রম করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে এক বড় পিপীলিকার সারি গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া ছাদ ও দড়ি বাহিয়া ঐ গুড়ের পাত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আগ্রহ সহকারে খাইতে লাগিল। এক দলের খাওয়া শেষ হইলে অন্য দল আসিতে লাগিল। এইরূপে গুড় নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দড়িতে পিপীলিকা শ্রেণী ক্রমাগত দলে দলে উঠিতে ও নামিতে লাগিল।

কার্ব্বি ও স্পেন্‌স নামক দুই জন প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছেন, যে প্রাণিগণের ভাষা আছে। তাঁহারা বলেন, যদি তুমি তোমার কক্ষের ভিতর পিপীলিকার বাসায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটীর টুকরা ছড়াইয়া দাও, তাহা হইলে উহাদের যে ভাষা আছে, এবিষয়ের প্রমাণ পাইবে। পিপীলিকাগণ

শীঘ্র বাসার উপযোগী স্থান আবিষ্কারের জন্য বিভিন্ন পথ গ্রহণ করিয়া এক এক জন এক এক পথে চলিবে। যেই কোন এক পিপীলিকা ঘরের মেঝেতে এমন এক ফাটল দেখিতে পায় যাহার ভিতর দিয়া নিয়ে যাওয়া যায়, তখন সে সঙ্গীগণের নিকট ফিরিয়া আসে এবং এক প্রকার শুণ্ডের সঞ্চালন দ্বারা উহাদিগকে বুঝাইয়া দেয়, যে কোন পথে যাইলে উক্ত ফাটল দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহারা আবার অন্যান্য পিপীলিকার পথ প্রদর্শক হয়, অবশেষে সকলেই অবগত হয়, যে কোন পথে চলিতে হইবে।

পিপীলিকাগণ সম্বন্ধে ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে, যে যখন তাহারা পরিশ্রম করে, তখন তত্বাবধায়ক মধ্যে মধ্যে বাসার দেওয়ালে শুণ্ডাঘাত করিয়া এক প্রকার শব্দ করে, তাহাতে মজুরগণ এক প্রকার সাঁ সাঁ শব্দ করিয়া উঠে ও তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে কার্য্য করিতে থাকে। বোধ হয় তত্বাবধায়ক মজুরগণকে শীঘ্র শীঘ্র খাটাইবার জন্য ঐরূপ শব্দ করে এবং মজুরেরা যে উত্তর দেয় তাহাতে বুঝায়, যে তাহারা ঐ আজ্ঞা পালন করিতেছে।

যখন পিপীলিকাদিগের যুদ্ধের উদ্যোগ হয়, তখন যুদ্ধ ক্ষেত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সংবাদ আনিবার জন্য গুপ্তচর সকল প্রেরিত হয়। গুপ্তচর ফিরিয়া আসিবার পর সৈন্যদল সমবেত হয় এবং যে সকল স্থান গুপ্তচরগণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল, তথায় যাইতে আরম্ভ করে। সৈন্যদলের যাত্রার সময় উহার অগ্র ও পশ্চাত ভাগে সর্ব্বদাই সংবাদ বিনিময় হইতে থাকে; এবং সৈন্যগণ যখন শত্রু শিবিরে উপনীত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে, তখন আবশ্যক হইলে নূতন সৈন্য আনয়নের জন্য দ্রুতগামী দূত সকল দলপতির আজ্ঞায় প্রেরিত হইয়া থাকে। পিপীলিকাগণের আসন্ন বিপদ জানাইবারও ক্ষমতা আছে। তদ্দ্বারা সমস্ত পিপীলিকা সতর্ক হয়; এইরূপ বিপদের সঙ্কেত পাইবামাত্র ক্লীব পিপীলিকাগণ আত্মরক্ষার জন্য সাহসে উত্তেজিত হয় এবং পুরুষ ও স্ত্রী পিপীলিকাগণ ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হয় এজন্য তাহাদিগকে বাসার দিকে পলাইতে দেখা যায়।

মক্ষিকাদিগের ভাব প্রকাশের পদ্ধতি অনেকটা পিপীলিকারই মত। উহার উপায়ও একইরূপ বলিয়া বোধ হয়। যখন এক দল মৌমাছি স্থানান্তরে গমন করে, তখন পূর্ব্বেই উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিবার জন্য দূত সকল প্রেরিত হয়। দূতেরা কোন স্থান বিশেষে গিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, যেন সেই স্থানটী উপযুক্ত কি না বিবেচনা করিতেছে। দূত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া আসিলে পর সমস্ত দল তথায় উড়িয়া যায় ও নির্ব্বাচিত স্থান অধিকার করে। বোলতাও কোন স্থানে মধু বা খাদ্য সঞ্চিত আছে দেখিতে পাইলে বাসায় গিয়া সংবাদ দেয়; পরে সমস্ত বোলতা বাসা হইতে বাহির হইয়া ঐ স্থানে গিয়া ঐ সুরস খাদ্যের অংশ গ্রহণ করে।

পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকাদিগের মধ্যে এই বিশেষ গুণ আছে, যে তাহারা সাধারণ তন্ত্রের মত সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। এই পরস্পর সম্বন্ধ এবং তজ্জন্য ঐ সম্বন্ধীয় নানারূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, একত্র করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে ভাষা বা ভাব প্রকাশের প্রয়োজন; তদনুসারে তাহাদের ভাষাও আছে। অন্যান্য ইতর প্রাণী যাহারা অল্প বা অধিক পরিমাণে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সমাজে বাস করে, তাহাদেরও নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন সকল দ্বারা পরস্পরকে মনের ভাব জানাইবার কিছু না কিছু ক্ষমতা আছে। ভেকগণ বৎসরের নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে শব্দ করে। কিন্তু ঐ শব্দ তাহাদের মনের ভিন্নভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করে না। সর্পের ফোঁস ফোঁস শব্দ, পক্ষীর সঙ্গীত, হিংস্র জন্তুগণের গর্জ্জন ইত্যাদি সম্বন্ধেও প্রায় ঐকথা বলা যাইতে পারে। ঐ সকল শব্দ মনের কোন বিশেষ ভাব ব্যক্ত করে, কিন্তু উহাদিগকে কোন ভাষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। কোনটি বা ক্রোধ সূচক শব্দ, কোনটি বা ক্ষুধার শব্দ, কোনটি বা হত্যাসূচক শব্দ। প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, সকল প্রাণীই বুঝিতে পারে এইরূপ শব্দ বিপদ সূচক সঙ্কেত। যে মুহূর্ত্তে এই শব্দ উচ্চারিত হয় তখনই সমস্ত প্রাণী (বিভিন্ন জাতীয় হইলেও) সেই শব্দ পুনরুচ্চারণ করে এবং নিরাপদ হইবার জন্য ঝোপে ঝাপে পলায়ন

করে। চাফিং নামক পক্ষী যখন পুনঃ পুনঃ টুইং টুইং শব্দ করে, তখন সকল ছোটপক্ষীই বুঝিতে পারে যে বিড়াল নকুল শিকারের চেষ্টায় ঘুরিতেছে।

গৃহ পালিত কুক্কুটী খাদ্য দ্রব্যের সংবাদ দিয়া তাহার ভ্রমণকারী শাবক গণকে আহ্বান করে, ইহা আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি। শাবকগণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে তাহাদিগকে একত্র করিবার জন্য সকল পাখীরই ভাষা আছে; কিন্তু ইহা জাতিভেদে বিভিন্নরূপ। পক্ষীগণ যে গান করিতে পারে ইহা কাহার ও অবিদিত নাই। উহাদ্বারা যে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষী ভিন্নভাব প্রকাশ করে এরূপ বোধ হয় না। প্রত্যেক পক্ষী বিভিন্ন ভাবে ঋতুর উপযোগী ভাব প্রকাশ করিয়া শব্দ করে— কোকিল জাতীয় পক্ষীর উচ্চারিত শব্দ ও নাইটিঙ্গেল পক্ষীর আনন্দ দায়ক স্বর চড়াই পাখীর শব্দের মত একার্থ-সূচক।

পৃথিবীর সকল জীবেরই মনোভাব ব্যক্ত করিবার কিছু না কিছু উপায় আছে। কিন্তু আমরা মনুষ্য জাতি তাহা বুঝিতে পারি না।

শ্রীদেবেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী।

গৃহশিক্ষা।

একদিন সন্ধ্যাকালে পাঠ শেষ করিয়া মালতী ও তাহার দাদা বিনয় মাতার নিকট আসিয়া বসিল। মাতা কখনও বিনা কাজে বসিয়া থাকেন না। তিনি সারাদিনের কাজের পর সেলাই করিতেছিলেন। মালতীর মুখখানি একটু গম্ভীর। সে মাতাকে বলিল "মা, দেখ, দাদা বল্‌ছে যে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে সাহসী।"

বিনয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "হাঁ, ঈশ্বর এইরূপ ভাবে তাদের সৃষ্টিই করেছেন।"

মালতী বলিল "এটা করা কিন্তু উচিত হয় নাই। আমার একটুও ভাল লাগে না।"

বিনয় বলিল "মা, একি সত্য নয়? যদি একটা মই থাকে ত ছেলেরা তৎক্ষণাৎ নির্ভয়ে উঠে যায় কিন্তু দেখি, মেয়েরা কিছু দূর উঠেই নেমে পড়ে, তাদের পা কাঁপতে থাকে। যদি কোন ছোট নদীর উপরে একটী তক্তা দিয়ে পোল করা হয়, ছেলেরা তাহার উপর দিয়ে কতবার দৌড়ে যাওয়া আসা করে, আর মেয়েরা তখন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ভাবে পোলের উপর উঠ্‌বে কি না।"

মাতা বলিলেন "মালতী, আমার মনে হয় বিনয় যা বলেছে তা' ঠিক। ছেলেরা সাহসিক ও বিপদপূর্ণ কাজ কর্‌তে খুব ভালবাসে। তারা বিপদকে ভয় করে না। কিন্তু মেয়েরা শুধু আমোদ পাবার জন্য সাহসিক কাজ করে না।"

বিনয় বলিল "কেমন, দেখ্‌লে মালতী, আমি ঠিক, বলেছিলাম।"

মাতা বলিলেন "বিনয়, কিন্তু যদি আমরা স্থির হয়ে চিন্তা করি তবে দেখ্‌তে পাই যে কোন জিনিষই দুই দলের মধ্যে অসমান ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় নাই। তুমি ঠিক্ বলেছ যে সকলে একরূপ সৃষ্ট হয় নাই, আর সব ছেলেদের প্রাণেই যে সাহস আছে তা নয়।"

বিনয় বলিল "কিন্তু ছেলেরা যুদ্ধ কর্‌তে যায়, আর কামানের শব্দ ইত্যাদি শুনে ত একটুও ভয় পায় না। একদিন যখন সকলে যুদ্ধের জাহাজ দেখ্‌তে গিয়াছিলাম তখন আমরা একটা খুব বড় বন্দুক ছুঁড়তে দেখলাম, আর কি ভীষণ শব্দ হল। আমরা ত হাসিতে লাগিলাম; কিন্তু মেয়েরা কানে হাত দিল এবং কেহ কেহ ভয়ে চিৎকার করে উঠ্‌ল।"

"হাঁ, ছেলেদের শরীর খুব বলিষ্ঠ, তাহাদের দেহের গঠনই অন্যরূপ, তাহারা নানারূপ কঠিন কাজ কর্‌তে পারে। তাদের শরীর অমন শক্ত, কাজেই তাদের মনে সাহস আছে ও তাহারা কার্য্যক্ষম। দারিদ্র্য, দুঃখ, বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌তে হবে মনে করলেই তাদের প্রাণে বল ও উৎসাহ আসে। এটা যে প্রকৃত সাহস তাহা নয়।"

বিনয় বলিল "সৈন্যেরা খুব সাহসী। যারা ভাল সৈন্য তারা কখন ভয় পায় না।"

"সৈন্যেরা সাহসী, কিন্তু যদি তাহারা 'কখন ভয় না পেত' তবে এত সাহসী হতে পার্‌ত না"

মালতী বলিল "মা, আমার এতদিন এই ধারণা ছিল যে, যারা ভয় পায় তাহারা সাহসী নয়।"

মাতা বলিলেন "আমি শুনেছি যে যখন অল্প বয়স্ক ব্যক্তিগণ যুদ্ধে প্রথম যায়, তখন মনে হয় যে এমন ভয়ানক স্থান কবে ত্যাগ করিব, কিন্তু প্রথমে মনে যে ভয় জন্মায় তাহা চলিয়া গেলেই ক্রমে সবই সহ্য হইয়া যায়।"

মালতী বলিল "যদি তাদের এতই ভয় হয় তবে পালালেই ত পারে?"

মাতা বলিলেন "যদি তারা ঐ পন্থা অনুসরণ করে তবে ত তারা কাপুরুষ!"

"ওঃ বুঝেছি, তুমি যে সেদিন সেই ঘোড়ার কথা বলেছিলে তাই মনে পড়ছে; এরূপ স্থলে তা হলে তারা আর ঘোড়াকে বশে রাখ্‌তে পারবে না, ঘোড়া ভয়ে ছুটে পালাবে।

মাতা বলিলেন "যখন তারা ভয়কে প্রাণ থেকে দূর করে দেয় আর কর্ত্তব্য কার্য্য স্থিরচিত্তে সম্পন্ন করে তখন তাদের সাহসী বলা যায়।"

বিনয় বলিল "সৈন্যেরা যে ভয় পায় আমি তা জান্‌তাম না। আমি সেদিন রেলগাড়ীতে একজন সৈন্যের সঙ্গে কথা বল্‌ছিলাম, তাকে দেখে মনে হ'ল সে খুব সাহসী; আর সে বলিল যে পৃথিবীতে এমন কোন জিনিষ নাই যা দেখে ভয় পাবে। আমি কিন্তু তার মত সাহসী কখন হ'তে পারব না. কোন জিনিষ দেখে ভয় পাবই।"

মাতা বলিলেন "আমার মনে হয়, যে কখন জীবনে কিছু দেখে কি শুনে ভয় পায় নাই সে প্রকৃত সাহসী নয়।"

"এত দেখ্‌ছি অদ্ভুত কথা; মা, এটা ভাল করে বুঝিয়ে দাও।"

মাতা বলিলেন "যে সাহসী লোক ভয় কাহাকে বলে জানেনা, তার সাহসটা ঠিক সিংহ কি বাঘের মত সাহস, কোন জন্তুর মত। কিন্তু যে ভয়কে পরাজিত করে সাহস দেখায় তার সাহস তাহার প্রাণ হইতে উত্থিত হয়।"

মালতী বলিয়া উঠিল "মা, একটা গল্প বল তবে ভাল করে বুঝ্‌তে পারব।"

মাতা বলিলেন "আচ্ছা শোন, একটা গল্প বল্‌ছি। কোন স্কুলে দু'জন ছোট ছেলে দুষ্টামী করাতে তাদের শিক্ষক তাদের কয়েক ঘা বেত মার্‌লেন। তাদের মধ্যে একজনকে যখন বেত মারা হচ্ছিল, সে ভয়ে চিৎকার করতে লাগ্‌ল ও পালাবার চেষ্টা কর্‌তে লাগল। আর একজন বিবর্ণমুখে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া মার খাইল, তার মুখ হইতে একটীও কাতরধ্বনি বাহির হইল না। মার খাইবার পর সে নীরবে যথাস্থানে যাইয়া বসিল, তখন শুধু তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। পরে ক্রীড়াক্ষেত্রে যখন সেই ছেলে দুটী খেলিতে গেল তখন সকলে প্রথমোক্ত ছেলেকে কাপুরুষ বলিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে জোরের সঙ্গে বলিল 'আমি ত একটুও ভয় পাই নাই।' কিন্তু শেষোক্ত ছেলে বলিল 'আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম, আমি কাপুরুষ।" তখন অন্যান্য ছেলেরা বলিল "না, না, তুমি কি করে কাপুরুষ হবে, তুমি ত নীরবে মারটা সহ্য করেছ। তুমি মনে যদিও ভয় পেয়ে থাক বাইরে ত তা প্রকাশ করনি।"

মালতী বলিল "আমি হলে ও কিন্তু ভয়েতে খুব চিৎকার কর্‌তাম।"

বিনয় বলিল "ছেলেরা বেতকে এত ভয় করবে কেন? আর তুমি ত মেয়ে, ছেলেদের মত কি সাহস দেখাতে পার্‌বে!"

মালতী বলিল "মা, এ কথাটা কি সত্য?"

মাতা বলিলেন "হাঁ, ছেলেদের মত মেয়েরাও সাহস দেখাতে পারে। এ সম্বন্ধে একটা গল্প বলি শোন।

একটা বাড়ীতে কয়েকটী ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নানারূপ আমোদ ও ক্রীড়ায় রত ছিল, এমন সময় তাদের মা বাবা কোন আত্মীয়ার অসুখ সংবাদে তাঁহাকে দেখিতে চলিয়া গেলেন, ও ছেলে মেয়েদের খুব সাবধানে

থাকিতে বলিলেন। তাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার আর কেহ রহিল না দেখিয়া মহা আনন্দে তারা সারাবাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ সন্তান দ্বাদশ বৎসর-বয়স্কা রমা সকলের সঙ্গে যেমন আমোদ করিতেছিল, তেমনি যাহাতে তারা কোন বিপদে না পড়ে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেছিল। সন্ধ্যাকালে একাদশবর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র রমেশ লণ্ঠন লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে আলোটা জ্বালিতে চেষ্টা করিল। রমা তখন বলিল "মা আমাদের আলো স্পর্শ করিতে বারণ করিয়াছেন, এ ঘরে কেমন পরিস্কার চাঁদের আলো এসেছে, এ ঘরে সকলে বস, আমি গল্প বল্‌ছি।" রমেশ কিন্তু তাহা শুনিল না, সে গল্পের বই পড়িতে চাহিল, কাজেই আলো জ্বালিবার জন্য ব্যস্ত হইল। সে জ্বালাবেই! সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র অবনী আলো জ্বালান দেখিবার জন্য অতি কষ্টে একটা চেয়ারে উঠিল। রমেশ যখন সলিতায় আগুন ধরাইয়া দিল তখন খুব বেশী জ্বলাতে অবনী টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া তাহা নিবাইতে চেষ্টা করিল, এমন সময় রমেশ তাহাকে এক ধাক্কা দিল, সে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য টেবিল ঢাকা টানিতে লাগিল আর তার সঙ্গে লণ্ঠনটা মেজেতে পড়িয়া গেল। কেরসিন তেল ঘরময় হইয়া গেল ও আগুন ক্রমে বিস্তৃত হইতে লাগিল। রমা অবনী মেজের উপর পড়িবার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়াছিল; কিন্তু সে দেখিল যে দরজার সম্মুখে দাউ দাউ করিয়া আগুণ জ্বলিতেছে। তাহাদের পলাইবার পথ বন্ধ। তাহারা সম্মুখে যাহা কিছু পাইতেছিল তাহা আগুনের মধ্যে ফেলিতেছিল তাহাতে আগুন ত নিবিল না, এবং ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অন্য উপায় না দেখিয়া, রমা জানালা খুলিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তখন একজন সে কাতর চিৎকার শুনিতে পাইয়া দমকল আনিতে গেল। ইতিমধ্যে ক্রমে কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিঁড়ি ও ভস্মীভূত হইতে লাগিল। রমা তাহার ছোট দুটী ভাইকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিল। পরে সে আগুনের অতি নিকটে যাইয়া বসিল। তাহার ভাইদিগকে জানালার ধারে যাইতে বলিল। রমার মুখখানি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি সে নিজে একটী ভয়ের কথা না বলিয়া সকলের প্রাণে সাহস দিতেছিল। ক্রমে আগুন তাহার অতি নিকটে আসিল, তাহার মনে হইতেছিল যেন পদদ্বয় পুড়িয়া যাইতেছে তথাপি ক্রন্দনপরায়ণ রমেশকে সাহসী হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। অবশেষে —মনে হইতেছিল যেন এক যুগের পর—তাহাদের সাহায্যার্থ অনেক লোক উপস্থিত হইল। রমা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিল কয়েকজন কম্বল ধরিয়া আছে, ও তাহারা রমাকে দেখিয়া বলিল "এক এক করিয়া সকলকে জানালা হইতে নিক্ষেপ কর। রমা কনিষ্ঠ ভাইটিকে সর্ব্বাগ্রে ফেলিয়া দিল কিন্তু রমেশ অত্যন্ত ভয় পাইল। যখন লোকেরা চিৎকার করিয়া বলিল "এইবারে আর একজন এস" রমেশ ত জানালা হইতে নীচে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল "ওঃ আমি এত নীচে লাফাইয়া যাইতে পারি না, আমার ভয় করছে।" তখন বুদ্ধিমতী রমা নিজের সাড়ীর এক অংশ ছিঁড়িয়া তাহার চোখ বাঁধিয়া দিল, আর যখন সে জানালার উপরে বসিল, সে হঠাৎ তাহাকে ঠেলিয়া দিল। এখন তাহার পালা। এতক্ষণ যে কোথা হইতে সাহস আসিয়া দুইটী ভাইয়ের প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া অবাক হইল। তাহার আর সে সাহস নাই; তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে যখন লাফ দিল তখন নিরাপদ স্থানে না পড়িয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মধ্যে পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ একজন তাহাকে টানিয়া আনিল। তাহার চুল পুড়িয়া গিয়াছিল, এবং সে যখন নিজে আগুণের ধারে বসিয়া ভাইগুলিকে দূরে রাখিয়াছিল, তখন তাহার পা পুড়িয়াছিল তবে ঈশ্বর কৃপায় সাংঘাতিক কিছু হয় নাই। প্রতিবেশীগণ পিতা মাতার অনুপস্থিতিতে নিজের বাড়ীতে লইয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহাদের পিতা মাতা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের সুন্দর বাড়ীর ও সন্তানগণের অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কনিষ্ঠ পুত্র পিতা মাতাকে দেখিয়াই বলিয়া

উঠিল "মা, জান, রমেশ কাঁদছিল, দিদিই আমাদের সাহস দিচ্ছিল।" রমেশ মাথা নীচু করিয়া বলিল "হাঁ, দিদির মত আমি সাহসী নই।"

এই গল্প শুনিয়া বিনয় বলিল "বাড়ীতে যদি আগুণ লাগে ত সকলেরই ভয় হয়। রমা ও ত খুব ভয় পেয়েছিল, তবে ও বড় ছিল কি না, আর ছোটদের জন্য তাকে ভাবতে হয়েছিল কাজেই সে অমন স্থির ছিল।"

মাতা বলিলেন "কিন্তু রমেশ ও তাহার ছোট ভাই যত ভয় পেয়েছিল রমাও সেইরূপ ভীত হয়েছিল, কিন্তু সে তাহা দমন করে উহাদের প্রাণ রক্ষা করেছিল, এটা কি সাহসের কাজ নয়?"

বিনয় বলিল "মা, তুমি ঠিক বলেছ, মেয়েরাও ছেলেদের মত সাহসী হতে পারে।"

মালতী বলিল "তা' হ'লে মা ভয় পেয়েও সাহসী হওয়া যায়।"

মাতা বলিলেন "যদি তুমি ভয়কে পরাজিত করে সাহসের সঙ্গে কর্ত্তব্য কাজ করে যাও, তবেই তুমি প্রকৃত সাহসী।"

মালতী বলিল "আমি সর্ব্বদা মন থেকে ভয় তাড়াইতে চেষ্টা করি।"

বিনয় বলিল "মা, পরে বোধ হয় মালতী সৈন্য হবে।"

ইহা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। তাহারা পরে শয়ন করিতে গেল।

শ্রীবাসন্তী মিত্র।

ভোর

১

মোরগ হাঁকে কোকঁর কোঁ
পায়রা বকে বক্‌বকুম।
ওঠ্‌রে মাণিক, মুখহাত ধো,
এখনো কি যায়নি ঘুম?

২

কাগা ডাকে কা কা
দুয়োর খোলে খুট্ খাট্।
বাবা উঠে খাচ্ছে চা,
বেয়ারা দিচ্ছে ঝাঁট পাট॥

৩

মা গিয়েছে ভাঁড়ার ঘরে,
ঠাকুর গেছে নাইতে।
কাকাতুয়া হাল্লা করে,
ঝি চেচাঁয় তা' চাইতে!

৪

দুধ জ্বাল হয়ে গেল,
বেড়াল তার ভাগ পেয়েছে।
তোমার টুকু খেয়ে ফেল,
নইলে নেবে খেয়ে সে॥

৫

ভুলো কুকুর দুয়োর গোড়ায়
করছে বসে' ছট্ ফট্।
সইস মলে' দিচ্ছে ঘোড়ায়,
চাপড় পড়ে চটাপট্

৬

হাওয়া দিচ্ছে মিটে মিটে,
ফুলগুলো সব জেগেছে।
মালীরা দেয় জলের ছিটে,
সবাই কাজে লেগেছে॥

৭

সূর্য্যিমামা কোন্ সকালে
মেরে গেছে ঘরে উঁকি।
সবার ঘুম না ভাঙ্গালে
তারই ঘাড়ে পড়বে ঝুঁকি॥

৮

তাই সে দেছে চাঁদকে বলে'
ভোরে আমায় দিস্ তুলে,

সোণার রথে যাব চলে'
আকাশেরই ইসকুলে ॥"

৯

ঝক্ ঝকে তার রাঙ্গা মুখ,
মাজা যেন তামার থালা।
এখনি ত দেখ্‌তে সুখ,
আলো আছে, নাইক জ্বালা ॥

১০

সোনার অঙ্গে পরেছে সে,
সোনার মেঘের গয়না।
যাত্রা সুরু করছে সে,
বেলা কভু হয় না ॥

১১

তুইত তেম্নি সোনা ছেলে,
আয়রে উঠে, ধন আমার।
তোরে নাহি দেখ্‌তে পেলে
সকাল বেলা অন্ধকার ॥

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

—:—

হরিদ্বার।

(ভ্রমণ)

যখন হরিদ্বার প্রত্যাগত বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট সেখানকার বর্ণনা শুনিতাম, আমার মন সেই স্থান দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইত। কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে অনেক সুবিধা ও আয়োজনের প্রয়োজন। সে দিন দাদামহাশয়ের সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রথমে বারাণসী পরে হরিদ্বার যাই। সেই স্থানের কথা আজ আমি তোমাদিগকে বলিব।

হরিদ্বার O and R. Ry এর Hardwar Dehra Branch Line এ একটী বড় ষ্টেশন। ষ্টেশনটি পর্ব্বত মালার ক্রোড়ে অবস্থিত। হিমালয়ের অসংখ্য গিরিশ্রেণী স্থানটীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ট্রেন হইতে নামিয়াই আমাদের পাণ্ডা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদিগকে অতি আদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাটীতে লইয়া চলিলেন। গঙ্গার ঘাটের ঠিক উপরেই তাঁহার বাটীর ত্রিতলে বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। সেই বাসার গবাক্ষ হইতে গঙ্গার শুভ্র জলরাশি দেখিতে ও কক্ষমধ্য হইতে জলস্রোতের অবিরাম কল্লোল শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। বাসায় দ্রব্যাদি রাখিয়াই উল্লাসে স্নান করিতে চলিলাম। নির্ম্মল, পবিত্র সলিল রাশি দেখিয়া বড় আহ্লাদ হইল, কারণ, অনেক দিন পরে অবগাহন স্নান হইবে। অনেক পঞ্জাবী সুন্দর বালক বালিকা গঙ্গাবক্ষে ইতস্ততঃ সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছিল। আমিও সাঁতার জানি। তাড়াতাড়ি নামিয়া জলে পা দিয়া দেখি, জল এই শ্রাবণের গ্রীষ্মে বরফ অপেক্ষাও শীতল। তখন স্নানের সংকল্প ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে একটী পঞ্জাবী বালিকা হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে বলিল, "দৌড়ে আস্‌তে আস্‌তে বাবুজী তুমি উঠিলে কেন? বাঙ্গালী বাবু কি জলকে এত ডরায়? তবু এ জল গরম। শীতকালে এ জল বাবু, তোমরা খাবেইনা!" তাহার সে বিদ্রূপ অসহ্য হওয়ায় আমি ছুটিয়া জলে নামিলাম। অতিকষ্টে বিকৃত মুখ ভাব ও কম্পন গোপন করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু, কি বিপদ! অসংখ্য বৃহৎ মৎস্য নির্ভয়ে জলে বিচরণ করিতেছে, গামছা কামড়াইয়া টানিতেছে। এক একটা মাছ খুব বড়, তাহাদের লেজের ঝাপটে বোধ হয় যেন পড়িয়া যাই। যাহা হউক, সাঁতার দিতে আরম্ভ করিলাম। বালিকাও আমার সঙ্গে সাঁতার দিতে লাগিল। দেখিলাম, সে আমা অপেক্ষা ভাল সাঁতার দিতে পারে ও অনেক কৌশল জানে। বাঙ্গলা দেশের মত এখানকার স্ত্রীলোকেরা অবরোধবাসিনী নহে। তাহারা ইচ্ছামত সকলের সহিত মিশিতে পারে ও পথ ঘাটে আত্মীয়দের সহিত বেড়াইয়া থাকে। এখানকার অধিকাংশ যাত্রীই পঞ্জাবী। পঞ্জাবী স্ত্রী পুরুষ সকলেই খুব সুন্দর। তাহারা অমায়িক প্রকৃতি ও লোকের সহিত মিশিতে ভালবাসে। যে ঘাটে আমরা স্নান করিলাম, তাহার

নাম ব্রহ্মকুণ্ড। পঞ্জাবী, রাজপুত, মান্দ্রাজী, বাঙ্গালী, ভারতের প্রায় সকল হিন্দু জাতিই হরিদ্বারে আসিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করেন; তাঁহাদের বিশ্বাস ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলে সকল পাপ দূর হয়। সকল সময়েই এখানে যাত্রীর অতিশয় সমাগম। অতি প্রত্যূষ হইতে রাত্রি সাতটা কি আটটা পর্য্যন্ত অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ জাহ্নবীর পুণ্য সলিলে স্নান করিয়া সেই জলে দেব-পূজা ও আহ্নিক করিতেছে। গঙ্গায় স্রোতাধিক্য বশতঃ স্নান করা বিপজ্জনক বলিয়া ইহার কিয়দংশ ঘিরিয়া স্নানোপযোগী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে স্নান করিবার বেশ সুবিধা আছে। এই ব্রহ্মকুণ্ডের উপর একটী কাঠের সেতু আছে। পারাপারের জন্য নহে, যে দিকে আরম্ভ সেই দিকেই শেষ। ব্রহ্মকুণ্ডের অপর নাম "হর-কি-প্যারী"। যাত্রীরা এই "প্যারীকে" এতই পবিত্র জ্ঞান করে যে, ঘাটের উপরে ৩০।৩৫ হাতের মধ্যে জুতা পরিয়া কাহাকেও যাইতে দেওয়া হয় না। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশে ঐ প্যারীর উপর লিখিত আছে, যে কোন জাতীয়, দেশীয় কি ইউরোপীয়, কেহই এখানে জুতা পরিয়া আসিতে পারিবেন না। তাহারা ঐ জলকে এত ভক্তি করে, যে, স্নানের সময়ে জলের উপর মুখ প্রক্ষালন করিতে দেয় না। ঘটিতে জল লইয়া উপরে যাইয়া মুখ ধুইতে হয়।

পর দিন প্রাতে পাণ্ডাজী আসিয়া আমাদিগকে কনখলে লইয়া চলিলেন। এক খানি গাড়ীতে করিয়া আমরা কয় জনে হরিদ্বার হইতে ২॥ মাইল দূরে প্রাচীন কনখল নগরীতে উপস্থিত হইলাম।
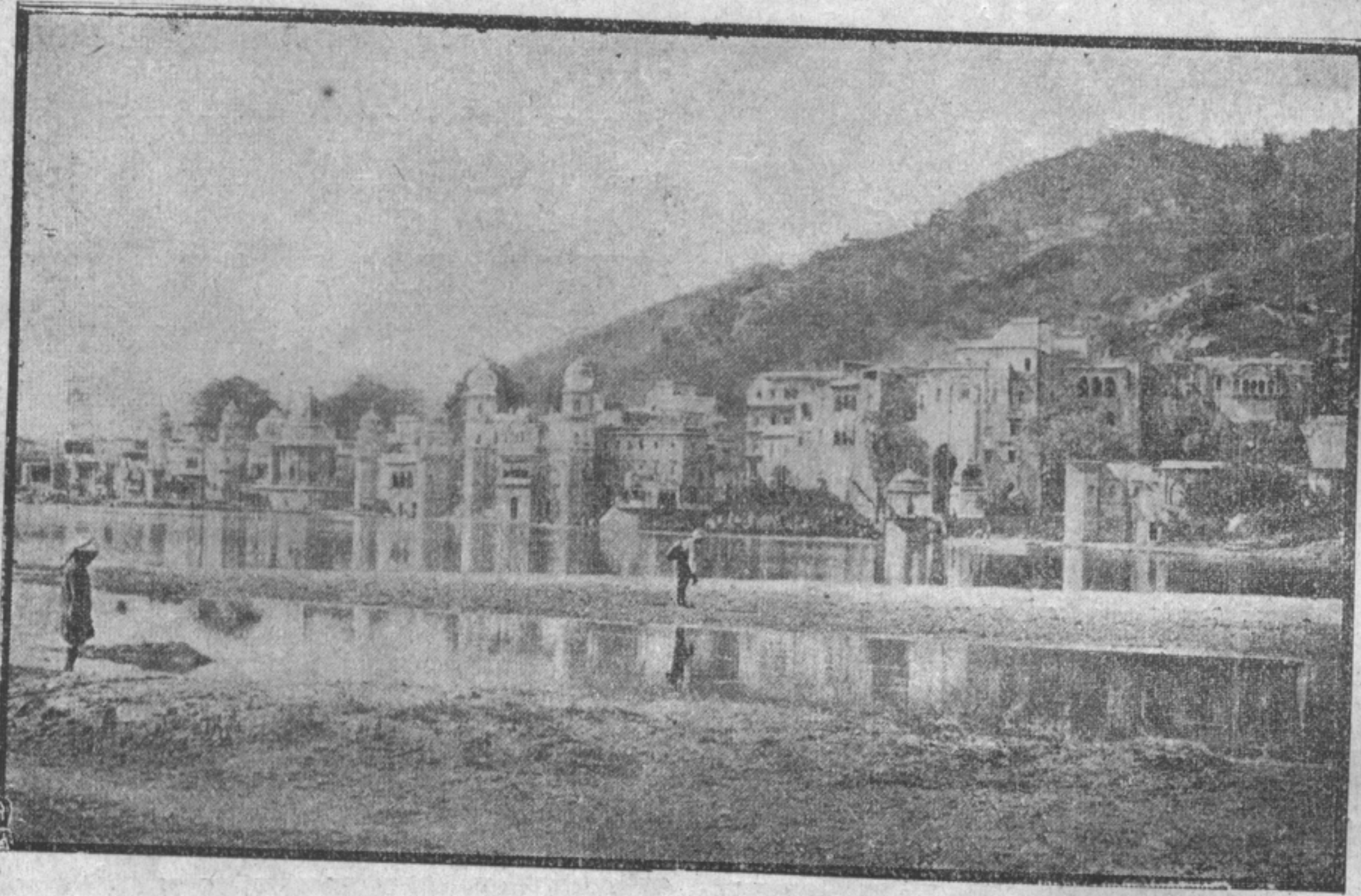
এখানে বহু পুরাতন অট্টালিকা ও বৃহৎ মন্দির আছে। তোমরা দক্ষ প্রজাপতির নাম শুনিয়াছ, কথিত আছে এই কনখল নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। দক্ষ রাজা এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি ত্রিভুবনের সকলকে নিমন্ত্রণ করেন; কেবল মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। মহাদেব তাঁহার জামাতা; তথাপি মহারাজ দক্ষ যজ্ঞস্থলে সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহার নিন্দা করেন। দক্ষের কন্যা সতী শিবের নিষেধ না মানিয়া বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে আসিয়াছিলেন। সতী পতি নিন্দা শুনিয়া এই যজ্ঞস্থলেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানে কতকগুলি পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংশাবশেষ আছে; সে গুলিকে মহারাজা দক্ষের যজ্ঞকুণ্ড,

দেবালয় প্রভৃতি বলিয়া প্রদর্শিত হয়। দক্ষরাজকন্যা সতী যেস্থানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রবাদ, সেখানে স্বামীর সহমৃতা হইলে পরজন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। এই প্রবাদ বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া অনেক স্ত্রীলোক এখানে মৃত স্বামীর সহগামিনী হইয়াছেন। তাহার চিহ্নস্বরূপ প্রত্যেক চিতার উপর স্তম্ভ নির্ম্মিত হইত। এই স্তম্ভ এখানে অনেকগুলি আছে, এজন্য এই স্থানটীর নাম হইয়াছে "সতীচিহ্ন"।

হরিদ্বারে চণ্ডী পাহাড় বা মাতা চণ্ডিকা দেবীর মন্দির একটী উচ্চ পর্ব্বত শীর্ষে অবস্থিত। অনেক যাত্রী এই স্থানে যাইয়া চণ্ডী দেবীর পূজা দিয়া থাকেন। সেই চণ্ডী পাহাড় হইতে একটী নির্ঝর কনখলে গঙ্গার সহিত আসিয়া মিলিত হইতেছে। তাহার নাম 'নীলধারা'। ইহাতে জল অল্প, এক কি দেড় ফুট হইবে। এখানেও অনেক যাত্রী পুণ্যার্জ্জন কামনায় স্নান করিয়া যায়। নীলধারার উপরে বৃহৎ বৃহৎ মন্দির ও ঘাট আছে। ঐ সকল মন্দিরের অবস্থা এখন জীর্ণ ও শোচনীয় হইলেও উহারা যে প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। নীলধারার দৃশ্য অতি রমণীয়। নির্ম্মল জলরাশি পর্ব্বত গাত্র হইতে অনবরত প্রবাহিত হইতেছে। জলপ্রপাতের অবিশ্রান্ত শব্দ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। প্রবাহিত জলরাশি গঙ্গার সহিত মিলনের উদ্দেশে ছুটিতেছে। সেই স্রোতের শব্দ কি মধুর, কি স্নিগ্ধ, এই স্রোতের সুন্দর সঙ্গীত আমাদের কর্ণকুহর তৃপ্ত করিতে লাগিল।

হরিদ্বারে ভাগীরথী বক্ষে নৌ বিহার অতিশয় রমণীয়। গভর্ণমেণ্টের কয়েকখানি নৌকা সেই উদ্দেশ্যে সেখানে থাকে। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা এক খানি নৌকা করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। এখানে হিমালয় গাত্র নিঃসৃত ভাগীরথীর স্রোত অতিশয় প্রবল। তাহার খর স্রোতে নৌকা দ্রুত বেগে চলিতে লাগিল। পর্ব্বত পার্শ্বে রাঙ্গা রবি ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছে। সেই অস্তগমনোথ লোহিত রবির কিরণে দিগন্ত রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। জলের উপর সে আলোক প্রতিফলিত হইতেছে। আর অপর পারে পর্ব্বত গাত্রে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, সে দৃশ্য কি সুন্দর। আর ঘাটে ঘাটে স্থানীয় বালকগণ সমস্বরে "মাতা গঙ্গাজী, তাঁহারই চরণ পুজি" স্তোত্র গাহিতেছে। দেখিতে দেখিতে অনেক দূরে গিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় দেখি, জাহ্নবীর স্বচ্ছ জলে সহস্র দীপ নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া চলিতেছে। যেন গঙ্গা বক্ষে কে দীপমালা গাঁথিয়া পরাইয়া দিয়াছে। উপরে আকাশে অগণ্য তারকা দীপ্তি পাইতেছে, আর নিম্নে গঙ্গা বক্ষে রমণীগণ ভক্তি সহকারে দীপ দান করিতেছে।

আমাদের ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। কারণ বিপরীত স্রোতে নৌকা বাহিয়া আসিতে বিলম্ব হয়। সেই অন্ধকারে পর্ব্বত বেষ্টিতা কল্লোলিনীর শান্ত বক্ষে, বিচরণ করিতে মনের মধ্যে এক কালে শান্তি ও ভয়ের আবির্ভাব হয়। অতি শান্তিময় পবিত্র স্থান, তথায় জলের অবিরাম শব্দে প্রাণ আকুল ও আপ্লুত হইয়া আসে।

পর দিবস আমরা সমগ্র হরিদ্বার সহরটী ভ্রমণ করিয়াছিলাম। হরিদ্বার এক খানি ক্ষুদ্র সহর। তথায় যাত্রীদের জন্য অনেক ধর্ম্মশালা আছে। যাত্রীগণ অনায়াসে তাহাতে থাকিতে পারেন। এক একটী ধর্ম্মশালায় পাঁচ কি ছয় শত লোক থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। আর হরিদ্বার দেখাইবার জন্য অনেক পাণ্ডা আছে। তাহারা মধুরভাষী, যাত্রীদের জন্য অনেক পরিশ্রম করে, বিদায়ের সময় মারামারি করে না।

হরিদ্বারের স্বাস্থ্য অতি উৎকৃষ্ট। হিমালয়ের গিরিমালা বেষ্টিত স্থানের জলবায়ু ভাল হইবারই কথা। অতি আনন্দ ও শান্তিতে আমি কয়েক দিন হরিদ্বারে কাটাইয়াছিলাম। সেখানে শান্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। গঙ্গার স্বচ্ছ শীতল জল, প্রপাতের অবিরাম শব্দ ও পণ্ডাদের সুমধুর স্বভাব আমায় একান্ত সুখী করিয়াছিল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

কর্ক।

তোমরা সকলেই বোধ করি জান, শিশিতে যে ছিপি ব্যবহার হয়, তাহা কর্ক গাছের ছাল। কর্ক গাছ অনুর্ব্বরা ভূমিতেই ভাল জন্মে। উহা হিম সহ্য করিতে পারে না। সমুদ্রের নিকটে এবং উচ্চ স্থানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কর্কের গাছ স্পেন দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সেখানকার লোকেরা কর্কের গাছের চাস করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করে। ভূমধ্য সাগরের তীরেও ইহার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ক গাছের দুইটী ছাল হয়। বাহিরেরটীই ছিপির জন্য ব্যবহৃত হয়। কর্কের মূল্য কোমলতা অনুসারে হয়। যে গুলি মখমলের মত কোমল হয়, তাহার মূল্য ও অধিক হয়। গাছগুলি যখন দশ বৎসরের হয়, তখন বাহিরের ছালটী মাটী হইতে ২ ফুট পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া লওয়া হয়। গাছের পরিধি তখন পাঁচ ইঞ্চি হয় এবং গাছটী শাখা অবধি ছয় ফুট উচ্চ হয়। প্রথম বারের ছাল কোন কাজে লাগে না, গাছটী যতই বড় হয়, ততই তাহার ছাল ভাল হয়। ভিতরের ছালটী রক্তের মত লাল টুক টুকে দেখায়। যদি উহাতে কোন প্রকারে আঘাত লাগে কিম্বা কাটিয়া যায়, তাহা হইলে গাছটী মরিয়া যায়।

৮।১০ বৎসরের মধ্যে আবার বাহিরের ছালটী জন্মে তখন আবার গাছের ছালটী ৪ ফুট অবধি ছাড়ান হয়। দ্বিতীয় বারের ছালটী বড়ই মোটা হয়। ইহা মাছ ধরিবার জালে ব্যবহৃত হয়। ইহার পর প্রতি দশ বৎসর অন্তর ছাল তোলা হয়। প্রত্যেক বারেই ২ ফুট উচ্চ অবধি ছাল তোলা হয়; ৪০।৫০ বৎসর এইরূপ করা হয়। ইহার পর যখন গাছটী সম্পূর্ণ বড় হয় তখন ১০ বৎসর অন্তর মাটী হইতে শাখা পর্য্যন্ত ছাল ছাড়ান হয়। এই ছালগুলিকে কলেতে গোল গোল করিয়া কাটিয়া ছিপি তৈয়ার করা হয়।

শ্রীমতী নির্ম্মলপ্রভা দেবী।

ধাঁধার উত্তর।

গত আশ্বিন মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল।

১। লতা।

২। মাছটা ৩০ ইঞ্চি লম্বা ছিল, লেজের দীর্ঘতা ৯ ইঞ্চি।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন :—

শ্রীশিশিরকুমার দাসগুপ্ত, শ্রীপবিত্রভূষণ দাস, শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপরিমল রায়, শ্রীললিতকুমার দে, শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশশাঙ্কশঙ্কর রায়, শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীমতী শৈলবালা সেন, শ্রীমমতাময়ী দেবী, শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীইন্দুভূষণ বীদ,

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু শ্রীমতী স্নেহলতা মজুমদার, শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন, শ্রীবসন্তগোপাল সিংহ, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র পোদ্দার, শ্রীমতী সরযুবালা দাসগুপ্তা ও শ্রীসচ্চিদানন্দ দত্ত।

নূতন ধাঁধা।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ভুঞা প্রেরিত।

১। শিল্পের কি দেখ, ভাই, মহাপরাক্রম,
শক্তি নাই তবু নরে করে কার্য্যক্ষম;
তথাপি দু ভাই তারা বহুব্যয়ী নয়,
সমর্থ জনেরে কভু সাহায্য না দেয়;
দেখিতে যদিও স্বচ্ছ, অতি কদাকার
শিলাখণ্ড হ'তে জন্মে, কিবা চমৎকার!

শ্রীমতী নিরুপমা সেন প্রেরিত।

১। আট হতে বারো ভ্রাতা আছি এক ঘরে।
ছাড়াছাড়ি নাই কেহ একদিন তরে।
পোষাক সুচারু কিন্তু নাহি মোর ধন।
সবুজ হইতে মোরা ধরি লাল রং।
তরুশাখা সনে থাকি আমিকে বল না?
বিশাল ধরণী সনে দেয় গো তুলনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নূতন ধাঁধার সহিত উত্তর না পাঠাইলে সে ধাঁধা প্রকাশিত হয় না।
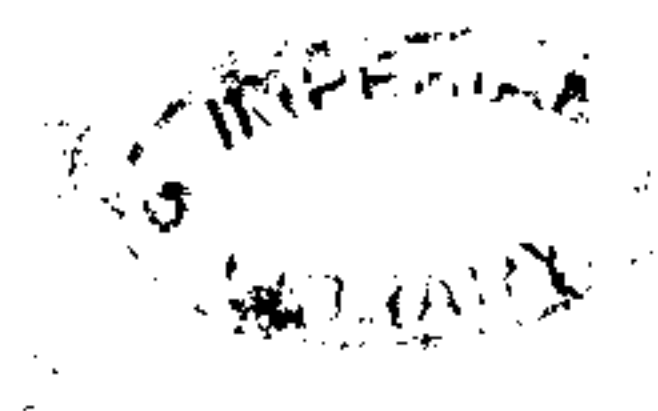
দক্ষিণ মেরুতে এমাণ্ডসেন।

মুকুল

১৮শ খণ্ড। | পৌষ, ১৩১৯। | ৯ম সংখ্যা।

দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মুকুলে উত্তর মেরু আবিষ্কারের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের চেষ্টার সংবাদও তোমাদিগকে জানাইয়াছিলাম। তোমাদের মনে থাকিতে পারে, লেফটেনাণ্ট স্যাক্লটন নামক একজন ইংরাজ দক্ষিণ মেরুর সন্ধানে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি কয়েক জন নরওয়ে দেশবাসী পর্য্যটকের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর মেরু আবিষ্কার সংবাদের কিছু দিন পরে তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছিল; অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, যে সে সংবাদ মিথ্যা। প্রায় এক বৎসর হইল কাপ্তেন এমাণ্ডসেনের দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার প্রকাশিত বিবরণ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, যে কাপ্তেন এমাণ্ডসেন দক্ষিণ মেরু পৌঁছিয়াছিলেন। আমরা আজ সংক্ষেপে তাঁহার দক্ষিণ মেরু যাত্রার বিবরণ তোমাদিগকে বলিব।

কাপ্তেন এমাণ্ডসেন নরওয়ে দেশের লোক; তিনি কতিপয় সঙ্গী লইয়া ১৯১০ সালে নরওয়ে হইতে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁহারা নরওয়ে দেশের অনেকগুলি কুকুর সঙ্গে লইয়াছিলেন। কাপ্তেন এমাণ্ডসেন স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রধানতঃ এই কুকুরগুলির উপর নির্ভর করিয়া ছিলেন। পূর্ব্বে সার আর্ণেষ্ট স্যাকল্টন যখন দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তিনি সঙ্গে ঘোড়া লইয়া গিয়াছিলেন; কাপ্তেন এমাণ্ডসেন কুকুরের দ্বারা বরফের উপর দিয়া গাড়ী টানাইবার বন্দোবস্ত করিয়া নরওয়ে হইতে কুকুর সঙ্গে আনিয়াছিলেন প্রথমতঃ নরওয়ে হইতে দক্ষিণ মেরুর দিকে আসিবার সময় যে সমুদয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অতিক্রম করিতে হয়, সেখানে কুকুরগুলি বাঁচাইয়া রাখাই তাঁহাদের এক সমস্যা হইয়াছিল। এইজন্য তাঁহারা জাহাজের খোলের মধ্যে দুই পর্দ্দা তক্তা পাতিয়া এক ঘর করিয়াছিলেন; সেখানে রৌদ্রের তাপ বেশী লাগিত না। তাঁহাদের জাহাজ ৭৮ ডিগ্রী ৪১ মিনিট পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছিল; তাহার দক্ষিণে আর জাহাজ যাইবার উপায় ছিলনা; সম্মুখে কেবল বরফ। এখানে জাহাজ ছাড়িয়া তাঁহারা

বরফের গাড়ীতে (sledge) দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দক্ষিণ অক্ষাংশের ৮৬ ডিগ্রী ২১ মিনিট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সেখানে শিবির সংস্থাপন করিয়া তাঁহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জাহাজ হইতে যে সমুদয় জিনিস সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সে গুলিকে নিরাপদ রাখার বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহারা পথের আহারের জন্য শীল (seal) নামক সামুদ্রিক জন্তু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এ অঞ্চলে প্রচুর শীল পাওয়া যায়। শীত ঋতু আসিবার পূর্ব্বে তাঁহারা অপর্য্যাপ্ত শীল সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকার করিলেন। তাঁহারা আটজন লোক এবং সঙ্গে ১১০টী কুকুর, আর সেই শীতের দেশের ক্ষুধা! আমাদের দেশে মানুষ যাহা খায় তাহা দিয়া সেখানকার খাদ্যের পরিমাণ স্থির করা যায় না। কাপ্তেন এমাণ্ডসেন লিখিয়াছেন যে সেখানে খাবার শক্তির সীমা আছে বলিয়া মনে হইত না। ২২ এপ্রিলের পরে চারি মাস পর্য্যন্ত আর তাঁহারা সূর্য্য দেখিতে পান নাই। ১৯১১ সালের ২০এ অক্টোবর কাপ্তেন এমাণ্ডসেন চারি জন সঙ্গী ও ৮০টী কুকুর সঙ্গে লইয়া শেষবার যাত্রা করেন। ইতিপূর্ব্বে একবার তাঁহারা যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; সেবার তাঁহারা আটজনেই দক্ষিণ মেরু অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার তিন জনকে পূর্ব্বদিক অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়া তাঁহারা পাঁচজনে সোজা দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, সঙ্গে ৮০টী কুকুর ও ৪ খানি গাড়ী। তাহাতে যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় জিনিস এবং একটী তাঁবু; তাঁবুটী এমন যে অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই খাটান যায়। যাহাতে ফিরিবার সময় পথ হারাইয়া না যান এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা চলিতে চলিতে পথে পাঁচ মাইল অন্তর অন্তর মানুষের সমান উচ্চ বরফের স্তূপ করিতে লাগিলেন; এবং স্থানে স্থানে খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। ৩০এ নবেম্বর তাঁহারা এক প্রকাণ্ড বরফের পাহাড়ের পাদ-মূলে উপস্থিত হইলেন; সে স্থানটী আট হাজার ফুট উচ্চ; সেখান হইতে তাঁহাদিগকে বরফের পাহাড়ের উপরে আরও উচ্চে উঠিতে হইল। তিন দিন পরে তাঁহারা সেই পাহাড় অতিক্রম করিয়া সমভূমি পাইলেন। সেই পাহাড়ের উপর যাইতে তাঁহাদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু কুকুরগুলি তাঁহাদিগের বড় কাজে লাগিয়াছিল। কাপ্তেন এমাণ্ডসেন বলিয়াছেন, যে প্রধানতঃ কুকুরের গুণেই তাঁহারা দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। কুকুরগুলি প্রধানতঃ গাড়ী টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই দারুণ শীতে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় নাই। ছবিতেই দেখিতে পাইবে সেগুলি কেমন হৃষ্ট পুষ্ট ছিল। যখন খাদ্য ফুরাইয়া গিয়াছিল, তখন তাঁহারা দুই চারিটী করিয়া সঙ্গের কুকুর মারিয়া তাহার মাংস খাইয়াছিলেন। এক একটি কুকুর হইতে প্রচুর মাংস পাওয়া গিয়াছিল এবং সে মাংস খাইতেও অতি সুস্বাদু ছিল। কিন্তু কাপ্তেন এমাণ্ডসেন লিখিয়াছেন, যে এই কুকুরগুলি বধ করিতে তাঁহাদের সকলেরই প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁহাদের পথের চরম কষ্ট তাঁহাদের সকল দুঃখের অংশী ও সহায় সেই কুকুরগুলি হত্যা করা। কিন্তু নিরুপায় হইয়া তাঁহাদিগকে তাহা করিতে হইয়াছিল; কারণ তাঁহাদের সঙ্গের সমুদায় খাদ্যদ্রব্য ফুরাইয়া গিয়াছিল; শেষ কিছুদিন কুকুরের মাংস খাইয়াই তাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন। শিবির হইতে যাত্রা কালে তাঁহাদের সঙ্গে ৮০টি কুকুর ছিল; যখন শিবিরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন তাহার মধ্যে এগারটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

তাঁহাদের গণনা অনুসারে তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, যে ১৪ই ডিসেম্বর তাঁহারা দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছিবেন। ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে তাঁহারা একটী বিস্তৃত প্রান্তরে পৌঁছিলেন। তখন আবার সূর্য্য দেখা দিয়াছে; সেদিন সমুজ্জ্বল আলোকমালার মধ্যে সূর্য্যাস্ত হইল। পরদিন তাঁহারা যন্ত্র সাহায্যে সেই স্থানের অবস্থান গণনা করিলেন; তাহাতে জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা যেখানে দাঁড়াইয়া

আছেন তাহা ৮২ ডিগ্রী ৫৫ মিনিট দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত; সুতরাং তাঁহারা তখনও দক্ষিণ মেরু হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রহিয়াছেন। আবার তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। ১৬ই ডিসেম্বর তাঁহারা যেখানে উপস্থিত হইলেন, সেখান হইতে সকল দিকই উত্তর দেখাইতে লাগিল, এত কষ্টের পরে তাঁহারা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা নরওয়ে দেশের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিয়া তাহার নাম রাজা সপ্তম হাকন অধিত্যকা রাখিলেন। দুই দিন সেখানে বিশ্রাম করিয়া ২৮ই ডিসেম্বর তাঁহারা ফিরিতে আরম্ভ করিলেন।

গৃহ শিক্ষা।

(৪)

এক দিন সন্ধ্যাকালে মালতী তাহার পড়া করিয়া একখানি গল্পের বই পড়িতেছিল; আর বিনয় গম্ভীর হইয়া কি চিন্তায় মগ্ন ছিল। অন্য দিন এ সময়ে বাড়ীখানি তাহাদের হাস্য কলরবে পূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু আজ নীরব। তাহাদের মাতা গৃহ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু পুত্রের মুখখানি যে চিন্তাযুক্ত তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, যে পুত্র তাহার চিন্তার কারণ তাঁহাকে নিশ্চয়ই বলিবে, সেজন্য তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। মাতার নিকট তাহারা কিছুই গোপন রাখেনা।

হঠাৎ বিনয় বলিয়া উঠিল "মা, আমি একটা বিপদে পড়েছি।"

মাতা বলিলেন "কেন, কি হয়েছে? আমি কি তোমায় সাহায্য করিতে পারি?"

বিনয় বলিল "মা, তুমি ত সব সময়েই তা' কর।" মালতী তাহার বইখানি বন্ধ করিয়া দাদা কি বলেন তাহা শুনিতে লাগিল।

মাতা আবার বলিলেন "কি হয়েছে সব বল।"

বিনয় বলিল "কিছু দিন আগে কয়েক জন ছাত্র ঠিক করিল যে তাহারা ফুটবল খেলিবার একটা দল গঠন করিবে। তাহা শুনিয়া আমার ত খুব আনন্দ হইল; খেলিবার সময় শুধু ঐ কথাটি লইয়াই আলোচনা হইত। আমি ও ঐ দলভুক্ত হইব বলিলাম। পরে শুনিলাম যে চাঁদা দিতে হবে। আমি প্রতিমাসে হাত খরচের জন্য যে পয়সা পাই সকলই দিতে হবে।"

মাতা বলিলেন "কেন, তুমি কি ঐ দলভুক্ত হইবার জন্য পয়সা খরচ কর্‌তে চাওনা?"

বিনয় বলিল "না, তা নয়, দলভুক্ত হ'বার পর জানিলাম সব সভ্যের এক রকমের পরিচ্ছদ করিতে হইবে। তখন আমি ছেলেদের বলিলাম যে তবে আমি খুব সম্ভব এই দলে যোগ দিতে পার্‌ব না। তখন তাহারা বলিল যে আমি যখন একবার যোগ দিয়াছি আর বেশ ভাল খেল্‌তে পারি তখন আর আমার দল ত্যাগ করে যাওয়া উচিত নয়। আমি চুপ করে রইলাম; তারা মনে করিল আমি যোগ দেব। কিন্তু আমি সেদিন তোমার কাছে শুনিলাম যে আমাদের অবস্থা এখন ভাল নয়, আমাদের খুব হিসাব করিয়া চলিতে হইবে, সেজন্য আমার খেলা করিবার জন্য একটা নূতন পোষাক চাওয়া উচিত নয়।"

মাতা বলিলেন "তোমাকে নূতন পোষাকটী এখন ত দিতে পার্‌ব না।"

বিনয় বলিল "মা, তবে আমি কি করব, বলত? আর তাদের কি বল্‌ব?"

মাতা বলিলেন "কেন, বল্‌বে যে আমার বাবা এখন নূতন কাপড়ের জন্য টাকা খরচ কর্‌তে পারবেন না।"

বিনয় বলিল "মা, এ কথা বল্‌তে যে খুব লজ্জা কর্‌বে।"

মাতা বলিলেন "লজ্জা কর্‌বে? কেন?"

বিনয় বলিল "অন্য ছাত্রদের পিতা যাহা পারেন আমার পিতা তা' পারবেন না! আর এতদুর অগ্রসর হয়ে ফিরে আস্‌লে ছাত্রেরা আমাকে কি মনে করবে বল্‌বে।"

মাতা বলিলেন "অন্য ছেলেদের পিতার চেয়ে তোমার পিতা দরিদ্র ইহাত কিছু লজ্জার বিষয় নয়। আমাদের সুখে রাখ্‌বার জন্য তোমার পিতা কত পরিশ্রম করেন, আর কাজ করাত কিছু অপমানের বিষয় নয়। তোমরা কাজ করা ঘৃণা কর ইহা যদি হয় তবে খুব দুঃখিত হ'ব।"

"না, মা, আমি তা' মনে করি না। কিন্তু টাকার

অভাবে যদি কেহ কিছু না দিতে পারে তবে অন্য লোকে তাকে অবজ্ঞা করে। যদি খাবার জিনিষ কিছু দিতে না পারতে তবে আমি অনায়াসেই আমাদের অভাবের কথা বলতে পারতাম। সে গুলি লোভের কিন্তু কাপড় ত সে রকমের জিনিষ নয়; আর কাপড় পেলে আমি কেমন খেলতে পারি।”

মাতা বলিলেন “হাঁ, আমি বুঝতে পারছি যে খাবার জিনিষের প্রতি লোভ তুমি অনায়াসেই ত্যাগ করতে পার; কিন্তু ফুটবল খেলিবার লোভ ত্যাগ করা তোমার পক্ষে কঠিন। সে যাহা হউক, তুমি ছেলেদের সরলভাবে বলবে যে তুমি এখন ঐ দলে যোগ দিতে পারনা, কারণ তোমার পিতার অবস্থা সে রকম সচ্ছল নয়, কাজেই সে কাপড় কেনা হবেনা।”

বিনয় ইহা শুনিয়া অতি কষ্টে চক্ষুর জল রুদ্ধ করিয়া রাখিল। সে মনে করিল শিশুদের পক্ষে ক্রন্দন শোভা পায়। তারপরে বলিল “আমি ছেলেদের বলব যে আমি ঐ দলে যোগ দিব না; কিন্তু কারণ বলতে পারবনা, তাহা শুনিলে তাহারা আমাকে নীচ আর কৃপণ ভাবিবে। সে কথা সহ্য করা বড় কঠিন।”

মাতা বলিলেন, “তোমার কিন্তু সকল কথা খুলে বলাই উচিত। আর যারা তোমায় অমন কঠিন কথা শোনাবে তাদের মনও কঠিন, কিম্বা বিশেষ কিছু মনে না করেও ও কথা বলতে পারে।”

বিনয় বলিল “যারা ও রকম কথা বলবে আমি তাদের ঘৃণা করব; আর যদিও ওরা যা বলবে তাহা মিথ্যা তবুও আমি ও কথা শুনতে চাইনা।”

মাতা বলিলেন তবে তোমার সাহস নাই, দেখছি। ছেলেরা তোমায় ঠাট্টা করবে সেজন্য এত ভয়! তোমার সৎ সাহস নাই।”

বিনয় বলিল “আমি ভয় পাবনা, কিন্তু সৎসাহস কা'কে বলে?”

মাতা বলিলেন “ছেলেরা তোমায় ঠাট্টা করবে এই ভয়ে যদি তুমি সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হও তবে তোমার চরিত্রের বল কোথায়? তুমি ত সৎসাহস দেখাতে পারলেনা। যদি তুমি লোকের নিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া যাহা সত্য তাহা বল, তবে তোমার সৎসাহস আছে বলিব। শরীরের বল সৎসাহস নয়, কিন্তু চরিত্রের বলই প্রকৃত সাহস। তুমি যদি আমাদের দারিদ্র্যের কথা বলিতে লজ্জিত হও তবে তুমি কাপুরুষ।”

ইহা শুনিয়া বিনয় কতক্ষণ ভাবিয়া বলিল “মা, তুমি ঠিক বলিয়াছ। ঐ কারণের জন্যই আমি সত্য বলিতে চাই নাই। আমি ভাবি নাই যে আমি কাপুরুষের মত কাজ করিতেছিলাম। আমি তাদের সত্যই বলিব।”

মাতা বলিলেন “যখন তারা আশা করে আছে, যে তুমি তাদের দলে যাইবে. তখন যে কারণে যোগ দিতে পারিবেনা তাহা তাদের বলা উচিত।”

তখন মালতী বলিয়া উঠিল, “মা, আমার জন্মদিনে মাসিমা আমার ইচ্ছামত কোন জিনিষ কিনিতে যে টাকা দিয়েছেন, সে টাকা দাদাকে দাওনা।”

বিনয় গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল, “না, মালতী, আমি সে টাকা কখন নেবনা। তুমি যে আমাকে সুখী করতে চাও, তাহাতেই আনন্দ পাইলুম।”

ইহা শুনিয়া মালতী একটু দুঃখিত হইল। মাতা তখন মালতীকে বলিলেন “দেখ, বিনয় ঠিক বলেছে; সে যদি নিজের আমোদের জন্য তোমার টাকা নেয় তবে তার স্বার্থপরতা হবে।”

বিনয় তৎক্ষণাৎ বলিল “মা, তুমি ঠিক বলেছ।”

মালতী বলিল “দাদা তুমি এত ভাল খেলতে পার, কেবল পোষাকটার জন্য দলে যোগ দিতে পারবেনা? তুমি তবে কি করবে?”

বিনয় বলিল “কাল স্কুলে গিয়ে সব কথা তাহাদের খুলে বলব।”

পর দিন সকালে সে প্রসন্ন মুখে স্কুলে গেল। সন্ধ্যার সময় স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়াই মাতাকে বলিল “মা তুমি ঠিক কথাই বলেছিলে। আমি তোমার উপদেশ না শুনিলে ঠিক কাপুরুষের মতই কাজ করিতাম। সকল কথা শুনিয়া কেউ হাসিল, কেউ বা বলিল যে তোমার বাবা কৃপণ। যে ঐ কথা বলেছিল তাকে

আমি এমন শাসন করে দিয়েছি, যে সে আর কখন এমন কথা বল্‌বে না। আমি তাদের বিদ্রূপ বাক্য গ্রাহ্য করি নাই। তবে একটী ছেলে বলিল, সে তার বাবাকে বলে আমার পোষাক তৈয়ারী করাবে। আমি অবশ্য তাকে ও কাজ কর্‌তে বারণ করলাম। আর একটা ঘটনায় আমি বুঝতে পারিলাম যে সত্য কথা বলে কি ভাল কাজই করেছি। আমি বলিবার আগে আমার পাশে একটী ছোট ছেলে ছলছল চক্ষে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেদের কাছে আমার বক্তব্য শেষ হবার পর সেও দাঁড়িয়ে বল্‌ল "আমি দরিদ্রের ছেলে আমিও পোষাক তৈয়ারী কর্‌তে পার্‌ব না।"

বালকটীর এমন সৎসাহস দেখে তাকে ডেকে গল্প কর্‌তে লাগ্‌লাম। সে বল্‌ল 'দেখ, তোমার সৎসাহস যদি না দেখিতাম তবে আমিত সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হতাম। তার সঙ্গে বাড়ীর গল্প হ'ল; যাবার সময় সে হাসিমুখে বলে গেল খেল্‌তে যে পার্‌বেনা সেজন্য আর তার তেমন দুঃখ হচ্ছেনা। মা, তোমার মুখে অমন ভাল কথা শুনেছিলাম বলেই আজ সাহস দেখাতে পেরেছি। আর এখন আমার মনে দুঃখ নাই। মালতী চল, খেতে যাই, বড় ক্ষিধে পেয়েছে।"

মালতী বলিল "মার উপদেশানুসারে কাজ করা প্রথমে খুব শক্ত; কিন্তু একবার কর্‌লে সব কাজই কি সোজা হয়ে যায়!"

শ্রীবাসন্তী মিত্র।

ছুটী শেষ।

পথে যেতে যেতে কুড়াই পাথর,
ছিঁড়ে নিয়ে আসি ফুল,
পাখীটি দেখিলে ধরিবার আশে
পথ হয়ে যায় ভুল!

২

তটিনী যেথায় কুলু কুলু ধায়
তরণী ভাসিয়া চলে,
আমি সেথা বাঁধি বালি দিয়ে চর
খোলা আকাশের তলে!

৩

দোকানে যেখানে ধরেনা খেলনা
বেলুন পুতুল গোলা
দেশালাই কাটি সাপ মাছ পাখী
বানর নাগর দোলা,

৪

সাধ যায় সব কিনে নিয়ে আসি,
সব নিয়ে ঘরে ভরি।
পয়সা কোথায়? দাঁড়াইয়া দেখি
মনে মনে লোভ করি!

৫

ছুটী সে ফুরায়, চলি পাঠশালে
খড়ি পুঁথি হাতে লয়ে,
আনন্দ খেলা সব চলে যায়
সবার শাসন ভয়ে!

৬

হাত পা ভাঙা সে মাটীর পুতুল
যে ছিল বুকের কাছে,
বিছানার তলে একেলা কোথায়
মাটীতে পড়িয়া আছে!

আর দেরী নাই পরীক্ষা আসে,
মা বলেছে এইবার,
প্রাইজ না পেলে ছুটীতে বেড়ান
কখনো হবে না আর!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বুলবুল।

তোমাদের মধ্যে যাহারা পল্লীগ্রামে থাক, তাহাদের নিকটে বুলবুলের পরিচয় দেওয়া আর মার নিকটে মামার বাড়ীর গল্প করা একই কথা। কারণ, বাঙ্গলা

দেশে এমন পল্লীগ্রাম অল্প আছে, যেখানে বুলবুল নাই। আমাদের দেশের সকল বনেই ইহাদের মিষ্ট গান শুনিতে পাওয়া যায়, কারণ, বুলবুল বাঙ্গলা দেশের একটী সাধারণ পাখী। সংখ্যায়ও ইহারা নিতান্ত অল্প নহে। বুলবুলের এক একটী ঝাঁক প্রায় বাবুইএর ঝাঁকের মত বড় হইয়া থাকে। আবার ইহাদের দুইটীকে ঝাঁক হইতে স্বতন্ত্র হইয়া একত্র থাকিতেও দেখা যায়।

অনেক দিন পূর্ব্বে তোমাদের এই মুকুলে "সীতামার পালোয়ানের" গল্প পড়িয়াছিলাম। ছবিতে পালোয়ানের যে চেহারা দেখিয়াছিলাম, তাহা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। ক্ষুদ্র একটা মাথা, তাহার উপর প্রায় এক থান সালুর পাগড়ী। দূর হইতে যখন পালোয়ানজীকে দেখা যাইত, তখন মনে হইত, একটী পাগড়ীই যেন পথের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

বুলবুল দেখিলেই আমার পালোয়ানজীর সেই ছবির কথা মনে পড়ে। মাথাটীত অত ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার উপরের পাগড়াটী ঠিক যেন এক থান সালু কাপড়ের পাগড়ী। অনেক পাখীর মাথায় ঝুঁট দেখা যায়। অন্যান্য পাখীর ন্যায় বুলবুলের মাথার ঝুঁটির উপরিভাগ সরু নয়, মানুষের পাগড়ীর মত মোটা, এক শ্রেণীর বুলবুলের মাথার ঝুঁটি অন্যান্য পাখীর ঝুঁটির ন্যায় উপরিভাগে সরু হইয়া উঠিয়াছে।

বুলবুলের লেজ ফিঙ্গের লেজের মত বড় না হইলেও ইহার শরীরের তুলনায় দীর্ঘ বলিয়া ইহারা শালিকের মত ভূমির উপর দিয়া সচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারে না, তবে ফিঙ্গের মত ইহারা মাটীর উপর দিয়া চলিতে সম্পূর্ণ অক্ষম নহে। চরণ দুইটী অতি ক্ষীণ, আঙ্গুলে যে নখ, তাহাতে অস্ত্রের কাজ চলেনা, পাখা দিয়াও শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে না। একবার তোমাদের বলিয়াছিলাম, ঠোঁট, নখ, পাখা ও শরীরের বর্ণ পক্ষীদের আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ। ইহা দ্বারা উহারা শত্রু হস্ত হইতে আপনাদের রক্ষা করিয়া থাকে।

বুলবুলের পালকের বর্ণ খয়েরের মত। কাল খয়েরের সঙ্গে পাপড়ি খয়ের মিশাইলে যেমন বর্ণ হয়, সেইরূপ। দেহের যে স্থান হইতে পুচ্ছ আরম্ভ হইয়াছে, সে স্থানের কতকগুলি পালক উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, মনে হয়, কেহ যেন সেই স্থানে আল্তা লাল রং মাখাইয়া দিয়াছে।

এক জাতীয় বুলবুলের শরীরের বর্ণ অন্য প্রকার। তাহাদের বক্ষঃস্থল সম্পূর্ণ শ্বেত, দুই কানের পাশে কয়েক গুচ্ছ পালক শ্বেতবর্ণ এবং দেহের শেষভাগে রক্তবর্ণের পালকের গুচ্ছও নাই, ইহাদের মাথার ঝুঁটি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আকাশের দিকে উঠিয়াছে।

ফড়িং বা পোকার অপেক্ষা বুলবুলেরা বন্য ফল খাইতেই অধিক ভালবাসে। তাহার মধ্যে আবার তেলাকুচ প্রভৃতি কয়েকটী গাছের ফল ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়। এই সকল গাছের ফল পাকিলে ইহারা মহা কোলাহল করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ক ফল ভক্ষণে নিযুক্ত হয়।

বুলবুলের প্রকৃতি অতিশয় প্রফুল্ল। ক্ষুধার সময় ডালে ডালে ঘুরিয়া আহার অন্বেষণ করে, তাহার পর উদর পূর্ণ হইলে নানা ভঙ্গি সহ পুচ্ছ নাড়িয়া আনন্দ ধ্বনি করিতে থাকে।

চৈত্র বৈশাখ মাস ইহাদের ডিম পাড়িবার সময়। ইহাদের বাসা দেখিতে সুন্দর। নীচে মোটা খড়কুটা পাতিয়া তাহার উপর কোমল তৃণ, বৃক্ষের আঁস, লতা প্রভৃতি বুনিয়া ইহারা গোলাকার স্থায়ী বাসা নির্ম্মাণ করে। বাসা প্রস্তুত করিবার সময় পাখী দুইটীর বিশ্রামের ও সময় থাকে না। বাসা প্রস্তুত হইলে পক্ষিণী তাহাতে চারিটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখিতে পাকা করঞ্জের মত, তাহাতে শ্বেতবর্ণ বিন্দু বিন্দু; আকারও প্রায় করঞ্জেরই ন্যায়। ডিমে তা দিবার ভার সাধারণতঃ পক্ষিণীর উপর; পক্ষীও সময়ে সময়ে আসিয়া ডিমে তা দিয়া থাকে।

ডিম ও শাবক সম্বন্ধে ইহারা অতিশয় সতর্ক। আমি একবার একটা বুলবুলের বাসা দেখিতে গাছে উঠিয়াছিলাম। একটি পক্ষী তখন ডিমে তা দিতেছিল, আমাকে দেখিয়া সে উড়িয়া গেল। তাহার পর কয়েক দিন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সে গাছে আর বুলবুল আসেনা।

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আবার গাছে উঠিয়া দেখিলাম, শূন্য বাসাটি পড়িয়া আছে। বুলবুল যে তাহার ডিম চারিটি কোথায় সরাইল, অনেক খুঁজিয়াও তাহার আর সন্ধান পাইলাম না।

বুলবুল এই নামটী অতিশয় আদরের। পারস্য দেশের ভাষায় ইহার অর্থ গোলাপ রাজ্ঞী। পারস্য দেশের বুলবুল ও আমাদের দেশের বুলবুলে প্রভেদ অনেক। আমাদের দেশের কাব্যে কোকিলের স্থান যেমন অনেক উচ্চে, পারস্য দেশের কবিদের ভাষা সেইরূপ বুলবুলের অজস্র প্রশংসাগীতে পূর্ণ। সে দেশের বুলবুলের গানের মত মিষ্ট গান নাকি জগতে দুর্লভ।

নরেন্দ্র ও নলিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকিল। তিনি ঢাকা জেলার নরোত্তমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে গ্রামে একখানি বাড়ী ভিন্ন আর কিছুই নাই। আশুবাবু এলাহাবাদে সুন্দর অট্টালিকা ও সুরম্য পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতেছেন। দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে।

আশু বাবুর একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। মেয়েটির নাম নলিনী, বয়স আঠার বৎসর। সকলেই তাহার রূপ ও গুণের প্রশংসা করিয়া থাকেন। আশুবাবু বিলাত ফিরত ব্যারিষ্টারদিগের সঙ্গে মিশিয়া কতকটা তাঁহাদের ভাব পাইয়াছেন। সেই জন্য মেম রাখিয়া মেয়েকে লেখাপড়া, গানবাজনা ও চিত্রবিদ্যা শিখাইয়াছেন। নলিনী অনেক ভাল ভাল বই পড়ে এবং বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকায় উত্তম রচনা লিখিয়া থাকে। তাহার মায়ের শরীর ভাল থাকে না; এজন্য ঘরকন্না তাহাকেই দেখিতে হয়।

আশু বাবুর ছেলেটির নাম নরেন্দ্রনাথ। বয়স চৌদ্দ বৎসর। রূপে সে ঠিক কার্ত্তিকটির মত; কিন্তু যেমন রূপ তেমন গুণ নাই। সে সকলের অবাধ্য, তাহার কথায় কথায় রাগ; পড়াশুনায় একটুকু মন নাই; ফুর্ত্তি, আমোদ বাবুগিরি করিতে পাইলে সে আর কিছুই চাহে না। অথচ নরেন মায়ের বড় আদুরে ছেলে। মা বলেন—আমার ত ঐ একটি বই আর ছেলে নাই, কাজেই তাহার আদর আব্দার সহ্য করিতেই হইবে।"

এ বিষয়ে নরেনের বাবার মত ঠিক উল্টা। তিনি কিছুতেই ছেলের বাবুগিরির প্রশ্রয় দিতে রাজি নহেন। শুধু কি তাই? নরেনের উপর তাঁহার বড় কড়া শাসন।

নরেনের দুই চারিটি গুণের কথা এই খানেই বলা যাউক। সকালে বেলা হইবে, রোদ উঠিবে, তবু তাহার ঘুম ভাঙ্গিবে না। তাহার গরীব মাষ্টার বাবুটি তাহাকে দুঘণ্টা পড়াইয়া বাসায় যাইবে, স্নানাহার করিয়া আবার আফিশে ছুটিবে; কাজেই দেরি হইলে মাষ্টার বাবুর আর চলে না। তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই চাকরকে বলিতেন

"যাও বাপু, নরুকে ডেকে নিয়ে এস!"

চাকর নরুকে ডাকিত, কিন্তু সে কথা নরুর কাণে প্রবেশ করিত না। তখন তাহার মা ছুটিয়া ছেলের ঘরে যাইতেন। আশুবাবু নরেনের ঘুমের কথা শুনিতে পাইলে ধীরে ধীরে শোবার ঘরে আসিতেন এবং নরুর দুটী কান ধরিয়া পড়ার ঘরে লইয়া যাইতেন। কাজেই তিনি ভয়ে ভয়ে নরুর সুকুমার দুটি গণ্ডে হাত বুলাইয়া বলিতেন "বাবা আমার, লক্ষী আমার, শীগগির উঠে মুখ ধুয়ে খাবার খাও, তার পর পড়্‌তে যাও। ঐ দেখ গরম লুচি, বেগুণ ভাজা ও মিষ্টান্ন রেকাবে সাজানো রয়েছে।"

মাষ্টারের ভয়ে যতবা না হউক কিন্তু সদ্য গরম লুচি ঠাণ্ডা হইবার আশঙ্কায় নরু বাবুর ঘুম ভাঙ্গিত। এই রকম করিয়া মাতাই প্রত্যহ ছেলের ঘুম ভাঙ্গাইতেন।

নরেন প্রায়ই বিকাল বেলা চুলের নানা রকম কায়েদা করিয়া ফিন ফিনে ফরাসডাঙ্গার ধুতি পরি এবং রেশমের জামা গায়ে ও ফুলকাটা মোজা পায়ে দিয়া বেড়াইতে বাহির হইত। কিন্তু দৈবাৎ যেদিন বাহির বাড়ীতে বাবার সাম্‌নে পড়িয়া যাইত, সেইদিনই বিপদ। বাবা তখনই দাঁড় করাইয়া বলিতেন—

"বয়াটে ছেলেদের সঙ্গে মেশা হচ্ছে বুঝি? নইলে

এ রকম চুলের কায়দা করতে কোথায় শিখেছ? লজ্জা করে না? চুল দেখলেই যে একটা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে বলে মনে হয়।"

নরুকে তৎক্ষণাৎ চুলের রকম বে-রকম সিঁতি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বাহিরে যাইতে হইত।

একবার এলাহাবাদ সহরে ইংরাজ বালকদের সঙ্গে বাঙ্গালী ছেলেদের ফুটবল খেলা হইবে। নরেনের খুব ভাল একটা সাহেবী পোষাক পরিয়া খেলা দেখিতে যাইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু বাবার কাছে সাহেবি পোষাক পাইবার আশা নাই। কাজেই মায়ের সঙ্গে জিদ আরম্ভ হইল; মাকে কহিল "আমাকে একটা খুব ভাল সাহেবী পোষাক কিনে দিতেই হবে।"

মা। ভাল পোষাকের দাম কত টাকা?

নরু। চল্লিশ টাকা।

মা। বাপ্‌রে! একদিন খেলা দেখার জন্য অত টাকা খরচ করতে হবে? তোর বাবা জান্‌তে পারলে যে ভয়ানক বিরক্ত হবেন।

নরু। জান্‌তে পারলে ত।

মা। না, আমি একটা পোষাকের জন্য অত টাকা দিতে পারি না।

আর কি রক্ষা আছে? সেদিন নরেন রাগ করিয়া খাবার সময় খাইল না; অভিমান করিয়া বিছানায় শুইয়া রহিল। মা আর আপনার কথা রাখিতে পারিলেন না। ছেলেকে নগদ চল্লিশটি টাকা গুণিয়া দিয়া তবে তাহার রাগ থামাইলেন। নরু টাকা পকেটে পুরিল, তাহার পর প্রসন্ন মনে আহার করিতে বসিল।

পর দিন নরেন সাহেবের দোকান হইতে পোষাকটি কিনিয়া আনিল উহা পরিয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের একটি গুপ্ত দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই রাত্রি হয়! নরেন দরজা খুলিয়া বাহির হইবামাত্র তাহার সম্মুখে আশুবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি নরেনকে কহিলেন—

"এই দরজা খুলে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

নরেন। মাঠে ফুটবল খেলা দেখ্‌তে যাচ্ছি।

পিতা। মাথায় হ্যাট ও পরণে সাহেবী পোষাক কেন?

নরেন। অনেকে সাহেবের ছেলে খেলার জায়গায় ভিড় করে দাঁড়াবে, ধুতি চাদর পরে গেলে তারা আমাকে ঢুক্‌তেই দেবে না।

পিতা। তার জন্য এত জাঁকালো পোষাক কেন? পোষাকের দাম কত টাকা?

নরেন। আজ্ঞে তাড়াতাড়ি সাহেবের দোকান থেকে কিন্‌তে হয়েছে বলে বেশি দাম নিয়েছে; পোষাকটি চল্লিশ টাকায় কিনেছি।

চল্লিশ টাকার কথা শুনিয়াই আশু বাবুর রাগ হইল। তিনি চাকরকে ডাকিয়া কহিলেন—

"হরে, শিগ্‌গির বাড়ীর ভিতর গিয়ে নরুর পরিষ্কার ধুতি চাদর আর একটা জামা নিয়ে আয় ত।"

হরিচরণ আশুবাবুর কথামত কাজ করিল। আশুবাবু নরেনকে কহিলেন—"পড়াশুনায় তোমার একটুকু মন নেই; তুমি বড় হয়ে চাকুরি করে মাসে চল্লিশ টাকা উপার্জ্জন করতে পারবে কিনা সন্দেহ। আমি কিছুতেই তোমার এ বাবুগিরির প্রশ্রয় দিতে পারব না। তুমি এত টাকা খরচ করে পোষাক কিনলে কেন? এই অন্যায় কাজের জন্য তোমার খেলা দেখ্‌তে যাওয়া বন্ধ করলেই ঠিক শাস্তি হত। তুমি নিজে বেশ ফুটবল খেলতে পার বলে আমি মনে মনে খুসী; সেইজন্য তোমার খেলা দেখতে যাওয়া বন্ধ করব না। কিন্তু তোমাকে এই ধুতি চাদর পরেই যেতে হবে। নূতন পোষাকটি আমি সাহেবদের অনাথ আশ্রমের একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দেব।'

নরেন ধুতি চাদর পরিয়াই খেলা দেখিতে চলিল।

থিয়েটার দেখা নরেনর আর একটি রোগ। সে প্রতি বুধবার ও শনিবার রাত্রি জাগিয়া থিয়েটার দেখিবে। তাহাকে এমন নেশায় ধরিয়াছে, শরীর খারাপ হইলেও থিয়েটারে যাইবে; বাৎসরিক পরীক্ষার আগের দিন থিয়েটার হইলেও রাত্রিতে সে না পড়িয়া থিয়াটারের
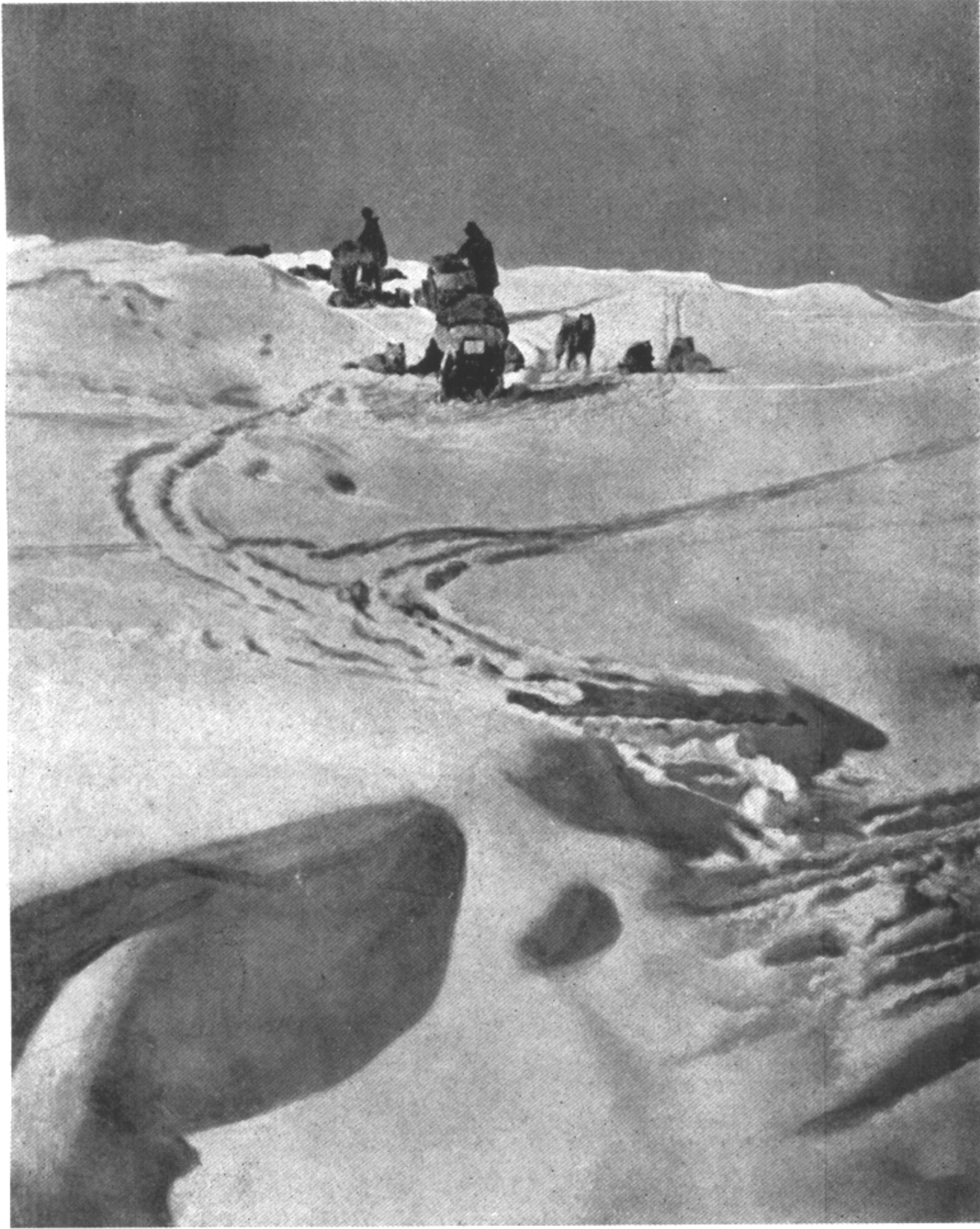
বরফের পাহাড়ের উপর দিয়া গমন।

দিকে ছুটিবে। আশুবাবু বাহির বাড়ীতে কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, ভিতর বাড়ীতে নরেন যে কি করে,তাহা জানিতেও পারেন না। তিনি এক শনিবার সন্ধ্যাকালে নিজেই নরেনকে বাড়ীর গড়ীতে চড়াইয়া বলিলেন, "নরেন, নীতি সভায় ভাল ভাল লোকেরা উপদেশ দেন; তা শুনলে তোমার খুব উপকার হবে। আজ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা হবে, তুমি শুন্‌তে যাও। আমি ত তাঁর কথা তোমাকে বলেছি। বাঙ্গালাদেশে তাঁর মত তেজস্বী ও দয়াবান পুরুষ অল্পই জন্মেছেন।"

এই কথা বলিয়া আশুবাবু ত ছেলেকে নীতিসভার দিকে পাঠাইলেন। কিন্তু গুণধর ছেলেটি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া গাড়ীর কোচয়ানকে বকসিস দিল এবং গাড়ী লইয়া সটান পার্শী থিয়েটারের দিকে চলিল। কোচয়ান বকসিস পাইয়া সকল কথা গোপন করিল; আশুবাবু ভাবিলেন তাঁহার ছেলে নীতি সভায় বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছে। অথচ নরেন থিয়েটার দেখিয়া রাত্রি এগারটার সময় বাসায় ফিরিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশু বাবু বার বৎসর পরে এবার দেশে যাইবেন। বাসার সকলেই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। নলিনী খুব ছেলেবেলায় দেশে গিয়াছিল; তখন সে কিছুই বুঝিত না। নরেন ত কোন দিনই দেশে যায় নাই। তাহারা বৃহৎ পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীর মধ্য দিয়া ষ্টীমারে যাইতে লাগিল এবং নানা রকম দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতে লাগিল। পদ্মার বড় বড় ঢেউগুলি এক রকম শব্দ করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া তীরের সাদা বালির উপর গিয়া পড়িতেছে; ছোট ছোট মাছগুলি ঢেউয়ের সঙ্গে তীরের কাছে যাইবামাত্র চিল ও বকে ছোঁ মারিয়া ধরিতেছে; গ্রামের পুরুষ মেয়ে জলে নামিয়া স্নান করিতেছে; ছেলেরা নদীর ধারে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া লোকদিগকে দেখিতেছে; এক একটা দুষ্ট ছেলে দূর হইতে ষ্টীমারের দিকে ঢিল ছুঁড়িয়া আপনাকে মস্ত বীর মনে করিতেছে।

পদ্মার তীরে কোথাও বা সবুজ রঙের ধানের ক্ষেত, কোথাও বা খড়ের ঘর, আম কাঠালের বাগান; কোথাও বা এক একটা পাকা বাড়ীর অর্দ্ধেকটা পদ্মায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাকী অর্দ্ধেকটা শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িবে এই ভয়ে বাড়ীর লোকেরা জিনিস পত্র লইয়া দূরে পলাইয়া যাইতেছে। পদ্মার এক একটা চরের উপর নানা রকম সুন্দর সুন্দর পাখী বসিয়া আছে, তাহারা যেন মাছ ধরিবার উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য গভীর চিন্তা করিতেছে। জেলেরা লম্বা লম্বা এক একটা নৌকায় দাঁড়াইয়া জলে জাল ফেলিতেছে এবং ইলিশ মাছ ধরিতেছে। দুই তিনটা "বাইচ" খেলিবার নৌকার লোকেরা খুব জোরে নৌকা চালাইতেছে এবং এক দল ছোকরা খঞ্জনী বাজাইয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছে এবং পূর্ব্ববঙ্গের "সারিগান" গাহিতেছে। দুই একটা ষ্টেসনে ষ্টীমার থামিতেছে আর গলায় তুলসীর মালা পরা ছেলেরা বিক্রমপুরের দই ও পাতক্ষীর লইয়া যাত্রীদের কাছে বিক্রী করিবার চেষ্টা করিতেছে; বাঁশী বাজিয়া উঠামাত্র কোলাহল করিয়া ছুটিয়া ষ্টীমার হইতে পলাইতেছে। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া নূতন লোকের বড়ই কৌতুক বোধ হয়। নলিনী ও নরেন অবাক্ হইয়া সকল দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আশুবাবু ষ্টীমার হইতে একটি ষ্টেসনে নামিলেন এবং একখানি পিনিস ভাড়া করিয়া খালের ভিতর দিয়া গ্রামে চলিলেন। খালের জল ভয়ানক কালো আবার সেই কালো জলের উপর দিয়া বিলের শেওলা ভাসিয়া চলিয়াছে। নলিনী ও নরেন গ্রামে গিয়া দেখিল সে যেন ছোট একটি দ্বীপ। চারিদিকে কালো জল থৈ থৈ করিতেছে; তার মাঝখানে ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম শোভা পাইতেছে। নৌকা না হইলে কোথাও যাওয়ার যো নাই। নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরাও ডিঙ্গি নৌকা, কলা গাছের ভেলা বাহিয়া এক পাড়া হইতে আর এক পাড়ায় যাইতেছে।

গ্রামে নলিনীকেই কিছু মুস্কিলে পড়িতে হইল। চারিদিকে সারি সারি লোকের বাড়ী সে একটু ঘরের বাহির হইলেই কৃষকদের ছোট ছেলেরা বোনদের ডাকিয়া বলিয়া উঠিত "ওরে দেখ্‌সে মেয়েলোকের পায়ে জুতো ?" গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা নলিনীর গান শুনিবার জন্য আশুবাবুকে ধরিয়া বসিতেন। নলিনীর অপরিচিত লোকের কাছে গান গাইতে বড় লজ্জা বোধ হইত। তবু বুড়ামানুষদিগের অনুরোধে এস্রাজ বাজাইয়া গান গাহিত। তাহার মুখে ধর্ম্মসঙ্গীত শুনিয়া বৃদ্ধ লোকেরা চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেন এবং বলিতেন, "মা তুমি রূপে লক্ষ্মী গুণে স্বরস্বতী। আমরা আশীর্ব্বাদ করি ভগবান তোমাকে সুখে রাখুন।"

কিছুদিন পরে ক্ষুদ্র গ্রামখানি নলিনীর বড় ভাল লাগিল। সে দেখিল গ্রামের মেয়েরা খুব সরল এবং গরীব কৃষকেরা বড় ভাল মানুষ। তাহারা সহরের ছল চাতুরী তেমন কিছুই জানে না। অল্পতেই খুব খুসী হয়। নলিনীদের পাড়ায় কয়েক ঘর কৃষক এবং কয়েক ঘর জেলে, তেলী ও ধোবা বাস করিত। ঐ সকল লোকেরা আশুবাবুর প্রজা। ধীরে ধীরে নলিনীর লজ্জা যখন একটু কমিল, তখন সে একটি ঝি সঙ্গে লইয়া সকলেরই বাড়ী বেড়াইতে যাইত। প্রায়ই ছোট ছেলে মেয়েদের কাপড় জামা, খেলনা উপহার দিত। মেয়েদের সঙ্গে গল্প করিত। তাহারা নলিনীর কাছে কাশী, প্রয়াগ ও আগ্রা, দিল্লীর গল্প শুনিয়া অবাক হইয়া যাইত। নলিনী রামায়ণ, মহাভারত খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছিল; মধুর কণ্ঠে উহার গল্পগুলি মেয়েদের শুনাইত, আর তাহারা আনন্দে ভাসিয়া যাইত। এই সকল গরীব লোকদিগকে বিশেষ অভাবে পড়িতে দেখিলেই সে তাহার নিজের হাত খরচের টাকা দিয়া সাহায্য করিত। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এ রকম মেয়ে আর কখনই দেখে নাই। তাহারা নলিনীকে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। সহৃদয় আশুবাবু ইহা লক্ষ্য করিয়া খুব খুসী হইলেন। তিনি মেয়ের হাত দিয়া দরিদ্রদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

জগদীশ তর্কালঙ্কার।

বাল্যকালই শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময় বটে; কিন্তু কোন কারণে বাল্যকালে কাহারও লেখা পড়া না হইলে পরে যে কিছুতেই হইতে পারেনা এমন কোন কথা নাই। দুঃখের বিষয় অনেকে এ সম্বন্ধে বড় ভুল করিয়া বসেন। তাঁহারা মনে করেন, যখন ছোট থাকিবে তখনই লেখা পড়া শিখিবে, বড় হইলে আর কিছু হয় না, তখন টাকার চেষ্টা করাই উচিত। এজন্য আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিমান ছেলে, ছোট বেলায় দারিদ্র্য বা অন্যকোনও কারণে লেখাপড়ার সুযোগ না পাইয়া পরে সে সুযোগ উপস্থিত হইলেও গ্রহণ করিতে পারেনা, এবং চিরদিন মূর্খ থাকিয়া যায়। বাস্তবিক দেশ বিদেশের বড় বড় লোকের জীবনী খুঁজিলে দেখা যায়, তাঁহাদের অনেকেই বাল্যকালে কিছুই লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই; অবশেষে যখন নিজেদের মূর্খতার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখনই তাঁহাদের অন্তরে এক নূতন আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এবং অটুট অধ্যবসায় ও দৃঢ় সংকল্পে, উন্নতির উচ্চতম সোপানে উঠিয়া পৃথিবীতে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের কবি কালিদাসকে কে না জানেন, তাঁহার সম্বন্ধে কতই না অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। প্রবাদ আছে তিনি বাল্যকালে ঘোর মূর্খ ছিলেন; এমন কি গাছের ডালে উঠিয়া যে ডালে বসিয়াছিলেন সেই ডালই কাটিতে ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। শেষে একদিন নিজের মূর্খতার কথা বুঝিলেন, অন্তরের আগুণ জ্বলিল; আর তিনি সে মূর্খ রহিলেন না; ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইলেন।

আজ এরূপ আর একটী লোকের কথা তোমাদিগকে বলিব। তোমরা হয়ত নবদ্বীপের কথা অনেকেই শুনিয়াছ। এক সময় এই নবদ্বীপ বাঙ্গলা দেশের একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। কলিকাতার মত তাহার ধন সম্পত্তি বা প্রাসাদাবলী ছিল না। কিন্তু তাহার যে সম্পত্তি ছিল, সেইটাই বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। নবদ্বীপ বিদ্যার জন্য বিখ্যাত ছিল। আজ কালও বিলাতে

কেম্বিজ অক্সফোর্ড প্রভৃতি কেবল বিদ্যালোচনার জন্য বিখ্যাত। এই নবদ্বীপে প্রায় তিন শত বৎসরের ও অধিককাল পূর্ব্বে জগদীশ তর্কালঙ্কার নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন।

জগদীশের পিতা যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ জগদীশকে পাঁচ বৎসরের শিশু রাখিয়া মারা যান। তারপর জগদীশের বড় ভাই সংসারের কর্ত্তা হইলেন। জগদীশ বাল্যকালে বড় দুষ্ট ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাহার দুষ্টামি আরও বাড়িয়া গেল; তিনি লেখা পড়া কিছু শিখিলেন না; তাহার ভাইয়ের সংসার চালাইবার মত সংস্থান বেশী ছিলনা। চৈতন্য দেবের বিগ্রহ সেবায় যে কিঞ্চিৎ আয় ছিল তাহাতে কোন মতে দিন যাইত; সুতরাং ছোট ভাইটী মূর্খ হওয়ায় তাহার বড়ই কষ্ট হইল। ইহার উপর জগদীশের দৌরাত্ম্যে পাড়ার লোক অস্থির হইত। তিনি জগদীশকে এজন্য যথেষ্ট তাড়না করিতেন। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইত না। এইভাবে জগদীশের বয়স আঠার বৎসর হইল, তথাপি তাঁহার বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত জন্মিল না।

জগদীশ একদিন পাখীর ছানা পাড়িতে একটা বড় তাল গাছে উঠিয়াছেন। ঐ গাছের কোটরের ভিতরে কেউটে সাপের বাসা ছিল। যেমনি তিনি ছানা আনিবার জন্য কোটরের ভিতর হাত দিয়াছেন অমনি কেউটে সাপ ফোঁস করিয়া তাঁহাকে ছোঁ মারিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বালক জগদীশ তাহাতে ভীত বা কর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া ধীরে ধীরে সাপটীর ফণা আঁকড়াইয়া ধরিলেন। তোমরা তাল গাছ অনেকে দেখিয়া থাকিবে। উহার ডালের গোড়া কেমন ধারাল তাহাও জান। জগদীশ হাত হইতে সাপের এক একটী প্যাঁচ ছাড়াইয়া তালের ধারাল ডালে কাটিয়া ফেলিতে লাগিলেন; এইরূপে সাপটী বিনষ্ট হইল। সেই সময়ে একজন সন্ন্যাসী সেই স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন। তিনি জগদীশের এই কাণ্ড দেখিলেন। দেখিয়াই বুঝিলেন বালক কেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি। জগদীশ বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিলে তিনি তাহার লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন শুনিলেন তিনি কিছুই শিখেন নাই তখন অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এবং জগদীশকে লেখাপড়া শিখিবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। তাঁহারই সদুপদেশে বালক স্বীয় মূর্খতা বুঝিতে পারিলেন, তাহারও অন্তরের আগুন জ্বলিল। এখন আর দিন নাই, রাত্রি নাই, প্রভাত নাই, সন্ধ্যা নাই, সকল সময়ে জগদীশ পাঠাভ্যাস করিতেন। রাত্রিতে পাছে ঘুমাইয়া পড়েন এই ভয়ে কেশের অগ্রভাগ দড়ি দিয়া ঘরের চালার সহিত বাঁধিয়া রাখিতেন,ঘুম আসিলে দড়িতে টান পড়িত, অমনি জাগিয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন। অর্থাভাবে তৈলের সংস্থান হইত না; এজন্য তিনি দিনে বাঁশের পাতা কুড়াইয়া রাখিতেন এবং রাত্রিতে তাহা জ্বালিয়া পাঠ করিতেন। এইরূপ কঠোর পরিশ্রম, এবং দৃঢ় সংকল্পের গুনে জগদীশ দুই তিন বৎসরের ভিতর ব্যাকরণ, কাব্যও অভিধান সমস্ত শেষ করিয়া ফেলিলেন।

বাল্যকালে তাঁহার জ্বালায় লোকে অস্থির হইয়া, কেহই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলনা, লোকে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া 'জগা' বলিয়াই ডাকিত। কিন্তু তাঁহার এইরূপ মনোযোগ দেখিয়া সকলেই খুব খুসী হইল। এখন আর তাহাকে কেহ 'জগা' বলেনা, সকলে আদর করিয়া "জগু" বলিয়া ডাকে।

জগদীশ কাব্য ব্যাকরণ ও অভিধান শেষ করিয়া ন্যায় শাস্ত্র পড়িতে ইচ্ছা করেন। তখন নবদ্বীপে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ নামে একজন ন্যায় শাস্ত্রের বড় অধ্যাপক ছিলেন। জগদীশ তাঁহার নিকট পড়িতে গেলেন; তিনি প্রথমে জগদীশের অল্প বয়স দেখিয়া তাহাকে পড়াইতে চাহিলেন না। পরে যখন তাহার বুদ্ধির পরিচয় পাইলেন, তাহার অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং আনন্দে আপন ছাত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

একদিন ভবানন্দ বাড়ীর ভিতর সন্ধ্যার পূজা করিতেছেন, এবং ছাত্রগণ চতুষ্পাঠীতে বসিয়া পরস্পরে আলোচনা তর্ক বিতর্ক করিতেছে, এমন সময় এক জনের

সুমধুর গম্ভীর স্বরে তর্ক বিতর্ক শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন কে ঐরূপ সুন্দর তর্ক বিতর্ক করিতেছে; যখন জানিতে পারিলেন, ইনি তাঁহারই ছাত্র জগদীশ, তখন আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ধন্য আমি যে আমার এমন শিষ্য। অতঃপর গদগদ স্বরে তিনি নিম্ন লিখিত শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন—

আদৌ জগা জগুঃ পশ্চাৎ জগা জগুরনন্তরং

অধুনা জ্ঞান সম্পত্যাং জগদীশায়তে জগা"

অর্থাৎ যে আগে 'জগা' ছিল, পরে "জগু" হইল সে এখন দেখিতেছি জ্ঞান সম্পত্তিতে "জগদীশ" অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।

এই জগদীশ গুরুর নিকট তর্কলঙ্কার উপাধি লাভ করিয়া নিজেই ছাত্র পড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট বহু ছাত্র পড়িতেন। তিনি দীধিতি প্রভৃতি বহু ন্যায় গ্রন্থের অতি সুন্দর টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি ঐ সমুদয় টীকা সকলে পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহার 'শব্দ শক্তি প্রকাশিকা" নামে প্রসিদ্ধ মৌলিক গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থ শিক্ষিত সমাজে খুব আদরের সঙ্গে পঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীশরৎকুমার সেন গুপ্ত বি, এ,

সুরেনের প্রলোভন।

(১)

"দাদা, আমি কেবল তোমায় কষ্টই দিচ্ছি, তুমি সারাদিন পরিশ্রম কর, কোথায় আমি তোমায় যত্ন করব, না তুমি বিশ্রামের সময়টুকু ও আমার বিছানার পাশে কাটাও। আমার এ রোগ আর সার্‌বেনা, বোধ হয় আর বেশী দিন আমায় এ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবেনা।"

ভগিনীর কথাগুলি শুনিয়া সুরেনের চক্ষে জল আসিল। সে দ্রুতপদে ভগিনীর শীর্ণ হস্তখানি ধরিয়া বলিল, "কমলা, ও রকম কথা ব'লনা। মা বাবা আমাদের জন্মের মত ছেড়ে যাবার পর তুমি ছেলে মানুষ হয়েও আমাদের সংসার কি কষ্ট করেই চালিয়েছিলে' সে সব ভুলে যাচ্ছ? তুমি আমার যত যত্ন করেছ, তার শতাংশ ও ত আমি কর্‌তে পারি না। ডাক্তার বলেছেন, যে অস্ত্র করিলেই ঘা সেরে যাবে।"

"না, দাদা, অস্ত্র করাতে হ'বে না।"

"কিন্তু ডাক্তার বলেছেন—"

"ডাক্তার কি বলেছেন তা আমি জানি। যদি তিনি কর্‌তেন তবে আমি কিছু বল্‌তাম না। তিনি বিনা টাকায় এতদিন ধরে যে দয়া করে আমায় দেখ্‌ছেন একি তাঁর কম অনুগ্রহ? কিন্তু যখন সহরের অস্ত্র চিকিৎসককে ও একজন শুশ্রূষাকারিণীকেও আনাতে হ'বে তা'তে আমি মত দিতে পারিনা। এ সকলে পঞ্চাশ টাকার কম খরচ লাগ্‌বেনা, আর আমরা এত গরিব।"

"তুমি কি মনে কর পঞ্চাশ টাকার জন্য আমি তোমায় মৃত্যু মুখে যেতে দেব?"

সে দিন ডাক্তার নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোগীকে দেখিতে আসিয়া সুরেনকে বলিলেন, "তিন সপ্তাহের মধ্যেই অস্ত্র করা উচিত। অভয় বাবুর মত সুনিপুণ অস্ত্র চিকিৎসক আর নাই। যদিও তিনি অস্ত্র করিতে অনেক টাকা লইয়া থাকেন তবে তোমার কাছ থেকে বেশী লইবেন না। পঞ্চাশ টাকা হলেই অস্ত্র করা ও কয়েক দিনের জন্য একজন শুশ্রূষাকারিণী রাখা হইতে পারে।"

সুরেন আর্য্য ফুটবল ক্লাবের গোলকিপার ছিল। সে একজন উৎকৃষ্ট খেলোয়াড়। ডাক্তার ভাবিলেন, যে যখন ম্যাচ হয় তাহাতে যদি সুরেন যোগ দেয়, তবে হয়ত সে কিছু টাকা পুরস্কার স্বরূপ পাইতে পারে।

এমন সময় একটেলিগ্রাফ আসিল। সুরেন তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখিল শীঘ্রই একটা খুব বড় ম্যাচ হইবে আর তাহাকে গোলকিপার হইতে হইবে।

ডাক্তার এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "তুমি সহরে যাও, আমি তোমার বোনকে প্রতিদিন দেখিব। আর তুমি যতদিন ফিরে না আস আমার দিদি এখানে থাক্‌বেন।"

সুরেন দরিদ্রের বন্ধু সহৃদয় ডাক্তারের দুই হস্ত ধরিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আপনার স্নেহের ঋণ আর এ জন্মে শোধ কর্‌তে পার্‌ব না।"

ডাক্তার তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিলেন "আমার পুত্র নাই, তোমাদের গুণে আমি তোমায় পুত্রের মত ভালবাসি। তুমি ছেলে মানুষ আর এমন বিপদে পড়েছ, তোমায় সাহায্য করা আমার উচিত। আবার ঋণের কথা বল কেন?"

এই বলিয়া ডাক্তার দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

কমলা সকল শুনিয়া দাদাকে সহরে যাইতে বলিল। সুরেন বলিল "আমার ভয় হয়, হয়ত তেমন ভাল খেলিতে পার্‌ব না। তখন কি লজ্জায়ই পড়িব।"

কমলা বলিল "দাদা ভয় পাও কেন? আমি জানি তুমি জয়লাভ কর্‌তে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌বে; ফল ঈশ্বরের হাতে।"

(২)

সুরেন সহরে আসিয়াছে। বিস্তৃত মাঠে তাহাদের ম্যাচ খেলিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দুই তিন দিন সে কেবল সহরের নানাস্থান দেখিয়া বেড়াইয়াছে। আজ তাহাদের ম্যাচ খেলিবার দিন। সে নদীর ধারে একাকী বেড়াইতেছিল, এমন সময় দেখিল, একজন লোক তাহাকে একদৃষ্টে দেখিতেছে ও তাহার দিকে আসিতেছে। লোকটী ক্রমে নিকটে আসিয়া বলিল "তোমার নাম সুরেন ঘোষ, না?" তখন সুরেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "হাঁ"। "তোমার বোন এখন ভাল আছে ত?"

"না, সেই রকমই আছে।"

সুরেন দেখিল যে ভদ্রলোকটী তাহার সকল সংবাদই জানেন।

"জান, আমার বোনেরও ঠিক্ ঐ রোগ হইয়াছিল। তাকে ভাল করিতে আমার একশত টাকা লাগিয়াছিল; কিন্তু টাকা খরচ করা সার্থক হইল। তুমি কখন একশত টাকা এক সঙ্গে দেখেছ?"

"না, আমি কখন দেখি নাই।"

তখন সেই লোকটী তাঁহার পকেট হইতে এক শত টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন "এই দেখ। এই কাগজ গুলি দিয়া কি কাজই না হয়, এই টাকা দিয়া তোমার বোনের চিকিৎসা ইত্যাদি সকলই হইবে।"

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় তিনি বলিলেন "তুমি এ টাকা গুলি রাখ্‌বে কি?"

সুরেন অবাক্ হইয়া বলিল "আমাকে কেন টাকা দিতেছেন, আমিত আপনার কোন উপকার করি নাই।"

"আমার কোন উপকার কর নাই, কিন্তু করিতে পার। তুমি যদি যে "গোলে" তোমাদের দলের পরাজয় হইবে সেটাকে ছেড়ে দাও, তা হ'লে তুমি আমার উপকার কর্‌তে পার। তুমি এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিও না আর এই টাকাগুলি লও।"

সুরেনের হস্তে যখন ঐ ভদ্রলোকটী নোট গুঁজিয়া দিলেন তখন তাহা যেন তাহাকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল; সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নোট ফিরাইয়া দিয়া দৌড়িয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

(৩)

খেলিবার সময়ের একটু পূর্ব্বে সুরেন তাহার ভগ্নীর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইল। সে লিখিয়াছে, "দাদা আমি জানি তুমি জয়লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। আর যখন জয়লাভ করে ফিরে আস্‌বে তখন আমার কি আনন্দই হইবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" সুরেন বলিয়া উঠিল, "তুমি জাননা, তোমার কথাগুলিই রাত দিন কানে বাজিতেছে।"

এমন সময়ে একজন বালক তাহার হস্তে এক টুক্‌রা কাগজ দিয়া গেল, সে খুলিয়া দেখিল, তাহাতে লেখা রহিয়াছে "যদি তুমি হারাইতে পার তবে সকল টাকা তোমার—মনে আছেত একজনের জীবন তোমার উপর নির্ভর করিতেছে।"

ইহা পড়িয়া তাহার প্রাণ দুঃখে অথির হইয়া উঠিল সে বলিল "পৃথিবীর মধ্যে আমার একমাত্র স্নেহের ভগিনীর জীবন আমার উপর নির্ভর করিতেছে, আর

এই ত টাকা পাইতেছি।" ইহা মনে হইতেই তাহার ভগিনীর স্নেহপূর্ণ পত্রখানি পুনরায় পড়িল। তাহাতে তাহার হৃদয়ে বল আসিল, এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে টাকার কথা ভাবিয়াছিল সেজন্য লজ্জায় তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ পত্র খানি ছিঁড়িয়া ফেলিল। বাতাসে তাহা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইল ; কিন্তু ঘটনাক্রমে এক টুক্‌রা তাহার দলেরই এক খেলোয়াড়ের পায়ের নিকট পড়িল। সে কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিল তাহাতে লেখা রহিয়াছে—"যদি হারাইতে—সব টাকা —জীবন নির্ভর করিতেছে।" সে কাগজখানি যত্নে মুড়িয় পকেটে রাখিল।

খেলা আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ খেলা চলিতে লাগিল কিন্তু কোন পক্ষ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিল না। কয়েক মিনিটের জন্য সকলে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত খেলা আরম্ভ হইল। কতবার বিপক্ষদলের বল সুরেনের অতি নিকটে আসিয়াছে ; সে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত তাহা ফিরাইয়া দিয়াছে। একবার বিপক্ষ দল একটা গোল দিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সুরেনের দলেরাও আর একটা গোল দিল। পরে আর মাত্র পাঁচ মিনিট খেলিবার সময় রহিল। দর্শকগণ কোন দল এবারে জিতিবে তাহা দেখিবার জন্য অতীব ব্যাকুল হইল। সহস্র সহস্র লোক শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছিল। সুরেনের মুখ গম্ভীর। তাহার কাণে তাহার স্নেহময়ী ভগিনীর আশাপূর্ণ বাণী জাগিতেছিল। সুরেন প্রলোভন হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য বারম্বার ভগবানের নিকট বল ভিক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ বিপক্ষ দলের বল তাহার অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিল ; সে তৎক্ষণাৎ কি অলৌকিক বলে অতি কৌশলে সেই বল উচ্চে নিক্ষেপ করিল। তাহারা জয়লাভ করিল দর্শকমণ্ডলী জয়ধ্বনিতে মেদিনী কম্পিত করিল।

সুরেন চলিয়া যাইতেছে এমন সময় একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাহাকে ডাকিলেন। তিনি সুরেনকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া তাহার হস্তে সেই কাগজের খণ্ড দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সুরেন, এর অর্থ কি? আমি দেশের ফুটবল সভার একজন সভ্য ; আমার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে। এক স্থানে 'টাকা' আর একস্থানে "হারাইতে" এই কথাগুলির মধ্যে নিশ্চয় কোন গুপ্ত রহস্য আছে। নিশ্চয় বিপক্ষদল তোমায়—

সুরেন বলিল "না, না, তারা এটা লেখেনি। যারা বাজী রাখে, তাদের মধ্যে কেউ এ কাজ করেছে, আমি যাতে নিজের দলকে হার মানাতে পারি সেজন্য টাকা দিচ্ছিল।"

"আচ্ছা, জীবন নির্ভর করছে" এর অর্থ কি? তোমাকে কি ভয় দেখিয়েছিল?"

তখন সুরেনের চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রু পড়িতে লাগিল। তাহার একমাত্র ভগিনীর কঠিন রোগ, এমন প্রলোভন, আবার ম্যাচে খেলা, ইত্যাদি কারণে তাহার মন অত্যন্ত উত্তেজিত ছিল। সুরেনের নিকট হইতে তিনি সকল সংবাদ জানিলেন।

(৪)

দুই দিন পরে গ্রাম্য ডাক্তার সুরেনের বাটীতে আসিলেন। তিনি বলিলেন "জান, অভয়বাবু আমায় টেলিগ্রাফ করেছেন, যে তিনি আজই তোমার বোনের ক্ষত স্থান অস্ত্র করিতে আসিবেন।

"আমি কি করে টাকা দেব—"

তিনি লিখেছেন যে কিছুই লইবেন না। আর বিনা মাহিনায় একজন শুশ্রূষাকারিণীকে এখানে পাঠাইবেন।

যথা সময়ে বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক আসিলেন ও নিরাপদে কার্য্য সমাধা করিলেন। সুরেন তাঁকে যে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিবে, ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার ভগ্নী দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিল। দুই ভ্রাতা ও ভগ্নী করজোড়ে ভগবানের নিকট তাহাদের প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইল।

আর একটী কথা, যিনি সেই সহরের ফুটবল সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য নামে সুরেনের নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনিই বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক অভয়বাবু। যদি সুরেন প্রলোভনে পড়িত তবে কি

ফলই হইত তাহা মনে করিলেই সুরেনের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত। *

শ্রীবাসন্তী মিত্র।

আদর্শবন্ধু।

তোমাদের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়াছ, তাহারা অবশ্য বিখ্যাত সম্রাট আকবরের নাম জান। আকবরের পিতা সম্রাট হুমায়ুন যখন কান্যকুব্জের শেষ যুদ্ধে বাঙ্গালার শাসন কর্তা শের খাঁ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন, তখন তাঁহাকে প্রাণভয়ে অত্যন্ত দুরবস্থায় ইরাণের দিকে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ হুমায়ুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সম্রাট আকবরের ভাবী অভিভাবক বৈরাম খাঁ তাঁহার সঙ্গ লইতে পারেন নাই।

বৈরাম খাঁ যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজনীতিতেও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এই সকল গুণের জন্য পাঠান শের খাঁ বৈরামকে বন্দী করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। বৈরাম খাঁ শত্রুর হস্ত এড়াইবার জন্য ছদ্মবেশে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এক বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। অবশেষে বৈরাম সম্বলের জমিদার মতবর্ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানেও তিনি অধিক দিন নিরাপদে থাকিতে পারিলেন না।

শের খাঁ কোন ক্রমে সংবাদ পাইয়া বৈরামকে তথা হইতে বন্দী করিয়া আপনার অধিকারে আনয়ন করিলেন। শের খাঁও অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসমসাহসিক পুরুষ ছিলেন। তিনি বীরের সম্মান করিতে জানিতেন। বন্দী অবস্থায় বৈরামের প্রতি যাহাতে কোন অত্যাচার বা ত্রুটি প্রদর্শিত না হয়, শের খাঁ তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। কিন্তু বৈরাম অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন; বন্দীশালায় স্বর্ণ পিঞ্জরের পক্ষীর মত তিনি ব্যথিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং এক দিন সুযোগ পাইয়া শের খাঁর অধিকার হইতে পলাইয়া গেলেন। এই সময় তাঁহার বন্ধু গোয়ালিয়রের হাকিম আবদুল কাশীম তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। একদিন তাঁহারা দুই জনে এক বৃক্ষ মূলে বসিয়া শত্রু হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পরামর্শ করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা এক দল পাঠান সৈন্য তাঁহাদের বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

এই সৈন্যদলের নেতা তাঁহাদের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আবদুল কাশীম সেনাপতির প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আমি মক্কাযাত্রী, গুজরাটের পথে যাইতেছি।" সেনাপতি বৈরামের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "উনি কোথা হইতে আসিতেছেন?" আবদুল কাশীম অনবধানতাবশত বলিয়া ফেলিলেন "ইনি বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিতেছেন।" সেনাপতির মনে সন্দেহ হইল। তিনি বৈরামকে দেখাইয়া তাঁহার কয়েকজন অশ্বারোহী সৈনিককে কহিলেন "তোমরা কেহ ইঁহাকে চিনিতে পার? আমার মনে হইতেছে, এ লোকটি মোগল পলাতকদিগের মধ্যে একজন, ছদ্মবেশ ধরিয়াছে।" সেনাপতির এই কথা শুনিয়া এক বৃদ্ধ অশ্বারোহী সৈনিক আবদুল কাশীমের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল "আমি ইহাকে চিনিতে পারিয়াছি, এই ব্যক্তি হুমায়ুনের বন্ধু বৈরাম খাঁ।" আবদুল কাশীম সেনাপতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, এমন সময় বৈরাম অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত মাথার পাগড়ী খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং শত্রুপক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমিই বৈরাম খাঁ, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন, কিন্তু নিরপরাধ বন্ধুর প্রাণবধ করিবেন না।" এই কথা শুনিয়া সকলে পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিলেন, দুইজনের মধ্যে কে যে বৈরাম এই চিন্তা শত্রুপক্ষকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিল। বৈরাম ও আবদুল কাশীমের আকৃতি অবিকল এক রকমের ছিল, সুতরাং উভয়ের মধ্যে কে বৈরাম খাঁ তাহা নির্দ্ধারণ করা পাঠানদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

আবদুল কাশীম যেমন উদার চেতা তেমনি বীর ছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। তিনি বিলম্ব না করিয়া শত্রুপক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন

* ইংরেজী পুস্তক হইতে গৃহীত।

"মহাশয়গণ আমি বৈরাম, আপনারা যাহাকে বৈরাম ভাবিতেছেন, সে আমার বিশ্বাসী ভৃত্য, আমার প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে বৈরাম বলিয়া পরিচয় দিতেছে। এই ব্যক্তি একবার নয় বহুবার এই প্রকারে আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, আপনারা আমায় বধ করুন প্রভুভক্ত ভৃত্যকে হত্যা করিয়া আমাকে কলঙ্কিত করিবেন না।" সৈন্যদলের নেতা আবদুল কাশীমের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তরবারির আঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। * শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

হিন্দুস্থানী-উপকথা

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

রামানন্দ বাবু বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের নিকট সুপরিচিত। সচিত্র অক্ষর শিক্ষা হইতে তাঁহার সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদের পরিচয়। তার পরে তাঁহার সম্পাদিত আরব্য উপন্যাস, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি পুস্তকে সে সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ট। সম্প্রতি তিনি "হিন্দুস্থানী উপকথা" নামে আর একখানি গল্পের পুস্তক প্রকাশিত করিয়া আমাদের দেশের বালকবালিকাগণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। পুস্তকখানি এলাহাবাদের পানিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শেখ চিল্লী প্রণীত Folk-tales of Hindusthan নামক পুস্তকের বাঙ্গলা অনুবাদ। আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় নানা দেশের "রূপ কথা" প্রকাশিত হইতেছে; ইহা ভাষা এবং জাতি উভয়েরই পক্ষে মঙ্গলজনক। যখন আমরা চীন জাপানের উপকথা কুড়াইতেছি, তখন আমাদের দেশে নানাস্থানে যে সব উপকথা আছে সে গুলিত অবশ্যই সংগৃহীত হওয়া উচিত। এলাহাবাদের পানিনি কার্য্যালয় এই কাজ করিয়া দেশের সকল লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। রামানন্দ বাবু সেই গল্প গুলিকে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায়ের অঙ্কিত বহু চিত্র সহ প্রকাশিত করিয়াছেন। গল্পগুলি অতীব চিত্তাকর্ষক। এ গুলি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লোকমুখে প্রচলিত ছিল; গল্পগুলি হইতে সে অঞ্চলের সামাজিক জীবনের বেশ একটু পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার দুই একটী গল্প বাঙ্গালা দেশেও প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালা হইতেই হিন্দুস্থানে যাউক বা হিন্দুস্থান হইতেই বাঙ্গালায় আসিয়া থাকিবে। কয়েকমাস পূর্ব্বে মুকুলে ইহার একটী প্রকাশিত হইয়াছিল। মুকুলের পাঠক পাঠিকাগণ তাহাতেই পুস্তকের আভাস পাইয়াছেন। কাগজ ছাপা সমুদয়ই উচ্চ অঙ্গের। বারটী গল্পে ৩৫ খানি ছবি। কেবল ভাষা ও বানানে কিছু ত্রুটী আছে। রামানন্দ বাবুর অন্যান্য শিশুপাঠ্য পুস্তকের ন্যায় এখানিরও বহুল প্রচার হয় ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

১। চশমা। ২। কমলা লেবু।

নিম্ন লিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীকমলেশ্বরী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীইব্রাহিম খাঁ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীএকাব্বর আলি খাঁ, শ্রীঅমর কিশোর দাসগুপ্ত, শ্রীরসিকলাল শীল, শ্রীকৃষ্ণমোহন আইচ, শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সাহিত্য সমিতির সভ্যগণ হাইস্কুল, দার্জ্জিলিং, শ্রীপরিমল রায়, শ্রীমতী কাদম্বিনী বন্দোপাধ্যায়, শ্রীসরোজকুমার বসু, শ্রীপ্রীতীন্দ্র কুমার হালদার, শ্রীইন্দ্রভূষণ বীদ, শ্রীসচ্চিদানন্দ দত্ত.

নিম্ন লিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীবসন্তগোপাল সিংহ, শ্রীতারকদাস ঘোষ. শ্রীজিতেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী লীলা গুপ্ত সম্পাদক ডিবেটিং ক্লাব ব্রাহ্মণগাঁও, শ্রীমতী স্নেহলতা মজুমদার, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীমতী রেণুকা মজুমদার শ্রীবিজয় গোপাল সিংহ, শ্রীজ্যোতিভূষণ সেন।

নূতন ধাঁধা।

শ্রীবিমলকৃষ্ণ ঘোষ প্রেরিত।

১। পৃথিবীর পেটে আমি করিতাম বাস,
কলিযুগে হল মোর মহা সর্ব্বনাশ,
নর আসি টেনে মোরে করিল বাহির,
তিন বর্ণ দিয়া নাম করিল জাহির।
আমার বুকের রক্ত করিয়া বাহির
কত শত পথ বাঁধে এই পৃথিবীর।
দেহটারে শুষে শুষে বাষ্প লয়ে যায়,
পথে ঘাটে ঘরে মোরে কাজেতে লাগায়।

২। তিন অক্ষরে নাম মম সর্ব্বলোকে জানে,
আমার শকতি আছে সকলেই মানে।
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে কণ্ঠে করি বাস,
শেষ টারে ছেড়ে দিলে ছাড়িবে হুতাশ।

---

* উর্দ্দ হইতে সঙ্কলিত।

অগ্ন্যুৎপাতের দিনে পম্পী।

মাঘ।
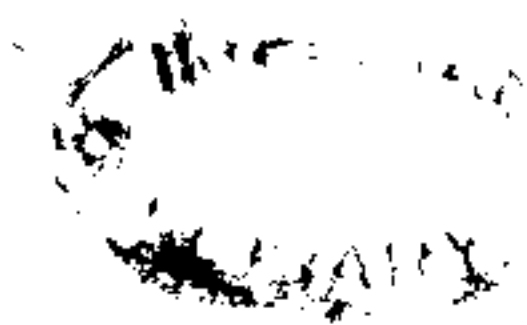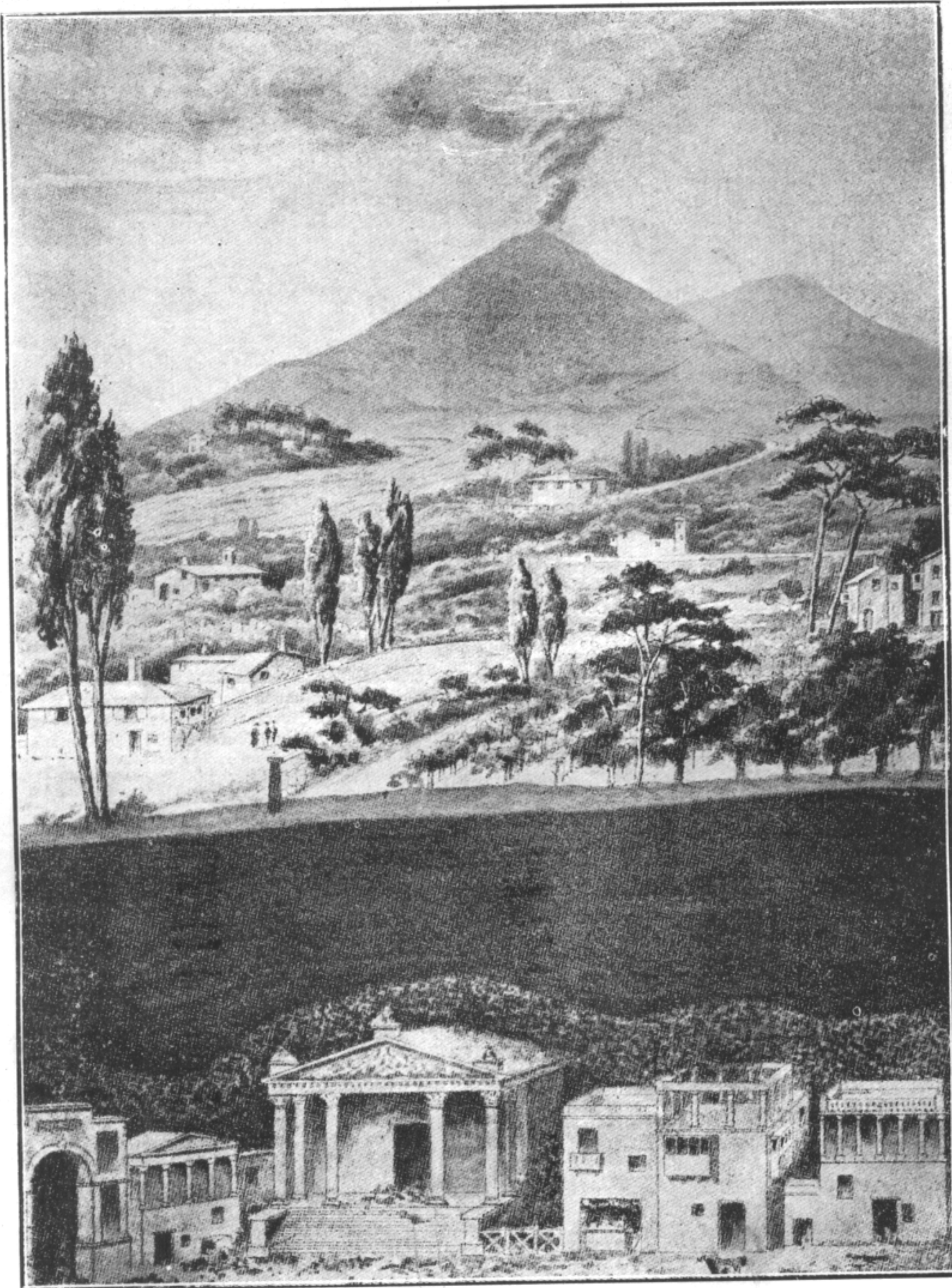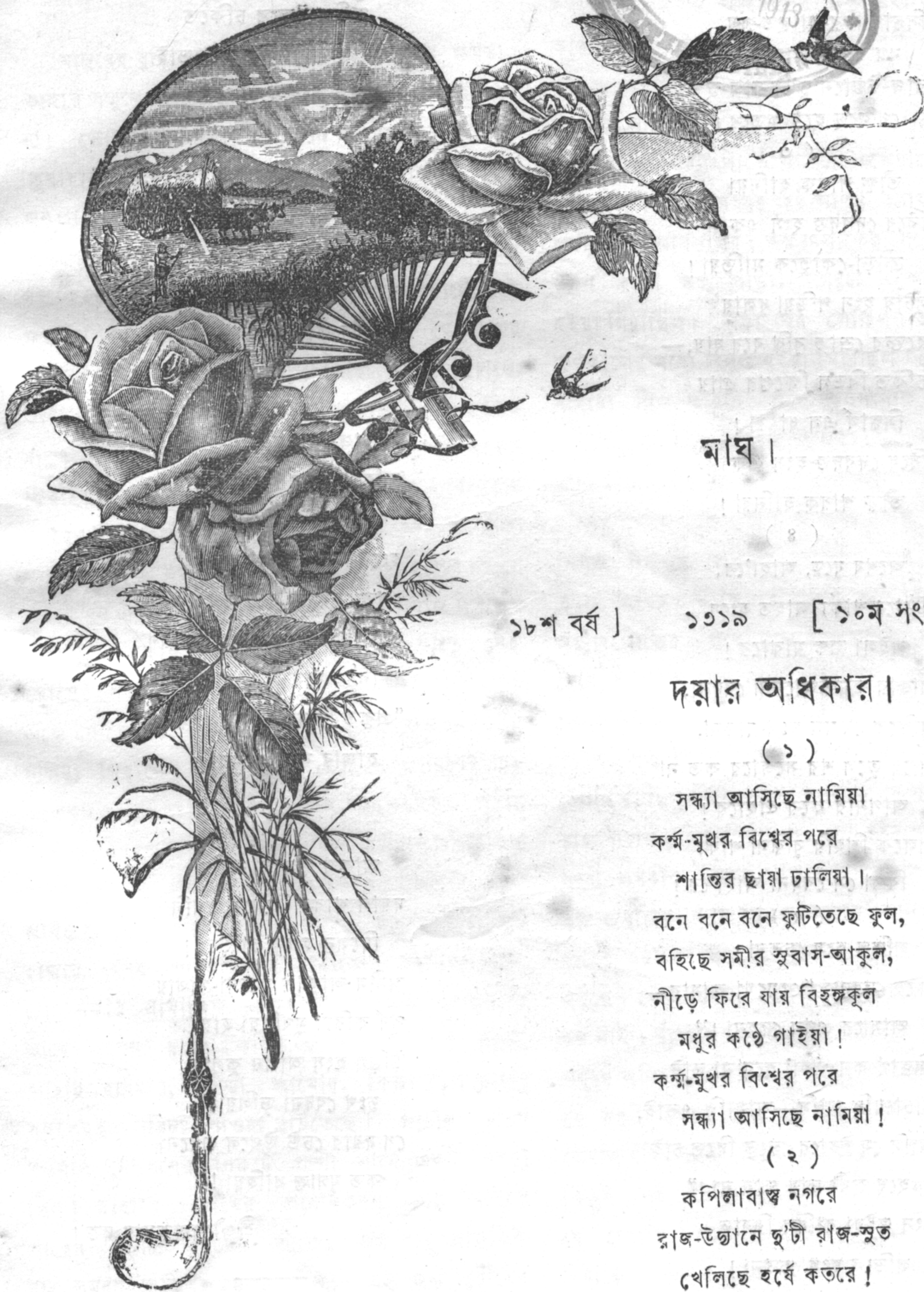
১৮শ বর্ষ] ১৩১৯ [১০ম সংখ্যা

দয়ার অধিকার।

(১)

সন্ধ্যা আসিছে নামিয়া
কর্ম্ম-মুখর বিশ্বের পরে
শান্তির ছায়া ঢালিয়া।
বনে বনে বনে ফুটিতেছে ফুল,
বহিছে সমীর সুবাস-আকুল,
নীড়ে ফিরে যায় বিহঙ্গকূল
মধুর কণ্ঠে গাইয়া!
কর্ম্ম-মুখর বিশ্বের পরে
সন্ধ্যা আসিছে নামিয়া!

(২)

কপিলাবাস্তু নগরে
রাজ-উদ্যানে দু'টী রাজ-সুত
খেলিছে হর্ষে কতরে!

দেবদত্ত সে দেবের মতন
অতি সুকুমার—করে শরাসন,
সিদ্ধার্থ চির-বাঞ্ছিত-ধন
মগ্ন করুণা-সাগরে!
রাজ-উদ্যানে দু'টী রাজ-সুত
খেলিছে হর্ষে কতরে।

(৩)

তীক্ষ্ণ শায়ক হানিয়া
বিঁধে দেবদত্ত হংস এক
ক্রীড়া-কৌতুকে মাতিয়া!
লুটায় হংস পড়িয়া ধূলায়
রক্তের স্রোত বুঝি বয়ে যায়,—
চকিত বিভল ক্ষিপ্তের প্রায়
সিদ্ধার্থ এল ধাইয়া!
বিঁধে দেবদত্ত হংস এক
তীক্ষ্ণ শায়ক হানিয়া!

(৪)

অশেষ যত্নে, আহা'রে,
উঠায়ে শাক্য আহত হংসে
লইলা অঙ্ক মাঝারে!
রাজার তনয় জানেনা বেদনা,
বুঝিতে কেমন দুঃখ-যাতনা,
ধীরে তুলে শর সজোরে কত না
আপনার করে প্রহারে!
পলকে শিহরি বুঝিলা শাক্য
কিবা সে বেদনা আহা'রে!

(৫)

লভিল হংস চেতনা।
কহে দেবদত্ত "ওযেগো আমার—
আমারে এখন দেহনা!"
সিদ্ধার্থ কন "তা' হবে না ভাই,
বাঁচায়েছি আমি—আমারি এভাই,
আমি যে ইহারে ছেড়ে দিতে চাই
হয়ে সুখী তায় জান না!"
হংস লইয়া বাধিল বিবাদ
লভিলে হংস চেতনা!

(৬)

অভিমানভরে চকিতে
রাজার সভায় ছুটে দুই ভাই
হংস কাহার বুঝিতে!
আসীন নরেশ সুধীগণ সনে,
বিবাদের কথা কহে দুই জনে,
সকলে মুগ্ধ নীরব ক্ষণে
উত্তর ঠিক খুঁজিতে!
রাজার সভায় উভয়ে শুধায়
হংস কাহার বুঝিতে!

(৭)

রাজ-পণ্ডিত হাসিয়া
কহিলা "হংস সিদ্ধার্থ পাবে,
সব জন দেখ ভাবিয়া!
হংসের যদি ঘটিত মরণ
পেত দেবদত্ত সত্য তখন,—
জীবিতের প্রতি দাবী অকারণ
নিঠুর ঘাতক হইয়া!"
"প্রকৃত বিচার" উত্তর দিল
হাজার কণ্ঠ মিলিয়া!

(৮)

আকুল পুলকে মাতিয়া
দয়াল শাক্য নিমেষে তখনি
দিলেন হংসে ছাড়িয়া!
অসীম আকাশ করুণা-গাথায়
পূর্ণ করিয়া মুখরিয়া হায়,
উড়িল হংস আপন কুলায়
দুঃখ বেদনা ভুলিয়া!
সে দয়ার ঢেউ উথলে এখনো
কত যুগান্ত বাহিয়া!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গুপ্তনগরী।

মানুষের বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়ের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তাহার সম্মুখে দেশ ও কালের দূরত্ব দাঁড়াইতে পারিতেছে না। তোমরা গত মাসে শুনিয়াছ, মানুষ কিরূপে চির-তুষারাবৃত পৃথিবীর সুদূর দক্ষিণপ্রান্ত, যেখানে কোনও জনপ্রাণী নাই, সেখানেও গমন করিয়াছে। আজ কিরূপে মানুষ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ছবি অতীতের গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছে, সেই কথা বলিব। আমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই, যে কালের স্রোতে সকলই ভাসিয়া যায়; যাহা চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর কিছুতেই ফিরাইয়া আনা যায় না। কিন্তু মানুষ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বলে সুদূর অতীতকেও ফিরাইয়া আনিয়াছে। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রোম নগরের অধিবাসীরা এসিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা ব্যাপিয়া এক মহা সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে ধন ঐশ্বর্য্য ও বিলাস বিভবে রোমক সমাজ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। কালের স্রোতে সেই রোমের সভ্যতা কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। একে একে সে দেশের উপর দিয়া কত বিপ্লব, কত পরিবর্ত্তন চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীন রোমের সে গৌরবের চিহ্ন একেবারে মুছিয়া গিয়াছে, কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার বিবরণ শুনা যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এক অদ্ভুত উপায়ে প্রাচীন রোমীয় সমাজও সভ্যতার একটি জীবন্ত ছবি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে, যাহার দ্বারা দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, রোম সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির দিনে, সেখানকার সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, লোকে কি ভাবে জীবন ধারণ করিত, তাহাদের ঘর বাড়ী, আচার ব্যবহার, ক্রীড়া আমোদ, কিরূপ ছিল তাহার সকলেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন কালে বর্ত্তমান নেপলসের নিকটে পম্পী নামে একটী নগরী ছিল। তাহাকে রোমের প্রমোদভবন বলা যাইতে পারে। স্থানটী সমুদ্রের তীরে; জল বায়ু প্রাকৃতিক দৃশ্য সমুদয় অতিশয় রমণীয় ছিল। এই জন্য রোমের সম্রাট, ধনী, সম্ভ্রান্ত সৌখীন লোকেরা অবসর সময়ে বিশ্রাম ও আমোদের জন্য এখানে আসিয়া বাস করিতেন। বহু যত্নে এবং বহু অর্থব্যয় করিয়া রোমের ধনীলোকেরা এই নগর সাজাইয়া ছিলেন। এই নগরের সন্নিকটে বিসুবিয়স পর্ব্বত। খৃষ্টীয় ৭৯ সালে বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে নগরটী একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। উক্ত বৎসর ২৪ আগষ্ট হঠাৎ বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়; অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র রাশি রাশি ভস্ম পড়িয়া নগরটী একেবারে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। বাড়ী ঘর লোকজন শুদ্ধ সমস্ত নগর ক্ষণকালের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সে সময়ে নগরে যাহারা ছিল তাহার অতি অল্পসংখ্যক লোক রক্ষা পাইয়াছিল। সে দুর্দ্দিনে অন্ততঃ দুই হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছিল।

কিন্তু আগ্নেয় দ্রব্য অপেক্ষা ভস্ম স্তূপই অধিক নির্গত হওয়ায় নগরটী পুড়িয়া যায় নাই। সকল দ্রব্যই অবিকৃত ভাবে ভস্ম রাশির তলে চাপা পড়িয়াছিল। অগ্ন্যুৎপোতের পরে মনোরম পম্পী নগরীর চিহ্নও দেখিতে পাওয়া গেল না। চারিদিকে বহুযোজন পর্য্যন্ত কেবল ভস্মের স্তূপ।

বহু শত বৎসর পম্পী নগরী এইরূপে মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত ছিল। লোকে কোথায় যে পম্পী নগরী ছিল তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে পম্পী নগরীর সন্ধান পাওয়া যায় এবং তখন হইতে ভস্ম ও মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহার কোনও কোনও অংশ বাহির করা হয়। উপরের মৃত্তিকা ও ভস্মরাশি অপসারিত হইলে দেখা গেল, যে নগরের বাড়ী ঘর কিছুই নষ্ট হয় নাই; ঘরগুলির কেবল ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আর সমুদয় অবিকৃত রহিয়াছে। অগ্ন্যুৎপাতের দিনে যেখানে যে বস্তুটী যেমন ছিল, এই দুই হাজার বৎসর পরে ঠিক তেমনি রহিয়াছে। ভস্মের আবরণে আচ্ছাদিত থাকায় কিছুই নষ্ট হয় নাই। এমন কি মানুষগুলি পর্য্যন্ত যে যেখানে যেভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি রহিয়া গিয়াছে। একটী বাড়ী খুঁড়িয়া বাহির করিবার সময়

দেখা গিয়াছিল যে গৃহস্বামী তাঁহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহাদের ক্রোড়ে দুটী সন্তান। মনে হয় তাঁহারা সন্তান দুটীকে লইয়া পলাইয়া যাইতেছিলেন; দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু ভস্মের চাপে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। একটী ভৃত্য প্রাণরক্ষার আশায় উদ্যানে একটী গাছে উঠিয়াছিল, কিন্তু গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল, এবং সেই খানেই ডাল আঁকড়াইয়া পড়িয়া ছিল। আর একটী ভৃত্য দোতালার জানালায় আশ্রয় লইয়াছিল, এবং সেই অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গিয়াছে।

আর একটী বাড়ীতে রান্নাঘরে একখানি টেবিলের উপরে আধখানি রুটী, মটরসুটী, সিম, কিসমিস্‌ ও অন্যান্য ফল এবং একখানি কড়াইএ মাংস পাওয়া গিয়াছে। খাবার দ্রব্য প্রস্তুত করা হইতেছিল, এমন সময়ে অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল, আর যেখানকার জিনিষ সেখানে রাখিয়া লোকে প্রাণভয়ে পলাইয়াছিল। কিন্তু পলাইয়াই বা যাইবে কোথায়? চারিদিকেই অগ্নিকাণ্ড।

উনানের উপর যে হাঁড়িতে রান্না হইতেছিল, সেটী ঠিক তেমনি বসান আছে। নিকটে একটী ডিম ছিল, সেটীও সেখানে রহিয়াছে, দুই হাজার বৎসরেও তাহা নষ্ট হয় নাই। বাড়ীগুলির দেওয়াল, থাম, দ্বার জানালা সমুদয়ই ঠিক আছে, কেবল ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গাত্রে আঁকা ছবি, খোদা মূর্ত্তি, মেঝেতে গাঁথা লতাপাতা ফুল জীবজন্তুর প্রতিকৃতি সমস্তই অবিকৃত আছে। ছবিগুলির বর্ণও মলিন হইয়া যায় নাই; দেখিয়া মনে হয় যেন সদ্য আঁকা হইয়াছে। দুই একটী বাড়ীর দেওয়ালে ছেলেমেয়েরা খড়ি বা কয়লা দিয়া নাম লিখিয়াছিল, সেগুলিও স্পষ্ট আছে, তাহা হইতে গৃহস্বামীর নাম পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে।

এমনকি, মৃত মানুষগুলির আকৃতিও উদ্ধার করা গিয়াছে। মানুষগুলি ছাইএর মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল; কাল ক্রমে ছাই চাপ বাঁধিয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে মানুষের দেহগুলি অবিকৃত ছিল; এখন সেই চাপ বাঁধা ছাইএর এক একটী অংশ উঠাইয়া সাবধানে তাহার ভিতর হইতে হাড়গুলি বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছে; সুতরাং বাহিরের ছাইএর আবরণ ঠিক একটা ছাঁচের মত হইয়াছে। এই ছাঁচের ভিতরে চীনা মাটী ঢালিয়া মানুষের মূর্ত্তি লওয়া হইয়াছে। এগুলিতে ঠিক সে

সময়ের মানুষের প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে তাহাদের মুখের ভয় ও বেদনার চিহ্নও এই সব মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

পুরাতন পম্পীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ এখনও মৃত্তিকা-গর্ব্ভে প্রোথিত আছে; ইতিপূর্ব্বেই দুই তৃতীয়াংশ খনন করা হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে বিশেষ যত্নের সহিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খোদা হয় নাই; নগরের প্রাচীন অবস্থা রক্ষার দিকে মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। মৃত্তিকাগর্ভ হইতে যে সব জিনিষ উঠিয়াছিল, তাহাও যথাস্থানে রক্ষা করা হয় নাই। সম্প্রতি এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। বহু অর্থব্যয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে সাবধানে পম্পী নগরীর উপরিস্থিত মৃত্তিকা ও ছাই সরান হইতেছে; এবং ঘরবাড়ী, পথ, বাগান ও দ্রব্যাদি যেখানকার যাহা যথাস্থানে রক্ষিত হইতেছে। এইরূপে আমরা প্রাচীনকালের একটী জীবন্ত দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পাইতেছি। এখানে প্রাচীন রোমকদের নগরের ব্যবস্থা, গৃহসজ্জা, আচার ব্যবহার, আমোদ প্রমোদ সকলই আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে। অতীতের গর্ভ হইতে দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতা যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিলে নিতান্ত মূঢ়চিত্ত লোকও বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারে না।
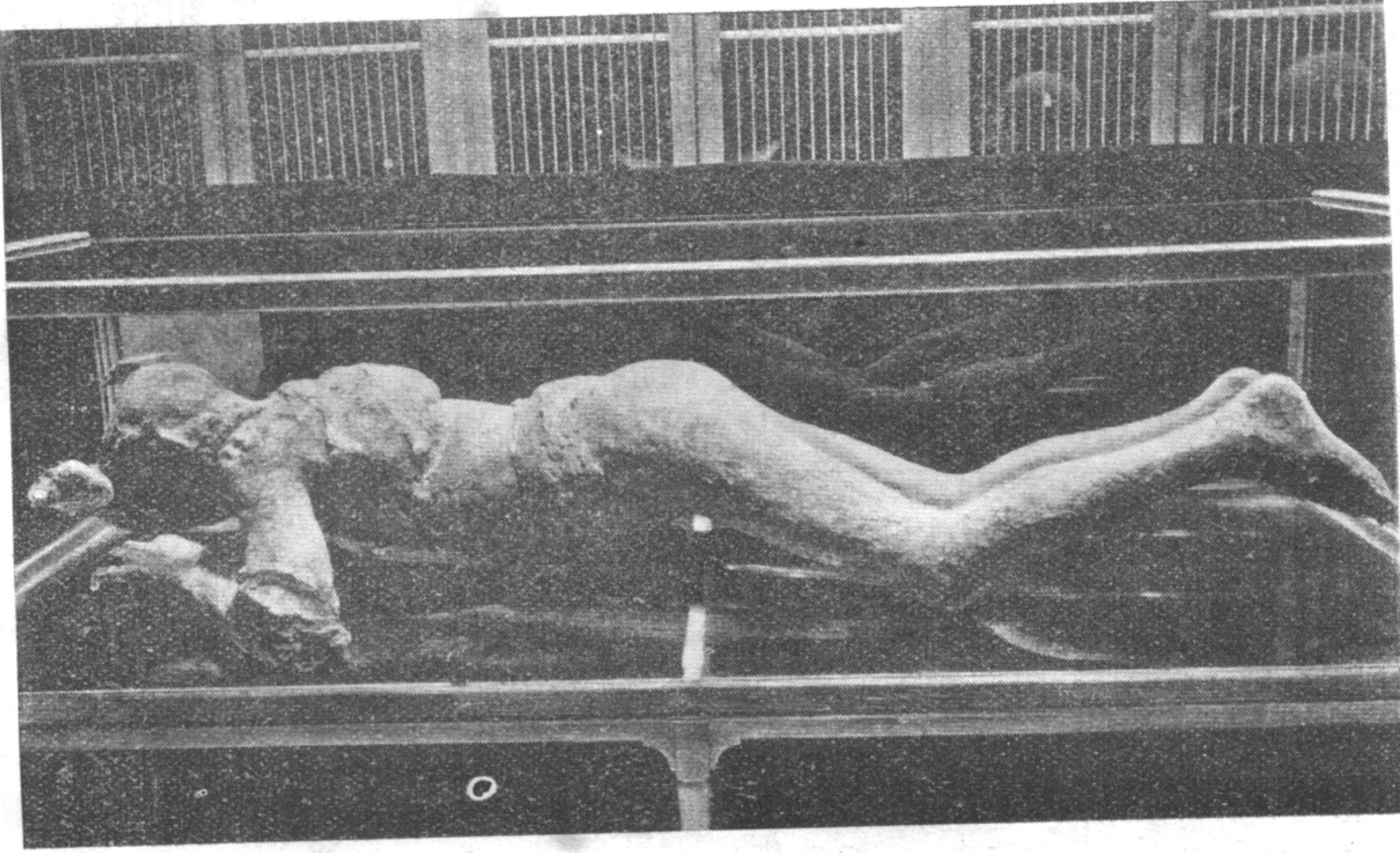
নরেন্দ্রনলিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশু বাবু তাঁহার মাতার এক মাত্র সন্তান। জননীর মৃত্যু হইলে পর পিতা আবার বিবাহ করেন। সেই বিবাহের একটি মেয়ে আছে। আশু বাবুর সেই বোনের নাম উমা। উমার আট বৎসর বয়সের সময়ই বার বৎসর বয়সের একটি ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল; ছেলেটির নাম সীতানাথ। এতদিন সীতানাথের বাবা জীবিত ছিলেন। তিনি যে সামান্য কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই খরচ চলিত। এই কয়েক মাস হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সীতানাথ এখন নিরুপায়। তাহার বয়স বাইশ বৎসর, অথচ সে মাত্র এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এ দিকে ঘরে উমা এবং একটি ছেলে। কে তাহাদের খাইতে পরিতে দিবে? উমার বাপ মাও বাঁচিয়া নাই। ভাই আশু বাবু কত দূর দেশে থাকেন।

এখন আশু বাবু দেশে আসিয়া বোন ও ভগিনীপতিকে তাঁহার কাছে আসিতে পত্র লিখিলেন। সীতানাথ লেখা পড়া শিখিতে পারে নাই, এই কথা মনে করিয়া আশু বাবুর কাছে যাইতে লজ্জা বোধ করিল। সে রেঙ্গুনে গিয়া চাকরির চেষ্টা করিবে এই পরামর্শ স্থির করিয়া উমাকে আশু বাবুর কাছে পাঠাইয়া দিল এবং নিজে চট্টগ্রাম পোঁছিয়া রেঙ্গুনের জাহাজে উঠিয়া পড়িল।

উমা ছেলেবেলায় দাদা ও বউদিদিকে দেখিয়াছে. তাহার পর ত আর দেখে নাই। নলিনীকে দেখিয়া থাকিলেও সে এক রকম অপরিচিত; উমার ভাইএর কাছে যাইতে সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। না গিয়াও উপায় নাই। তাই সে একটি আত্মীয়ের সঙ্গে একখানি ডিঙ্গি নৌকায় রাত্রি এগারটার সময় ভাইএর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আগে কোনই খবর ছিল না, তাই বাড়ীর প্রায় সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চাকরেরা তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া এক বাড়ীতে দুর্গা পূজার যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। এই সময় নলিনী উমার আসার সংবাদ জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি উঠিল। পিসিকে খুব আদর করিয়া আপনার শোবার ঘরে লইয়া আসিল। মায়ের শরীর ভাল নাই বলিয়া নলিনী মাকে জাগাইল না; সে নিজেই সেই রাত্রে উনুন ধরাইয়া ভাত চড়াইয়া দিল। উমা নলিনীর ব্যবহারে চোখে জল রাখিতে পারিলেন না। ভাই দূর দেশে থাকেন, তাঁহাদের চাল চলন খ্রীষ্টানী ধরণের, তাঁহার মেয়ের কাছে এতখানি আদরের প্রত্যাশাই করিতে পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নলিনী সুখের কোলে প্রতিপালিতা হইয়াও সেই রাত্রে রান্না করিতে গেল।

উমা ধীরে ধীরে নলিনীর কাছে গিয়া কহিল "নৌকায় দই চিড়ে খেয়েছি, আর বেশি ক্ষিদে নেই, খোকাও ঘুমিয়ে পড়েছে; এখন আর ভাত রাঁধার দরকার কি?"

নলিনী। ওমা সে কি কথা? সমস্ত দিন নৌকায় চিড়ে দই খেয়ে রয়েছ, এখন ভাত না খেলে চল্‌বে কেন?

উমা। তবে আমিই রান্না করি, তোমার ত রান্নার বেশী অভ্যাস নেই।

নলিনী। থাক্‌বে না কেন। বাবা যে তরকারিগুলি খেতে খুব ভালবাসেন, তা ত আমিই নিজের হাতে বাঁধি।

নলিনী ও উমা দুজনেই রান্না করিতে আরম্ভ করিল। আলু সিদ্ধ, পটল ভাজা ও মুগের ডাল রান্না হইয়া গেল।

পরদিন সকালে আশুবাবু ভগিনীর কাছে আসিয়া স্নেহ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর নলিনীর মা আসিয়া উমার চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন এবং ছেলেটিকে কোলে লইয়া হাতে একটি সোণার গিনি প্রদান করিলেন। আশু বাবুর একটি ঝি আসিয়া একগাল হাসিয়া কহিল "এই বুঝি আমাদের পিসি ঠাকুরুণ। বলি হাঁ গা, রেতে এসে আমাদের জাগালে না কেন। ভায়ের বাড়ী এসে বুঝি উপোস করে থাক্‌তে হয়?"

নলিনী। তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলে, তা বলে পিসি উপোস করে থাকবেন কেন?

ঝি। তবে বুঝি তুমিই উনুন ধরিয়ে রান্না করেছ? তাই ত! আমাদের অন্নপূর্ণা মেয়ে ঘরে থাক্‌তে লোকেরা আবার উপোস করে থাক্‌বে কেন?

একে একে বাড়ীর সকলেই আসিয়া উমার সঙ্গে দেখা করিল। শুধু নরেন আসিয়া পিসির সঙ্গে দেখা করিল না। তখন পিসি ছেলে কোলে করিয়া নরেনের ঘরে গেল এবং তাহার মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিল। উমা যখন নরেনের ঘর হইতে বাহির হইয়া উপরের তালায় উঠিলেন তখন নলিনী নরেনের ঘরে দাঁড়াইয়া মাকে কহিল,

"মা, নরেনের ব্যবহার দেখলে? ও তো পিসির ঘরে গেলই না, পিসি নিজে ওর ঘরে এসে কত আদর কর্‌লেন, তবু ও তাঁকে প্রণাম কর্‌ল না, ভাল করে কথাও কইল না! নরু দিন দিন কি হচ্ছে বল দেখি?"

মা। ওমা! নরু উমাকে প্রণাম করে নাই? আমার ত অত খেয়ালই হয় নাই। ছি বাবা, যাও, পিসির কাছে গিয়া তাকে প্রণাম করে এস।

নরেন। আমি যাকে তাকে প্রণাম করতে পারিনে।

নলিনী। তোর যা মুখে আসে তাই বলিস? আপনার পিসিকে প্রণাম করা বুঝি যাকে তাকে প্রণাম করা?

নরেন। কোন দিন আলাপ থাক্‌লে ত?

নলিনী। আচ্ছা, পিসির কথা নয় ছেড়ে দিলুম। বাড়ীতে কত বৃদ্ধ লোক এসে থাকেন, বাবা তাদের পায়ে পড়ে প্রণাম করেন, তুই কখনো তাদের প্রণাম করেছিস? তুই কাকেই বা প্রণাম করিস? তোর মাথা যে উঁচু হয়েই থাকে।

নরেন। থাকে ত বেশ হয়। তোমার তাতে কি? তুমি কেন আমার উপর মুরব্বিয়ানা চাল চাল্‌তে এস।

আজ কি হইল ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু আজ নরেনের মা তাহার কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন এবং কহিলেন, "নরু, এতদিন তুই দুষ্টু ছিলি, এখন যে তোর মুখও বেড়ে গেল! দিদিকে কি বল্‌ছিস? দিন দিনই যে তুই উদ্ধত হয়ে উঠছিস? সিতু বাবুর ছেলের বয়স ত তোরই বয়সের সমান; তার শ্রদ্ধা বিনয় দেখলে তাকে ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হয়। তুই শুধু তেড়ে উঠে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করে দিবি।"

নরেন মায়ের মুখে এ রকম শক্ত কথা প্রায় শুনিতে পায় না। আজ তাই ভয়ানক অভিমান হইল। সে কিছুতেই আহার করিবে না বলিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। আজ আর মা আদর করিয়া মান ভাঙ্গাইতে আসিলেন না। কাজেই নলিনী ভাইএর কাছে চলিল। সে মুখে যাহাই বলুক না কেন, আসলে ভাইকে বড় ভাল বাসে। ভাইএর ঘরে গিয়া কহিল, ভাইটি, লক্ষ্মীটি, এতক্ষন কি রাগ করে থাকতে আছে? তোমাকে ফেলে আমরা কেউ খেতে পাচ্ছিনে। এখন উঠে এস; তোমার ভালর জন্যই তোমাকে দুকথা শক্ত বলেছি। কেউ তোমায় নিন্দা করলে চোখে যে জল রাখতে পারিনে, তাকি জান না? ভাল কথা! বেশত মনে হয়েছে! তুমি ফুটবল খেলায় সকলের প্রশংসা পেয়েছ; সে জন্য বাবা আমাকে গোপনে ডেকে তোমাকে একটি সুন্দর ফুটবল খেলার পোষাকে তৈরী করে দিতে বলেছেন। এবার এলাহাবাদ গিয়েই তা তৈরী করে দেব; কেমন? খুব খুসী হবে ত?"

নরু বাবুর পেট ক্ষুধায় বড়ই জ্বলিতেছিল। কাজেই অভিমান আর অধিকক্ষণ রহিল না। আহার করিতে বসিয়া দিব্বি সরু চালের ভাত, ডিম ভাজা, টাটকা ইলিস মাসের ঝোল, ঘন দুধ ও মুন্সীগঞ্জের বড় একটি কলা উদরস্থ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নরেন কিছুতেই পিসির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁহার ছেলেটির উপর ভালবাসা প্রকাশ করিতে পারিল না। নরেন সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে; নোংরা ভাব সহ্য করিতে পারে না। তাহার দিদি নলিনীর সৌন্দর্য্য বোধ ও শিল্পজ্ঞান আশ্চর্য্য রকমের। এক বার তাহার পরিপাটী ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ, চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। গৃহের অল্প কয়েকটি সামগ্রী কেবল সাজাইবার কৌশলে চারিদিকে সৌন্দর্য্য পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বলিতে কি, আশুবাবুর বাড়ীতে প্রত্যেকেরই সৌন্দর্য্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি।

কিন্তু উমা কোন রকম শিক্ষা পান নাই; সে পাড়াগাঁয়ে শত প্রকার অভাবের মধ্যে বাস করিয়াছে; কাজেই তাহার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার অভ্যাস হয় নাই। উমা ধোপাবাড়ীর ধব ধবে কাপড়খানা পরিয়াও মাটিতে ঘরের মেজের উপরই আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়ে, হাতে হলুদের দাগ লাগিলে তাহা কাপড়ের আঁচল দিয়াই মুছিয়া ফেলে; থুথু ফেলিতে হইলে ঘরের মধ্যেই ফেলে। এ সকল দেখিয়া নরেনের অতিশয় ঘৃণা হয়। তবু উমার জন্য নরেনের তেমন কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সে উমার ছেলের জ্বালায়ই অস্থির। নলিনী তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করে, তাহার সকল চেষ্টা পণ্ড হইয়া যায়। এই ছেলেকে ধোয়াইয়া মোছাইয়া রাখা গেল, একটু পরে গিয়াই দেখে সে ধূলায় ভুত। অথচ সে ফাঁক পাইলেই নরেনের ঘরে প্রবেশ করিবে

তাহার শাদা ধব ধবে জামাটা ধরিয়া টান মারিবে, বিছানার উপর উঠিয়া চাদরটা অপরিস্কার করিয়া দিবে।

নরেন এ সকল দেখিয়াও বাপের ভয়ে দিন কয়েক কিছু বলিল না। তাহার পর মায়ের কাছে গিয়া কহিল মা পিসির ছেলে রোজ রোজ আমার ঘরে গিয়ে আমাকে জ্বালাতন করে কেন? ওর মা ওকে আপনার কাছে রাখতে পারে না? আবার আমার ঘরে গেলে ভাল হবে না, আমি তা আগেই বলে রাখছি। একদিন দুই হাত ধরে তাবে ছুঁড়ে ফেলে দেব, তাতে ছেলে বাঁচুক আর মরুক।

নরেনের মাতা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল "চুপ কর, চুপ কর, অমন কথা কি বলতে আছে? ছোট ছেলে তোর ঘরে গিয়ে একটু উৎপাত করে, তাতে কি?"

নরেন বিলাত হইতে দশ টাকা দামের খুব সুন্দর একখানা বই আনাইয়াছে। বই খানির পাতায় পাতায় চমৎকার ছবি। সুন্দর বাঁধানো ঝক্‌ঝকে বইখানি ছোট একটি টেবিলের উপর রাখিয়া সে একটু বাহিরে বেড়াইতে গেল। ইহার মধ্যে উমার দুরন্ত ছেলে নরেনের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পর সুন্দর বইখানি দুই হাত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে নীচে ফেলিয়া দিল।

শুধু এই কাজটি করিয়াই সে ক্ষান্ত হইলে হইত; সমস্ত বইর পাতাগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিল। ইহাতে তাহার ভারি আনন্দ হইল। তবে এই আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। নরেন হঠাৎ ঘরে আসিয়া পিসির ছেলের কীর্ত্তি দেখিয়া তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল। আজ আর সে রাগ থামাইতে পারিল না। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"এদের মরণের আর যায়গা ছিল না, উৎপাত করবার জন্য আমাদের বাড়ী এসেই জুটেছে।"

লোকে কথায় বলে রাগ না চণ্ডাল। বাস্তবিকই তাই। নরেন রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ছেলেটিকে ধরিয়া উঁচু করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

উমা নরেনের চীৎকার শুনিয়াই তাহার ঘরের দিকে আসিতেছিল। এখন ছেলেকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে দেখিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হায়, দুঃখিনী বড় অভাবে পড়িয়াই তাদের বাড়ীতে আসিয়া ছিল। আজ কি না তাহার দুঃখের ধন ছেলেটির এই দুরবস্থা।

নলিনী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল; সে ভাবিল, ছেলের হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলের গায়ে একটু চোট লাগা ভিন্ন আর বেশী কিছুই হয় নাই। তবে উমা মনের দুঃখে কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিল। নরেনের মাতাও নিজের ছেলের অন্যায় কার্য্যের কথা ভাবিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। নলিনী পিসির ছেলের হাতে নানা রকম খাবার দিয়া তাহাকে কোলে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল এবং শান্ত করিল। তাহার পর উমাকে কহিল.

"পিসি, তোমাকে কি বলব ঠিক বুঝতে পারছিনে। নরেন যে অপরাধ করেছে, তার আর মার্জ্জনা নাই। ওর রাগ হলেই মাথা খারাপ হয়ে যায়, যা করবার নয়, তাই করে ফেলে।"

উমা। তার আর বেশী দোষ কি? আমারই দস্যু ছেলে। আমি যে বাড়ী হতে এসেছি, আজ সেই বাড়ীতেই চলে যাই। ভগবান আমার কপালে দুঃখ লিখেছেন, দুঃখই ভোগ করি।

নলিনী নরেনের ঘরে আসিয়া কহিল, "কি ভয়ানক অন্যায় কাজ করেছ, এতক্ষণে সে খেয়াল হয়েছে? খেয়াল হয়ে থাকেত, এখনি আমার সঙ্গে পিসির ঘরে এস; তাঁর পায়ে মাথা রেখে ক্ষমা চাও।"

নরেন। বেশ করেছি; ক্ষমা চাইবার কোন দরকার নেই।

নলিনী। মাগো! কি স্পর্দ্ধার কথা! এমন একটা অন্যায় কাজ করে ও তোর মাথা হেঁট হল না। তুই ভদ্রতা ত কোন কালেই শিখিস নাই, তোর ভিতর কি একটু দয়া মায়াও নেই?

নরেন। আমার ত দয়া নাইই; তুমিই বাড়ীর দয়াময়ী কর্ত্রী হয়ে বসেছে। কিন্তু কর্ত্তৃত্বটা আমার উপর বেশী করোনা তা বলে দিচ্ছি।

পম্পী অতীত ও বর্ত্তমান।
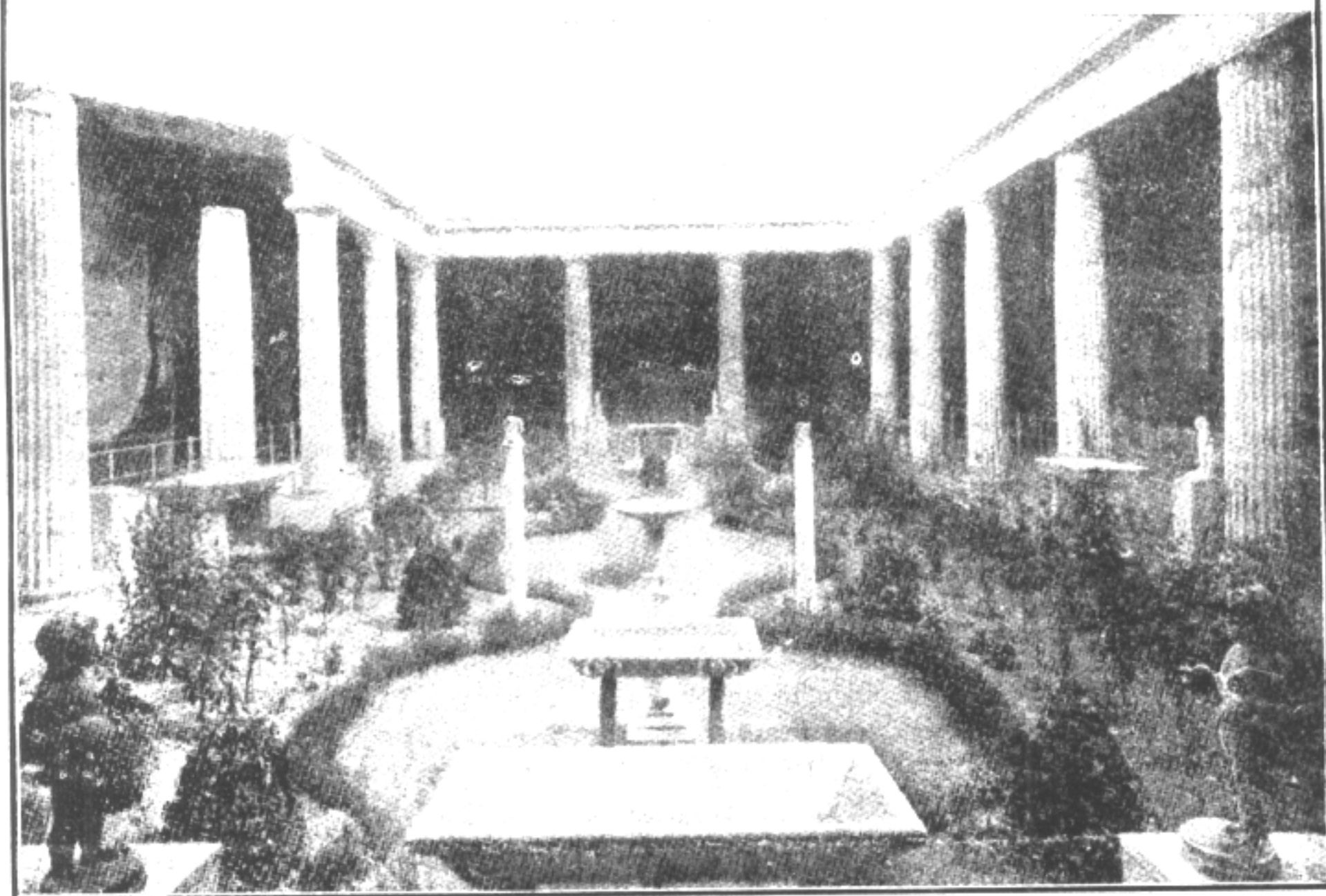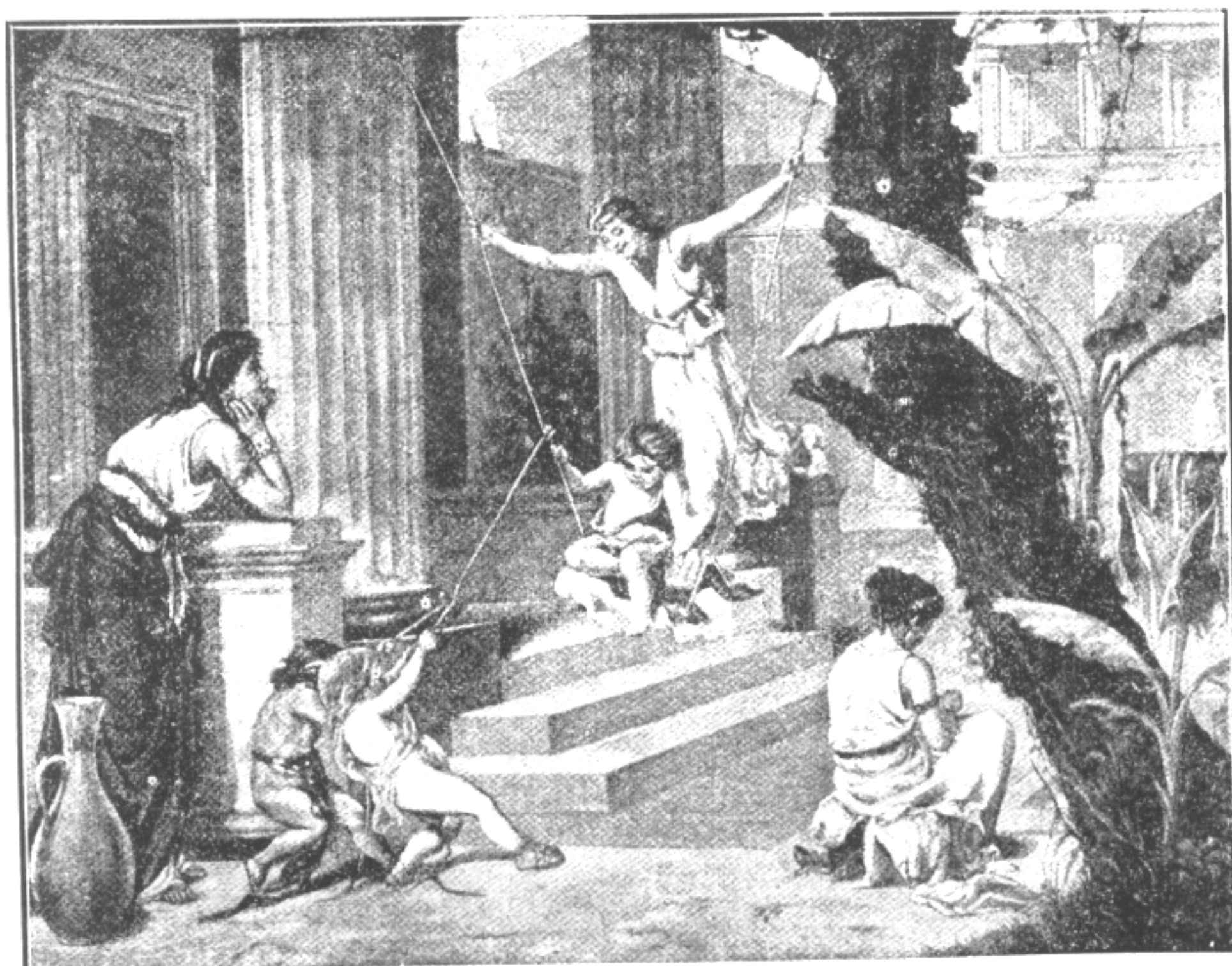
নলিনী। আমি যে তোর দিদি তাকি ভুলে যাচ্ছিস ?

নরেন। ভুলতে চাই। তোমার মুরব্বিয়ানা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

নলিনী। এমনই রাগ, যে বোনের সম্মান রক্ষা করে কথা বলতে পার না ?

নলিনী ম্লানমুখে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

পূজার ছুটী।

পূজার ছুটিতে তোমরা বেড়াতে গিয়েছিলে বোধ হয়, আমিও গিয়েছিলাম। প্রতিবারেই বেড়াতে যাই, কখনো দার্জিলিং, কার্সিয়ং কিম্বা রাঁচী, মধুপুরে, এবারেএকটু দূরে গিয়েছিলাম, উদ্দেশ্য তীর্থদর্শন। আমাদের গাড়ীতে তোমাদেরই মত চারটি ছোট ছেলে মেয়ে ছিল। একটিত এক বছরের খুকি, দেখ্‌তে মোমের পুতুলের মত, তিনি মায়ের কোল ছেড়ে শোন্‌না, আর তিনটি কিছু বড় তবে সে খুকির তুলনায়! আমাদের চোখে তাঁরা একেবারে কচি। তাই উপরের বেঞ্চিতে চড়বার জন্যে যদিও তারা অনেক উৎসাহ জানিয়েছিল ও আবদার করেছিল, তবুও তাদের নীচের বেঞ্চিতেই শুতে হল। উপরে উঠ্‌লে কখন নীচে পড়ে গিয়ে, বেল মাথা গুলি ভেঙ্গে ফেলেন, সেই ভয়ে আমরা বড়রাই উপরে গেলাম। বড় হলেই পড়্‌বার ভয় যে থাকে না তা মনে করোনা, বরং বড়রা যখন পড়েন তখন আঘাত কিছু মারাত্মক হয়। বম্বে মেল এম্নি জোরে দৌড়ায় আর এম্নি দোল দেয়, মাটীর উপরে লোহার চাকায় সশব্দে চলে ও কেবলি সমুদ্রের স্বপ্ন দেখতে হয়, কেবলি মনে হয় আমি বুঝি একখানি ছোট্ট ডিঙ্গি, তরঙ্গের তাড়নায় অস্থির, এই বুঝি যাই, এই বুঝি ডুবি। জেগে জেগেই স্বপ্ন আসে, ঘুমলে কি হত বল্‌তে পারিনে। গ্রাণ্ডকর্ড লাইন দিয়ে এই আমার প্রথম বিদেশ যাত্রা, এর আগে দুবার কাশী গিয়েছিলাম সে অন্য পথে। ভোরের প্রথম আলোতে গয়া ষ্টেসনে পৌঁছে যখন চারিদিকে কাছে দূরে অনেক মন্দিরও মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলাম, তখন ভারী আহ্লাদ হল। তা ছাড়া চারিদিকের শস্য-ক্ষেত্র, সবজি বাগান, আফিমফুলের সাদা লালের বাহার শরৎকালের সোনালি আলোতে দেখতে চমৎকার লেগেছিল। সহরে অনেক দিন বদ্ধ থেকে বাহিরে গিয়ে যা দেখি, তাই কত সুন্দর লাগে। এখানে অসীম আকাশের অসীমতা কই চোখে পড়ে, আলো ভাল পাওয়া যায় না, বেচারী জ্যোৎস্নার সুকুমার মাধুর্য্য গ্যাসের আর বিজুলি আলোর কাছে হার মেনেই আছে। যে বাতাসে আমরা প্রাণে বেঁচে আছি তাও প্রাণভরে পাইনে। পাশাপাশি ঘেঁষাঘেষি দোতালা তেতালা বাড়ী সব বদ্ধ করে রাখে। আর আমাদের মা বসুমতী তাঁর শ্যাম অঞ্চলের প্রান্তটুকুও চোখে পড়ে না। তাই রেল গাড়ী যখন হুহু শব্দে উড়িয়ে নিয়ে যায়, দুধারে আম বাগান, ধানের ক্ষেত, খাল, বিল পুকুর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে ঘুরপাক খেয়ে লুটিয়ে পড়ে, সূর্য্য চন্দ্র দৌড়ে দৌড়ে আমাদের ধরতে পারেনা, তখন ভারী আনন্দ হয়। নতুন খেলায় সমস্ত মনটা দোলা পেয়ে জেগে ওঠে। রেলগাড়ীর জানালা দিয়ে দুধারের দৌড় দেওয়া দৃশ্যকে দেখে দেখে ইচ্ছে করে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে পুরে রাখি, আর ছেড়ে দিইনে। গয়া ছেড়ে আমরা শোণনদের সেতুর উপর দিয়ে গেলাম। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় সেতু মোটে আর একটি আছে। নদ বল্লেই বুঝতে হবে প্রকাণ্ড ব্যাপার; নদীর চেয়ে ঢের বড়, দুকূল ছেয়ে তার ঢেউ উথ্‌লে উথ্‌লে উঠ্‌ছে, জলের কল্লোলে দিক দিগন্ত মুখরিত, তরঙ্গের কি আস্ফালন, যুদ্ধমত্ত বীরের মত আকার প্রকার, কে তাদের বাঁধতে পারে। তবে বাঁধা পড়ে শোণের নদত্ব একেবারে গেছে। এর জল গেরুয়া লাল রং এর বলে এর নাম শোন, সে লাল শোভাও নেই। বিলের মত স্রোতহীন মাঝে মাঝে শুধু বালিয়াড়ি, জল একেবারেই নেই যদি বা কোথাও থাকে তাও পানা পুকুরের ঘোলা সবুজ জলের মত। স্বাধীন যখন ছিল তখন তার জীবনের গতি কি চমৎকার সুন্দর, কি বৈচিত্র্যময়, কি আনন্দপূর্ণ, কি জীবন্ত জাগ্রত, আর আজ লোহার শিকলে বাঁধা পড়ে একেবারে মৃত

প্রায়! সব সুখ সব শোভা সমস্ত উৎসাহ একেবারে মূর্চ্ছাহত। এই দশা আমাদের সবারি হয় মনে রেখ। এদেশে আর কটি নদ আছে বল্‌তে পার? এর পরের বড় ষ্টেশন মোগল সরাই। গাড়ী এখানে অনেকক্ষণ থাকে। কত ফেরিওয়ালা কত রকমের রং বেরংএর জিনিস বেচতে নিয়ে এল; বিদেশী খেলনা আমরা নিলাম না, স্বদেশী কত সুন্দর জিনিষ আছে তা ছেড়ে টিনের বাঁশী আর কাচের পুতুল কার কিন্‌তে সাধ যায়? খেলনা কিন্‌বার বয়স আর আমার নেই সত্যি। সে সময় কবে শেষ হয়ে গেছে জান্‌তে হলে জ্যোতিষী ডাক্‌তে হয়, কথায় বলে বয়সে কি বৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে! খেলনা না কিন্‌বার মত জ্ঞান আজ ও আমার হলনা; তাই ছেলেদের সঙ্গে মহা উৎসাহে আমি ও খেলনা কিন্‌বার ব্যবস্থা করলাম। পছন্দ হল, একটি কৃষ্ণ রাধিকা আর একটি অন্নপূর্ণা। দাম টাম যখন দেওয়া হয়ে গেছে, তখন আবিষ্কার করলাম—ওমা আমার মুরলিধারীর মুরলি নেই—ফেরিওয়ালাকে খোঁজ পড়ল, মুরলি দিলিনে, মুরলি দে—সে তার ডালা হাঁৎড়াতে লাগ্‌ল, আমরাও ব্যস্ত হতে লাগ্‌লাম, ইতি মধ্যে রেলগাড়ীর মুরলি বাজল, গাড়ী গর্জ্জন করে দৌড়ল বংশীধারীর বংশী আর লাভ হল না। বঙ্কিম ভঙ্গি দেখেই তাঁকে যা চেনা যাচ্ছে। তবে আমার অন্নপূর্ণার হাতাখানি ঠিক আছে, সেই সৌভাগ্য বল্‌তে হবে।

বম্বে মেল মস্ত বড় মানুষ, কাঙাল গরীবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না; ছোট ষ্টেসনের দিকে দৃকপাত না করে মোটর আক্রোশে গর্জ্জন করিতে করিতে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একেবারে গিয়ে মির্জ্জাপুরে দাঁড়াল। আমারও সেই গন্তব্য স্থান। এ সহরটি পুরাণ বাদশাহী আমলের, নাম শুনেই বুঝতে পারছ! রাস্তার দুধারে তিন তলা চার তলা বাড়ী, ছোট্ট ছোট্ট ইট দিয়ে গাঁথা, এম্নি মজবুত, মনে হয়, যেন আস্ত একখানি পাথরে তৈরি। দুধারে মাঝে মাঝেই দেখা যায় তরকারীর বাজার বসেছে, কত বড় বড় বেগুন, আর কি তার চকচকে বেগুণী রং, আবার কতক গুলির হাঁসের ডিমের মত গোলাপী আভা সাদা রং, কারো গায়ে সবুজে সাদার ডোরা কাটা। এখানে ধুঁধুঁল চিচিঙে ঢ্যাড়স কত বড় বড়। তখনও কপি ওঠেনি। মেওয়ার দোকানে কত ফল, কাপড়ের দোকানে ছাপার কাপড়, এম্নি সুন্দর তার রং আর কাজ, ঠিক মনে হচ্ছিল যেন কাশ্মীরি শালের জামিয়ার টাঙ্গিয়ে রেখেছে; দিল্লীর জরির কাজ করা চাদর জামাও মাঝে মাঝে ঝিকমিক করছিল; আর লক্ষ্ণৌ কাজের বেলকুঁড়ির সারির মত ঝালর দেওয়া উড়ুনি দেখে গাড়ী থামিয়ে তখনি কিনবার ইচ্ছা হচ্ছিল। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড পুকুর দেখা যায়। তার চারিদিকে শুধু স্নান ঘাট নয়, পাশে পাশে আবার কাপড় ছাড়বার আহ্নিক করবার জায়গা; চন্দন কাঠের রং এর পাথর, তারি থাম খোদাই করে তোলা, দেওয়ালে জালি কাজ করা জানালায় ফুলপাতা কাটা। রাস্তার মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষাঁড় শুয়ে আছে, তাদের ঠেলে সরিয়ে দিতে হয়, তখন তারা দুলতে দুলতে আর এক জায়গায় গিয়ে গড়িয়ে পড়ে। দিব্যি আরামে খেয়ে দেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট শরীর, নিশ্চিন্ত মনের ভাব, তা তাদের দেখলেই বোঝা যায়।

আমরা যে বাড়ীটিতে ছিলাম সেটী গঙ্গার মধ্যে হতে গেঁথে তোলা। পুরাণ হিন্দু দুর্গ ছিল আওরঙ্গজেব বাদশাহ কেড়ে নিতে গিয়ে হেরে গিয়েছিলেন। তবে মা গঙ্গা তার অনেকখানি গ্রাস করে বসে আছেন। এখানে গঙ্গা এমন নিঃশব্দ, উপরে এমন স্রোতহীন, সহসা বুঝতেই পারতাম না, যে জলের উপরে বাস করছি। তবে সারাদিন নৌকা আনা গোনা করত তাই আর ভুল করবার যো ছিল না। আগে যখন রেল ছিল না, তখন এ সহরের খুব সমৃদ্ধি ছিল। এখন রেল হয়েছে, এখানকার বিশেষ ব্যবসা লাক্ষা আর গালিচার কাজ, তাতে মন্দা পড়েছে, আবার সেই সঙ্গে প্লেগের আমদানি হয়ে মানুষেরআর স্ফুর্ত্তি নেই। কত লোক মরে গেছে, যারা বেঁচে আছে তাদের অন্নাভাব। নতুন একটি প্রকাণ্ড কাপড়ের কল খুলেছে তাতে অনেক লোক কাজ পেয়ে খেয়ে বাঁচছে।

কাশী কখনো দেখেছ কি? নদীর উপর হতে সকালে কাশী বড় চমৎকার দেখায়, সেখানে গঙ্গার বাঁকটি অর্দ্ধ চন্দ্রের মত। বারাণসী মহাদেবের রাজত্ব কিনা তাই তাঁর আদরের গঙ্গা তাঁরি শিরোভূষণের আকার ধারণ করেছেন। এই অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি স্রোতের গায়ে কত স্নান ঘাট! সেখানে অসংখ্য লোক স্নান করে সূর্য্য অর্ঘ্য দেন, তার পর সিঁড়ির উপর বসে পূজার্চ্চনা করেন। দূরে মন্দির চূড়ায় বাতাসে আন্দোলিত পতাকার উৎসাহ। আরো ঊর্দ্ধে, সুন্দর স্নিগ্ধ স্বচ্ছ উজ্জ্বল নীল আকাশ, সূর্য্যের আলোতে আনন্দ ছড়িয়ে ভাগীরথী কল সঙ্গীতে বন্দনা গান গাইতে গাইতে বয়ে যান, এ দৃশ্য একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। কিন্তু মির্জ্জাপুর যদিও গঙ্গা গর্ভ হতে গেঁথে তোলা, তবুও অনেক স্নান ঘাট নেই, দু'চারটি। তার মধ্যে পাক্কা ঘাট বলে একটি স্নান ঘাট আছে। যদিও এখন চারিদিকে ভেঙ্গে পড়ছে, তবু তার কাজ বড় সুন্দর। নদী পথ হতে অনেক গুলি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়, তার পর চারিদিকে থাম দিয়ে সাজান একটি প্রকাণ্ড ঘর আছে। থামের মাথার উপর অলিন্দের গায়ে,অনেক দেবদেবী মূর্ত্তি—ছাদের উপর চারিদিকের কার্নিশে বড় চমৎকার জালি কাজ করা; এমন সূক্ষ্ম কারুকাজ, কেউ যেন চন্দন কাঠের উপর তৈরি করে রেখেছে। চন্দন কাঠের ছবি রাখবার আধার, বাক্স কৌটা দেখেছ নিশ্চয়ই, কতক গুলির উপর উচুকরে তোলা লতা ফুল পাতা জীবজন্তুর গঠন করা হয়, আবার কতক-গুলিতে মাছধরা জালের মত ফুটো করা কাজ থাকে। এ পাথরে সেই রকম জালের মত কাজ প্রত্যেকটির আকার বিভিন্ন, কাজও অন্য রকম। তবু সব গুলির এমন সামঞ্জস্য আছে, কেবল সবশুদ্ধ দেখিতে ভাল হয়েছে তা নয়, প্রত্যেকটিও বেশ পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে। এই স্নান ঘাটের পাশে একটি শিবমন্দির আছে, সেটি বহু পুরাতন। আমাদের যে বন্ধুটি সব দেখিয়েছিলেন, তিনি বল্লেন, মন্দির গাত্রে যে সব দেব দেবী মানব মানবী, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব উদাসীন সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি আছে, এ রকম আর এক ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরিতে দেখা যায়। মূর্ত্তিগুলি বড় সুন্দর; কত দিন চলে গিয়েছে, রৌদ্র ধূলি ঝড় বৃষ্টি কত তার উপর এসে পড়েছে, তবুও তার লাবণ্য হানি কর্‌তে পারেনি। একদিন আমরা বিন্ধ্যাচলে যোগমায়া ভোগমায়ার মন্দির আর একদিন গঙ্গাতীরে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। বিন্ধ্যপর্ব্বতের কথা তোমরা জানত? বিন্ধ্য এক সময় এমনি অহঙ্কারী হয়ে ছিলেন যে মাথার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চূড়া তুলে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের গতিরোধ করে, পৃথিবী অন্ধকার করে দেবার চেষ্টায় ছিলেন। পৃথিবী অন্ধকার হলে জীব জন্তু গাছ পালা নদ নদী বন উপবন হ্রদ তড়াগ আর রক্ষা হয় কি করে? এর তো একটা উপায় কর্‌তে হয়। অগস্ত্য বলে একজন ঋষি ছিলেন, তাঁর চরিত্র অতি নির্ম্মল, জ্ঞান বুদ্ধিতে তিনি প্রবল প্রতাপশালী। কি উপায় কর্‌তে হবে তা তিনিই ভেবে স্থির কর্‌লেন। তিনি তখন দাক্ষিণাত্যে যাত্রা কর্‌ছিলেন, ভারতবর্ষের দক্ষিণে যেতে হলে বিন্ধ্যকে এড়িয়ে যাবার যো নেই, তিনি কি না পূর্ব্ব পশ্চিমে দেহ বিস্তার করে ঠিক্ মাঝ খানে হিন্দুস্থানের কটিদেশ অধিকার করে আছেন। বিন্ধ্যের আত্মগর্ব্ব যতই থাক অগস্ত্যের চরিত্র গৌরব তার চেয়ে অনেক অধিক ছিল; কাজেই বিন্ধ্যের তাঁকে দেখে নত হয় প্রণাম কর্‌তেই হ'ল। পূজনীয় অগস্ত্য আশীর্ব্বাদ করে বল্‌লেন, "বৎস তোমার বিনয় দেখে বড় সুখী হলাম, যত দিন আমি ফিরে না আসি তত দিন এই ভাবেই থাক।" ঋষিবাক্য অলঙ্ঘ্য, কাজেই বিন্ধ্য প্রণত অবস্থাতেই আছেন, চন্দ্র সূর্য্য অব্যাহতি পেয়েছেন, পৃথিবীও সূর্য্যালোকের আনন্দলাভ করে ধন ধান্যে বসুন্ধরা নাম সার্থক করেছেন। তবে বিন্ধ্যাচল এত দিন নত হয়ে থাকৃতে থাকতে একেবারে স্থবির জড় হয়ে গিয়েছে, ঘাড়টা ব্যথা হয়ে হয়ে একেবারে অবশ হয়ে গিয়েছে। যোগমায়া ভোগমায়ার মন্দির পর্ব্বতের গুহার মধ্যে। দেবীর অষ্টভূজা মূর্ত্তি আছে তবে সে প্রতিদিন দেখা যায় না। কোন বিশেষ পর্ব্বদিনে পুরোহিতদের অনুগ্রহ হলে তবে প্রকাশ পায় কিম্বা বেশী রকম দক্ষিণা দিতে

পারলে অসময়েও আবির্ভাব হতে পারে। আমরা সে সুযোগ দিইনি। মন্দিরের চারিদিকে দৃশ্য বড় চমৎকার। বিশেষতঃ আমরা যখন দেখেছিলাম। সূর্য্যদেব তখন অস্ত যাচ্ছেন, আকাশে উজ্জ্বল কিরণের স্বর্ণ প্লাবন; আকাশ ভাসিয়ে পৃথিবীতে সেই আলোকধারা ছড়িয়ে পড়েছে। লতায় জড়ান গাছের গা, উৎসের শীর্ণ ধারা, বটগাছের অসংখ্য জটা বেয়ে নেমে এসেছিল। এখানে চারিদিকে কত কুণ্ড আছে, তার জল বড় সুস্বাদু, আমরা অঞ্জলি ভরে পান করিলাম। ভৈরব কুণ্ডের জল গেরুয়া রং এর, সাদা কাপড় একবার চুবিয়ে নিলেই একেবারে পাকা রংএ ছুপিয়ে যায়। ধোপা বাড়ী দিলেও ওঠে না। এখানে অনেক আশ্রম আছে, সেখানে বহু সন্ন্যাসীর বাস। তারা শুধু পরের ঘাড়ে খেয়ে খেয়ে মোটা হ'য়ে কোন কাজই করে না, ভিক্ষা করতে খুব মজবুত, সাধু লোকেরও মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া যায়। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন এক জন উপস্থিত ছিলেন; তিনি জ্ঞানচর্চ্চাও সৎ প্রসঙ্গ নিয়েই থাকেন অনেক, শিষ্য, সকলেই তাঁকে ভক্তি করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

গৃহশিক্ষা।

(৫)

একদিন বিকালে মালতী বিষণ্ণমুখে স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিল। আহারান্তে কাহারও সহিত হাস্যালাপ না করিয়া নীরবে পাঠ প্রস্তুত করিতে লাগিল। তাহার এমন ব্যবহার মাতার স্নেহদৃষ্টি এড়াইতে পারিল না; তিনি দেখিলেন কন্যার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কি এক দুঃখভারে অবনত হইয়াছে। তাহার দৃষ্টি নিম্নদিকে আর চক্ষুদিয়া জল পড়িতেছে।

তখন তাহার মাতা বলিলেন "মালতী, কালকার পড়াটা কি খুব কঠিন? তুমি কি আমার সাহায্য চাও?"

মালতী কিছুই বলিল না; কিন্তু এক মিনিট পরেই সে ধীরে ধীরে মাতার নিকট আসিল ও তাঁহার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বিনয় ও তাড়াতাড়ি তাহার ভগ্নির নিকট আসিল। সে বলিল "কি হয়েছে? কাঁদছ কেন?"

তখন মালতী বলিল "আমি কি কর্‌ব জানিনা, স্কুলে আজ শাস্তি পেয়েছি, কি করে কাল মুখ দেখাব? ভাবছি আমি আর কাল স্কুলে যাবনা।"

বিনয় তখন গম্ভীর স্বরে বলিল "কেন, তুমি কি করে ছিলে যে শাস্তি পেলে?"

মাতা বলিলেন "কি হয়েছিল সব বল।"

তখন মালতী চক্ষু মুছিয়া মাতার নিকটে বসিল ও কিছুক্ষণ পরে স্থির হইয়া বলিল—"আমি একটা মজা করে-ছিলাম সেজন্য শাস্তি পেয়েছি। সে শিক্ষয়িত্রী একটুতেই শাস্তি দেন। সামান্য একটু দোষ কর্‌লেই আর রক্ষা নাই।

মাতা বলিলেন "কই, তুমি ত এর আগে কোন দিন শাস্তি পাওনাই? আর তোমার শিক্ষয়িত্রী তোমার দোষ দেখেই শাস্তি দেন, বৃথা কখনই দেননা। তুমি কি করেছিলে?" মালতী বলিল "আমি খাতায় শুধু একটা ছবি এঁকেছিলাম, সেই সামান্য কারণের জন্য শাস্তি পেয়েছি।"

মাতা বলিলেন "তখন কি পড়বার সময় ছিল?"

মালতী বলিল "তখন তিনি আমাদের একটা রচনা লিখতে দিয়েছিলেন।"

মাতা বলিলেন "ছবি আঁকবার আগে তুমি কি রচনাটা লিখেছিলে?"

মালতী বলিল "না, মা, আমি একলাইন লিখেছিলাম, আর কিছু মনে আস্‌ছিলনা; আমি ভাবছিলাম, এমন সময় নলিনী ও সুশীলা কানে কানে কথা বলতে লাগল ও হাস্‌তে লাগল, আমি তাদের কথা শুন্‌ছিলাম। শিক্ষয়িত্রী তা' দেখতে পেয়ে তাদের চুপ কর্‌তে বললেন কিন্তু তারা তা' শুনলনা, আবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ কর্‌ল ও তাঁর ছবি আঁকতে চেষ্টা কর্‌তে লাগল। আমি দেখলাম তারা ঠিক আঁকতে পারছে না, তখন আমি আঁকলাম।"

বিনয় ইহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি মালতীর সেই খাতাটা টানিয়া বাহির করিল।

মালতীর নিষেধ সত্ত্বেও সে খাতা খুলিয়া ছবিখানি দেখিল ও বলিয়া উঠিল "বাঃ! বেশ এঁকেছ ত?"

মাতা তাহার নিকট হইতে ছবিখানি লইয়া দেখিলেন ও বলিলেন—"ছবিটী ভাল হতেও পারে; কিন্তু রচনা কোথায় লিখেছ? ওঃ এখানে; দেখ্‌ছি তুমি শুধু আরম্ভ করেছিলে মাত্র!"

মালতী বলিল "রচনা লিখ্‌তে আর সময় পাই নাই। ছবি আঁক্‌তে দেখে শিক্ষয়িত্রী আমার কাছে এলেন আর শাস্তি দিলেন; কিন্তু নলিনী ও সুশীলাই সব প্রথম আরম্ভ করেছিল।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতক্ষণ ধরে তুমি ছবিটা এঁকেছিলে? আর ছবি আঁক্‌তে যদি সময় পেলে তবে রচনা লিখ্‌লে না কেন?" মালতী বলিল "ছবিটা আঁক্‌তে অনেক সময় লেগেছিল। যখনই শিক্ষয়িত্রী আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন তখনই আমাকে পাতাটা উল্টাতে হয়েছিল। হাঁ! আমি ইচ্ছা করলে ছবি না এঁকে রচনা লিখ্‌তে পারতাম, কিন্তু তা করি নাই।"

"হাঁ, এতক্ষনে ঠিক কথা বেরিয়াছে এই কদিন আগে তুমি প্রতারণা করেছিলে মনে করে কত দুঃখিত হয়েছিলে; আবার তুমি সেই কাজই করেছ? কেমন করে, বুঝিয়ে দেব? তুমি তোমার শিক্ষয়িত্রীকে বোঝাতে চেয়েছিলে যে তুমি রচনা লিখছ; কিন্তু এদিকে তুমি খেল্‌ছিলে। তুমি তোমার শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করেছিলে। যখন তুমি স্কুলে যাও তখন পড়িবার সময়, সমস্ত মন প্রাণ পাঠেই নিযুক্ত করা উচিত। খেল্‌বার সময়ে খেল্‌বে; কিন্তু কাজের সময় খেলা কর্‌লে, যিনি তোমরা কর্ত্তব্য কাজ কর্‌ছ বলে বিশ্বাস করেন তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা করা হয়।

মালতী বলিল "নলিনী ও সুশীলাইত আরম্ভ করেছিল, তারা তবে আমার চেয়েও খারাপ।"

মাতা বলিলেন "তারা যা করুক, কিন্তু তুমি যে দোষ করেছ সেটাত কম্‌বে না। আর শুধু যে তুমি শিক্ষয়িত্রীকে প্রতারণা করেছ তা নয়, আরও অন্যায় করেছ।"

বিনয় বলিয়া উঠিল "মা! আর ওকে কিছু বলো না, ওতো দুষ্টু মেয়ে নয়?"

মাতা বলিলেন "হাঁ, আমি জানি যে ও একেবারে দুষ্ট নয় সেই জন্যই ত বল্‌ছি, যাতে ও ভবিষ্যতে ভাল হ'তে চেষ্টা করে। দুষ্ট হ'লে নিজের দোষ ভাল করে বুঝতে ও পারতনা আর দোষ সংশোধন করবার জন্য চেষ্টাও করত না। এখন শোন, তোমার বাবা তোমায় লেখা পড়া করতে স্কুলে পাঠান; তুমি যদি সে সময়টা পড়ায় মন না দিয়ে খেলাতে মন দেও, তবে তাঁদের ও কি প্রতারণা করা হয় না?

এ কথা শুনে মালতীর মুখ আরও বিষন্ন হইয়া গেল এবং বলিল "আমি এত অন্যায় করেছি তাত ভেবে দেখিনি।"

কিছুক্ষণ নতমুখে নীরবে থাকিয়া মালতী বলিল "মা, যখন দোষ করি তখন সেকথা বলে দিলেইত হয়, শাস্তি দেবার কি দরকার?"

মাতা বলিলেন "কেন, এইত তুমি বললে যে তোমার শিক্ষয়িত্রী তোমাদের কথা বলতে নিষেধ করা সত্ত্বেও ত তোমরা কথা বলছিলে। তখন এই বোঝা গেল, বললে যখন তোমাদের মনে থাকছে না, তখন শাস্তি দিয়ে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। যখন বৃথা সময় নষ্ট কর্‌ছিলে সেটা মিষ্ট কথায় বুঝলেনা তখন কঠিন ভাবে শাসন করে বুঝিয়ে দিতে হল।

মালতী বলিল "এবারে আর ভুলবনা। তবে তিনি আমায় সব মেয়েদের সাম্‌নে চেয়ারের উপর পিছনে দুহাত রেখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ছিলেন, সেটা না করে অন্য কিছু সামান্য শাস্তি দিলে পারতেন।"

মাতা বলিলেন "তোমার মনের মত শাস্তি দিলেত আর তা শাস্তি হলনা। যেরূপ ভাবে শাস্তি দিলে তুমি ভবিষ্যতে আর ও রূপ করিবে না সেই জন্যই শাস্তির দরকার। এখন বুঝতে পার্‌ছ তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আর তুমি তাঁকে নির্দ্দয় মনে করোনা; খুব সম্ভবতঃ তাঁর তোমায় শাস্তি দিতে ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু কর্ত্তব্য বলে দিয়েছেন।"

মালতী বলিল "হঁা তিনি বলছিলেন যে আমায় শাস্তি দিতে তাঁর দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি নি।"

মাতা বলিলেন "তবে দেখছে তুমিই তাঁর প্রতি নির্দ্দয় হয়েছিলে। আর একটা কথা জান আমাদের মনে যাতে অনুতাপ ও দুঃখ হয় সেই জন্যই শাস্তির সৃষ্টি।"

মালতী বলিল "আমাকে চেয়ারে বসাবার আগেই যদি আমার অন্যায় বুঝে খুব দুঃখ হত তা'হলে আর ও শাস্তি পেতে হত না ?"

মাতা বলিলেন "হাঁ, তোমার মনে যদি অনুতাপ উপস্থিত হ'ত, তবে আর ওরূপ শাস্তি পে.ত হ'তনা। যে দুঃখটা পেতে তাহাই যথেষ্ট শাস্তি হ'ত। আর সে শাস্তি ঈশ্বর প্রদত্ত। তিনি আমাদের প্রাণে বিবেককে সর্ব্বদা সজাগ রেখেছেন, যখনই বিপথে যাই সে সাবধান করে দেয়; কিন্তু সে শুভবাণী যদি না শুনি তখন শাস্তি পেতে হয়।"

মালতী বলিল "মা, ঈশ্বর কি করে শাস্তি দেন ভাল বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা।" মাতা বলিলেন "একটী ছোট ছেলে আর একজনের একটী ফল তাকে না বলে নিল আর সে যাতে টের না পায় সেজন্য তাড়াতাড়ি গিলে ফেলল। সে সময়ে সে ভয়ে কাঁপছিল। পাছে তার চুরী ধরা পড়ে বলে যে ভয় ও চিন্তা এই কি যথেষ্ট শাস্তি নয়? একজন লোক একটা অন্যায় কাজ করেছে সে তা ভুলবার জন্য, বিবেকের দংশনের জ্বালা এড়াবার জন্য সুন্দর সুন্দর দেশে ভ্রমণ কর্‌তে গেল কিন্তু বহু চেষ্টাতেও পাপের স্মৃতি কিছুতেই মুছিল না এই কি তার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি নয়? সে কিছুতেই সুখী হ'তে পারেনা। আর যদি আমরা পাপের প্রলোভন এড়াতে না পারি তখন আমরা ভয়ানক শাস্তি পাই। সেটা কি জান? একবার যে পাপ করা যায় পুনরায় সে পাপ কর্‌তে আর কষ্ট মনে হয় না বরং সে কাজ না করাই কঠিন হয়।"

মালতী বলিল "মা, তুমি ঠিক বলেছ। আমাদের শিক্ষয়িত্রী বাগানের ফুল তুল্‌তে বারণ করেছেন; কিন্তু অনেকেই তোলে তা দেখে যখন বারণ কর্‌লাম তখন তারা নানারূপ ঠাট্টা কর্‌তে লাগল। কিছুদিন পরে যখন দেখ্‌লাম যে অনেকেই ফুল তুল্‌ছে আমারও একদিন ইচ্ছা হ'ল। আমি ফুল তুল্‌লাম সেই থেকে রোজ শিক্ষয়িত্রীর অসাক্ষাতে ফুল তুলি আর দোষ করেছি বলে মনেই হয় না।"

"তুমি বিবেকের বাণী শুন নাই। যদি ক্রমাগত অবাধ্য হতে থাক তবে তুমি ঈশ্বরের নিকট হইতে ক্রমে দূরে চলে যাবে, তাঁহার আলো আর তোমার আত্মায় এসে পৌঁছাবেনা।"

"মা! আমার যে মনে থাকেনা, আমি সর্ব্বদা এমন ভয়ানক সব কাজ করি!"

মাতা বলিলেন "না ভয়ানক সব কাজ কর বল্‌ছ কেন? ঈশ্বর জানেন আমরা দুর্ব্বল, সময় সময় আমাদের পদস্খলন হয়, তখন তিনি আমাদের হাত দুখানি ধরে উঠান ও আবার ভাল হ'তে চেষ্টা কর্‌তে বলেন। যদিও আমরা অনেক সময় অন্যায় করে ফেলি কিন্তু যদি সরলভাবে আর সেরূপ প্রলোভনে না পড়্‌তে চেষ্টা করি তবে তিনি তাঁর আশীর্ব্বাদ করেন ও সাহায্য করেন। আচ্ছা, আজ তবে এই পর্য্যন্ত অনেক রাত্রি হয়েছে এখন তোমরা ঘুমাতে যাও।"

মালতী বলিল "মা, আমি যে কি অন্যায় করেছি তা বুঝতে পেরেছি। কাল আমি স্কুলে গিয়ে শিক্ষয়িত্রীকে বল্‌ব যে কাল যে দোষ করেছিলাম সেজন্য আমার খুব দুঃখ হয়েছে; আর ভবিষ্যতে এরূপ নাকর্‌তে প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌ব। তিনি যে আমার মঙ্গলের জন্যই শাস্তি দিয়েছিলেন তা বুঝতে পেরেছি।"

ইহা বলিয়া তাহারা ভাই বোনে প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিল।

শ্রীবাসন্তী মিত্র।

সয়তানের গুড়ের ফোঁটা।

একদিন এক দেবদূত সয়তানকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সয়তান, কিজন্য এই পৃথিবীতে তুমি এত পাপ তাপের সৃষ্টি করিতেছ"!

সয়তান বলিল, "মহাশয়, আপনার প্রশ্নের উত্তর

দেওয়ার পূর্ব্বে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় আপনি আমাকে পাপ তাপের সৃষ্টি করিতে দেখিলেন ?

দেবদূত বলিলেন, "ইহাওকি আবার দেখাইয়া দিতে হয় ? এ সংসারে মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তি খুনোখুনি, ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ, মনঃপীড়া সকলই কি তোমার কার্য্য নহে ? তুমি সোণার সংসারকে দুঃখের সাগর করিয়াছ, পবিত্র মানব মনকে অপবিত্র নরক করিয়াছ, তথাপি তোমার কুক্রিয়া স্বীকার করিতেছ না ? ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি আছে ?"

সয়তান বলিল, "মহাশয়, ভদ্র আখ্যাধারী অনেক লোকের স্বভাব এই যে, তাহারা অন্যকে অভদ্র বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাহারা যাহা একবার বুঝিয়া বসেন, তাহা যুক্তিযুক্ত কি না বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক মনে করেন না। আপনিও আমার দোষ ধরিয়া বসিয়াছেন, তাহা সত্যকি মিথ্যা বিচার করিয়া দেখিতেছেন না। যদি বিচার ও বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে আমার অধিকাংশ কার্য্যই নির্দ্দোষ বলিয়া জানিতে পারিবেন। যদি ইচ্ছা হয় তবে এখনই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে পারেন।"

দেবদূত বলিলেন "আমি প্রমাণ পাইতে প্রস্তুত আছি, তুমি তোমার নির্দ্দোষ কার্য্য আমাকে দেখাও।"

তখন সয়তান পথের ধারে মুদীর দোকানে প্রবেশ করিল। একটা ভাঙ্গা গুড়ের হাঁড়িতে মাছি ও বোলতা ভন্ ভন্ করিতেছে। সয়তান সেই গুড়ের হাঁড়িতে আপনার মধ্যম অঙ্গুলীটী প্রবেশ করাইয়া সেই অঙ্গুলী দ্বারা রাস্তার মাঝখানে একটী গুড়ের ফোঁটা দিল এবং দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, এইগুড়ের ফোঁটাটী দিয়া আমি কিছু কুকার্য্য করিলাম কি ?"

দেবদূত বলিল, "তোমার এইকার্য্য একান্তই নির্দ্দোষ কার্য্য।"

সয়তান বলিল "মহাশয়, এখন আপনি এইখানে আমার সঙ্গে কিছুকাল অপেক্ষা করুন।"

অল্পক্ষণ পরেই একদল পিপিলীকা সারি বাঁধিয়া আসিয়া গুড় খাইতে আরম্ভ করিল। খানিকক্ষণ পরে লেজটী টিকটিক করিতে করিতে একটী টিকটিকি আসিয়া একটী একটী করিয়া পিপড়া ধরিয়া খাইতে লাগিল। এই সময় দুইজন সিপাহী সেই রাস্তায় যাইতেছিল তাহাদের মধ্যে একজনের হাতে একটী পোষা পাখী ছিল, পাখীটা সিপাহীর হাত হইতে লাফাইয়া পড়িয়া টিকটীকীটীকে উদরসাৎ করিল। তৎক্ষণাৎ মুদীর হুমো বিড়াল ঘর হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া পাখীটীর ঘাড় মটকাইয়া দিল। তাহা দেখিয়া রাগে অধীর হইয়া একজন সিপাহী তাহার হাতের মোটা লাঠির এক আঘাতে বিড়ালের মাথা চূর্ণ করিল। বিড়ালটী মুদির বড়ই প্রিয় ছিল, সেই পোষা বিড়ালের এইরূপ মৃত্যু দর্শনে মুদীর বলিষ্ঠ দুই পুত্র সিপাহী দিগের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে গালাগালি, তাহার পরে মারামারি আরম্ভ হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই পক্ষের দুইজন খুন হইয়া গেল! তখন সয়তান দেবদূতকে বলিল, "মহাশয়, এতগুলিকাণ্ড যে হইয়া গেল আমি ইহার কি করিলাম ? আমি যে গুড়ের ফোঁটা দিয়াছিলাম সে কার্য্যকেত আপনিই নির্দ্দোষ বলিাছেন, তবে আমার অপরাধ কি হইল ?" দেখিয়া শুনিয়া দেবদূত অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উপদেশ।

অতি সামান্য কার্য্য হইতে কত যে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয় এই পৃথিবীতে তাহব দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তথাপি লোকেরা সাবধান হয় না, সয়তানের গুড়ের ফোঁটা দেখিতে পায় না। সামান্য একটু পরিহাস হইতে বিষম শত্রুতা জন্মে। সামান্য বচসা হইতে খুনোখুনি হয়। সামান্য পক্ষপাতিতা হইতে গৃহ বিচ্ছেদ ঘটে। সামান্য কুপথ্য হইতে বিষম রোগের উৎপত্তি হয়, সামান্য অভিমান ধর্ম্মজীবন নষ্ট করে; দেখিলেত সয়তানের গুড়ের ফোঁটার মতন সামান্য প্রলোভন কিরূপ সর্ব্বনাশের কারণ হইল! অতএব সয়তান কখন কোথায় গুড়ের ফোঁটা দিতেছে সাবধানতার সহিত সকলেরই তাহা দেখা কর্ত্তব্য এবং যাহাতে সেই গুড়ের ফোঁটার

প্রলোভনে পড়িতে না হয় সকলেরই সর্ব্ব প্রযত্নে সেই চেষ্টা করা একান্ত উচিত।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা

ভৃত্যনীলু।

নীলানন্দ নীলমণি নীলকণ্ঠ বিষ
ফেলিতে গিলিতে নারি, কণ্ঠে অহর্নিশ!
তীর্থপথে মহানিধি পেয়েছি কুড়ায়ে;
ভঙ্গুর জীবন তার যায় বা ফুরায়ে
এই ভয়ে নড়া চড়া করিতে না চায়,
বিকল চরণে তার সিঁড়ি ওঠা দায়!
চলিতে ফিরিতে নারে মানুষের মত;
মুণিবের ঘাড়ে পড়া অভ্যাস নিয়ত!
কহিলে কাজের কথা বুঝিতে না পারে
দেখিলে মিঠাই মণ্ডা আপনা পাসরে!
পূর্ব্ব জন্ম ছিল নাকি বাগানের মালি
পচাপতা গোময়ের স্বপ্ন শুধু খালি
দেখিতেছে মর্ত্ত্যে; বর্ণ মসী বিনিন্দিত
সাদানীল পাগড়ীতে নূতন সজ্জিত!
নিদ্রায় সে কুম্ভকর্ণ, খাদ্যে বৃকোদর,
শয়নে ভোজনে বীর সিদ্ধ নিরন্তর—
গঙ্গাতীরে রাত্রি দিন করে আনাগোনা
ভক্তি কিম্বা মুক্তিতরে নাহি জানা শোনা!
শাস্ত্রে বিধি দিব্যফল দেবতায় পায়
তীর্থস্থানে ছাড়ি দিয়া ভক্ত চলি যায়—
সবেধন নীলমণি ছাড়িতে না পারি
পশু শালে দিব বলে নিয়ে যাইবাড়ী,
"ফ্রী"দিনে কতলোক দেখিবে তাহারে
ধন্য হব দীন মোরা লাট দরবারে।

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিয়ে দেওয়া গেল,

১। কয়লা।

২। আহার।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীমতী মুক্তকেশী সিংহ, শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী পুষ্পমালা চন্দ, শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ, শ্রীমতী লীলা গুপ্ত, সাহিত্য সমিতির সভ্যগণ, হাইস্কুল দার্জ্জিলং, শ্রীতুষাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিমবিহারী বসু, শ্রীবিপুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ঘোষ, কুমারী সুরমা বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীশুভ্রাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীপ্রমোদবিকাশ কানুনগো, শ্রীসরোজকুমার বসু, শ্রীইব্রাহিম খাঁ, শ্রীনরেন্দ্রকুমার কুণ্ডু, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীপ্রভাবতী দেবী, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীমতী লীলাবতী বিশ্বাস, শ্রীবিকাশচন্দ্র রায়, শ্রীরবীন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, কুমারী সুহাসিনী গুহ, শ্রীজ্যোতিভূষণ সেন।

নূতন ধাঁধা।

১। ডিমের মত দেহ আমার শাবক তাতে নাই,
তবু আমি ভিতর হতে দেখিবারে পাই,
দুই পায়েতে ভর করে যাই বসি মনের সুখে,
থাকি আমি কাণে যাই না বুকে মুখে।
দূরের জিনিষ কাছে আনি যাহা কিছু পাই
তিন অক্ষরে কি নাম আমার বল পাঠক ভাই।

২। চাঁদের মতন মোর গোলাকার মুখ
পেট শুধু আছে সার নাহি মাথা বুক।
হাত পাখা নাই মোর তবু আমি চলি,
মুখে মোর এক কথা চিরকাল বলি।
সোজা কভু হাঁটি নাক চলি ঘুরে ঘুরে,
বাঁধা ঘরে খেলা করি যাইনাক দূরে।
অন্ধকারে বন্ধ রাখ দম নাহি কাটে,
যথা ইচ্ছা নিয়ে যাও মাঠে কিম্বা ঘাটে।

যুবরাজ এডওয়ার্ড।

মুকুল

১৮শ বর্ষ। | ফাল্গুন, ১৩১৯। | ১১শ সংখ্যা।

মাতার আশীর্ব্বাদ।

আমার সন্তান,—

হও তুমি সত্যগত প্রাণ,
হও তুমি বলিষ্ঠ নির্ভীক।

শুভ যদি হয় মনোরথ
শিব দেখাবেন তোমা পথ,
সে পথে থাকিও সদা ঠিক
সত্যনিষ্ঠ বলিষ্ঠ নির্ভীক।

পিছে কেহ আসে কি না আসে,
তোমায়ে হাসে কি উপহাসে,
দেখিতে চেওনা চারি দিক।

চিত্ত তব শুদ্ধ যেন রয়,
স্তুতি নিন্দা তুচ্ছ যেন হয়,
'ধন্য' বলে কিবা বলে 'ধিক'।
চলে যাও বলিষ্ঠ নির্ভীক।

শ্রীকামিনী রায়।

অক্সফোর্ডে যুবরাজ এডওয়ার্ড।

বৎসরাধিক পূর্ব্বে আমাদের ভাবী সম্রাটের শিক্ষার বিবরণ মুকুলে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন যুবরাজ প্রধানতঃ নৌ-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ নিজে নৌ-বিদ্যা ভাল বাসেন। তাঁহাকে ইংলণ্ডের লোকেরা আদর করিয়া বলে আমাদের "নাবিক রাজা"। রাজকুমারেরও নৌ-বিদ্যার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। কিন্তু যিনি ভবিষ্যতে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট হইবেন, তাঁহার ত কেবল নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী হইলেই হইবে না; তাঁহার শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন এবং সর্ব্বতোমুখীন হওয়া প্রয়োজন। সেই জন্য তাঁহার শিক্ষার অনেক আয়োজন হইতেছে।

ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশী ফ্রান্স। এ উভয় দেশের মধ্যে বিবিধ সূত্রে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং ইংলণ্ডের রাজার পক্ষে ফ্রান্স সম্বন্ধে জ্ঞান ও ফরাসী জাতির সহিত সহানুভূতি যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুবরাজকে ফ্রান্স দেশে পাঠান হইয়াছিল। তিনি কয়েকমাস সেখানে বাস করিয়া ফরাসী ভাষা শিক্ষা ও ফ্রান্স দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিলেন। পারিসে অবস্থান কালে তথাকার অধিবাসীরা যুবরাজের ব্যবহারে মোহিত হইয়াছিল। ক্রমে বোধ হয়, যুবরাজকে অন্যান্য দেশেও পাঠান হইবে।

সম্প্রতি তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের লোকেদের উচ্চশিক্ষার প্রধান স্থান অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়। দেশের লোকের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর অগাধ শ্রদ্ধা। দেশের সকল ধনী এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের সন্তানদিগকেই অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে পাঠান হয়। বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই। কিন্তু পরলোকগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড অক্সফোর্ডও

কেম্ব্রিজ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; অক্সফোর্ডেই বেশী দিন ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে যুবরাজ এডওয়ার্ডকেও অক্সফোর্ড পাঠান হইয়াছে।

সম্রাট সপ্তম এডওয়াড অক্সফোর্ডের ক্রাইষ্টস কলেজের ছাত্র ছিলেন। বর্ত্তমান যুবরাজ মডলীন কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন। মডলীন অক্সফোর্ডের একটী প্রাচীন এবং বিখ্যাত কলেজ; ১৪৭৩ সালে উইলিয়ম অব ওয়েনফ্লীট নামক এক ধনী ব্যক্তির কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ কার্ডিনাল উলসী এই কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের আরও অনেক কৃতী সন্তান এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জোসেফ এডিসন এবং সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। মডলীন কলেজের পার্শ্বেই তরুচ্ছায়া বেষ্টিত সুন্দর উপবন আছে; তাহার ভিতর দিয়া একটী অতি মনোরম বেড়াইবার পথ আছে; এটী এডিসনের ভ্রমণ পথ (Addison's Walk) নামে প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি এই, যে এডিসন অনেক সময়ে এখানে একাকী ভ্রমণ করিতেন।

অক্সফোর্ড স্থাপত্য সম্পদে অতুলনীয়। এখনকার সকল কলেজেরই স্থাপত্য শিল্প উচ্চ অঙ্গের; প্রতি বৎসর দূর দূরান্ত হইতে সহস্র সহস্র নরনারী কলেজের বাড়ী গুলি দেখিতে আসে। অক্সফোর্ডের কলেজ গুলির মধ্যে আবার মডলীন কলেজ দেখিতে অতিশয় সুন্দর। ইহা আইসিস নদীর ঠিক উপরে। মডলীন কলেজের পাশেই আইসিসের সেতু। কলেজের উত্তরে আইসিসের তীরে সুবিস্তৃত উপবন। নদীর তীরে তীরে বৃক্ষ ও লতার ছায়ার মধ্য দিয়া বেড়াইবার পথ। তীর হইতে উইলো (Willow) গাছ হেলিয়া নদীর উপরে পড়িয়াছে। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে মডলীন কলেজের উন্নত সৌধ। একদিকে জন কোলাহলপূর্ণ রাজপথ, অপর দিকে শান্ত আশ্রমের ন্যায় উপবন। কলেজ সংলগ্ন উপাসনা গৃহের চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। বহুদূর হইতে এই চূড়া দেখা যায়। মডলীনের চূড়া (Tower) অক্সফোর্ডের একটী দর্শনীয় পদার্থ। ইহার সঙ্গে আবার একটী অতি কৌতুকাবহ প্রথা জড়িত আছে। প্রতি বৎসর ১লা মে প্রত্যুষে মডলীনের চূড়া হইতে লাটিন ভাষার সঙ্গীতে বসন্ত ঋতুকে অভ্যর্থনা করা হয়। মডলীন কলেজ সঙ্গীতের জন্যও বিখ্যাত। কলেজ সংলগ্ন উপাসনালয়ের সঙ্গীতদল (Choir) অক্সফোর্ডের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সূর্য্যোদয়ের সময়ে এই সঙ্গীত দল চূড়ার শীর্ষ দেশ হইতে সুমধুর স্বরে গান করে। সমস্ত সহরের লোক তাহা শুনিবার জন্য সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া যায়। রাত্রিতে চন্দ্রালোকে আইসিসের তীরে মডলীন স্বপ্নের মত মনে হয়।

যুবরাজ এডওয়ার্ড গত অক্টোবর মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া এই মডলীন কলেজে বাস করিতেছেন। তিনি কলেজের উত্তরাংশে বাসস্থান পাইয়াছেন। অন্যান্য ছাত্রদের গৃহ হইতে তাঁহার গৃহের কোন পার্থক্য নাই; তবে অন্যান্য ছাত্রেরা একটী বা দুইটী ঘর পায়; তাঁহার জন্য এক পার্শ্বের সমুদয় কক্ষগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আর তিনি একটী স্নানের ঘর পাইবেন; অন্যান্য ছাত্রদের স্নানের জন্য সাধারণতঃ একটী টিনের গামলা দেওয়া হয়।

যুবরাজ অক্সফোর্ডের ডিগ্রী পরীক্ষা দিবেন না; কারণ তিনি বোধহয় এক বৎসরের অধিক অক্সফোর্ডে থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু আর আর অংশে অন্যান্য ছাত্রদের মতই পড়া শুনা করিবেন।

নরেন্দ্র ও নলিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আশুবাবু বাড়ীতে ছিলেন না। এখন বাড়ী আসিয়া চাকরের কাছে সকল কথাই শুনিতে পাইলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে নরেনের গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "তুমি যে অন্যায় কাজ করেছ, তার আর মার্জ্জনা নাই। আমি এক ঘণ্টা সময় দিচ্ছি; এই সময়ের মধ্যে

তোমার পিসির পায়ে মাথা রেখে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।"

নরেন বাপের ভয়ে পিসির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল; কিন্তু বোনের উপর ভয়ানক চটিয়া গেল। সে ভাবিল, তাহার দিদিই বাবার কাছে সমস্ত কথা বলিয়া দিয়াছে।

বিকালে নলিনী যখন তাহার ঘরে আসিল, তখন সে রাগে রক্তজবার মত দুই চক্ষু লাল করিয়া কহিল, "কে তোমাকে আমার ঘরে আসতে বলেছে? তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। আজ হতে আর আমি কথাই বল্‌ব না!"

নলিনীর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে দোষ দেখিলে ভাইকে শক্ত কথা বলে বটে, কিন্তু তাহাকে বড়ই ভালবাসে।

নলিনীর মা নরেনকে কত অনুরোধ করিলেন, আশু বাবু কত ভয় দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই সে আর দিদির সঙ্গে কথা কহিল না। এমনই তাহার জেদ!

আশুবাবু নরেনকে লক্ষ্ণৌর সাহেবদের একটি বোর্ডিংএ পাঠাইয়া দিবেন স্থির করিলেন। সেখানে কিছুতেই উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিবার যো নাই। নরেন সে বোর্ডিংএর নিয়ম-শৃঙ্খলার কথা কিছুই জানিত না; তাই সে সেখানে যাইতে আপত্তি করিল না। এখন আর তাহার এ পাড়াগাঁয়ে একদিন ও থাকিতে ইচ্ছা হয় না; এখানে কোন রকম সখের জিনিষ পাইবার সুবিধা নাই।

নরেনের লক্ষ্ণৌ যাইবার দিন স্থির হইল। নলিনী আর থাকিতে পারিল না। সে নরেনের ঘরে গিয়া কহিতে লাগিল, "লক্ষ্মী ভাই, কেন আমার সঙ্গে কথা বলবে না? কি দোষ করেছি? তুমি কোন দিন আমাদের ছেড়ে দূরে যাও নাই, এবার যাচ্ছ; তা মনে করে বড় কষ্ট হচ্ছে। কে বলবে আবার কত দিন পরে দেখা হবে? যাবার সময় আমার সঙ্গে ভাব করে যাও। আমি তোমাকে চিঠি লিখব।"

নলিনী এই রকম কত স্নেহের কথাই বলিল। কিন্তু নরেনের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। আশু বাবু বিরক্ত হইয়া নরেনকে ভাল কাপড় জামা কিছুই কিনিয়া দিলেন না। নলিনী নিজের টাকায় কলিকাতা হইতে ভাল কাপড় আনাইয়া আপনার হাতে অনেকগুলি কোট ও জামা তৈয়ার করিল। তাহার সঙ্গে নূতন বস্ত্র ও কয়েকখানি ভাল বই কিনিয়া নরেনের একটি বাক্স সাজাইয়া রাখিল। নরেন যে দিন লক্ষ্ণৌ রওনা হইবে, সেদিন তাহার বাক্সের মধ্যে নলিনীর প্রদত্ত জিনিসগুলি দেখিতে পাইয়া একটি একটি করিয়া বাহিরে ধূলা বালির মধ্য ফেলিয়া দিল। নলিনী মনের কষ্টে কাঁদিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নরেন লক্ষ্ণৌ বোর্ডিংএ পৌঁছিয়া ভারি মুস্কিলে পড়িয়া গেল। এখানে পিতা মাতা ও ভগিনীর অভাব পদে পদে অনুভব করিতে লাগিল। আগে মাষ্টার পড়াইতে আসিলে মা আদর করিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেন। এখন ভোরবেলায় ঘণ্টা পড়িলেই উঠিতে হইবে। না উঠিলেই শাস্তি। আগে অল্প সময় পড়িলেই চলিত। এখন সেটি হইবার যো নাই। সাহেব শিক্ষকের দুটি চোখ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, না পড়িলেই তিরস্কার। আগে নরেনের খাবার সময় কত রকমই আব্দার এবং জেদ ছিল। রাঁধুনী রেকাবে মাছ ভাজা, বেগুণ ভাজা, পটল ভাজা এবং বাটিতে বাটিতে ডাল, চচ্চড়ি, মাছের ঝোল, ডিমের ডালনা, কিসমিসের চাটনি ও ঘন দুধ সাজাইয়া রাখিত, আর তাহার মা সম্মুখে বসিয়া বাবা, এটা খাও, ওটা খাও বলিয়া কতই স্নেহ প্রকাশ করিতেন। অথচ ডালে একটু নুন কম, ডালনায় একটু ঝাল বেশি, ভাজাটা একটু কড়া হইলেই নরেন বিরক্ত হইয়া ঐ সকল খাদ্য সামগ্রী পাত্র সমেত টান মারিয়া ফেলিয়া দিত। স্নেহময়ী জননী আবার রান্নাঘর হইতে বাটী ভরিয়া সেই সকল খাবার আনিয়া কত রকম মিষ্টিকথা বলিয়া নরেনকে খাওয়াইতেন। এখন আর খাবার সময় কে

তাহার কাছে বসে ? কেইবা তেমন যত্ন করিয়া খাওয়ায় ? রাগ করিয়া খাদ্যসামগ্রী না খাইলে ম্যানেজার সাহেবের ধমক খাইয়াই দিন কাটাইতে হয়। নরেনের এক এক সময় মায়ের কথা মনে পড়িয়া চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া যায়।

নরেনের চোখের জল দেখিয়া একজন দয়াবান শিক্ষক তাহাকে আপনার ঘরে ডাকিয়া আনিলেন এবং স্নেহে পূর্ণ হইয়া কহিতে লাগিলেন,

"তুমি বাপ মা ছেড়ে বোর্ডিংএ এসেছ, সেজন্য যে তোমার কষ্ট হয় তা বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু দেখ, বোর্ডিং-এ তোমার মত আরো কত ছেলে রয়েছে; তারা পড়াশুনা করে বেশ হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছে; তারা খুব ভাল এবং আমাদের অতিশয় বাধ্য বলে কত ভালবাসা পায়। তুমি শিক্ষকদের অবাধ্য হও কেন? পড়াশুনা না করে দুষ্টুমি করে বেড়াতে চাও কেন? বেশ ভাল হও, আমরা তোমাকে খুব ভালবাসব।"

কিন্তু হায়, শিক্ষকদের ভালবাসা ও যত্ন আদর পাইয়াও নরেনের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। সে বোর্ডিংএর নিয়ম না মানিয়া নিজের খেয়াল অনুসারে চলিবার জন্য নানা রকম চাতুরী আরম্ভ করিল

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্ণৌ সহরে মারহাট্টা সার্কাসের অভিনয় হইতেছে। বোর্ডিংএর এক সাহেব শিক্ষক নিজেই একদিন ছেলেদের সঙ্গে লইয়া সার্কাস দেখিতে গেলেন। কিন্তু নরেনের হিতে বিপরীত হইল। সে একদিন সার্কাস দেখিয়া খুসী হইতে পারিল না। সে প্রতি বুধবার ও রবিবার রাত্রে সার্কাস দেখিতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অথচ রাত্রি নয়টার পর কোন ছেলেরই বোর্ডিংএর বাহিরে থাকিবার নিয়ম নাই।

এক দিন নরেন বোর্ডিংএর দরোয়ানকে একটী টাকা দিয়া রাত্রি নয়টার পর বোর্ডিংএর বাহিরে গেল। বরাবর সার্কাসওয়ালাদের আড্ডার কাছে গিয়া তাহাদের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। আবার রাত্রি বারটার সময় বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া রহিল।

নরেনের এই অন্যায় কাজের কথা গোপন রহিল না। সে বোর্ডিংএর আর একটী ছেলের কাছে গোপনে সমস্ত কথা বলিয়া কহিল "ভাই, কাল যে কি চমৎকার সার্কাস দেখেছি, তা আর কি বল্‌ব? প্রথম একটা মস্ত হাতী দাঁড়াল; তার উপর একটা বাঘ; সেই বাঘের উপরে ছোট একটী মেয়ে রাণী সেজে বসেছিল। সমস্ত লোক দেখে একেবারে অবাক্‌ হয়ে গেল। চল না ভাই, বুধবার রাত্রে আমরা দুজনেই গোপনে সার্কাস দেখতে যাই।"

ছেলেটি কহিল "নরেন, তুমি মাষ্টারদের চোখে ধুলা দিয়ে রাত্রে বোর্ডিংএর বাইরে গিয়েছিলে? কি ভয়ানক কথা! আবার আমাকেও তোমার সঙ্গে সার্কাস দখতে যেতে বলছ? আমি ত যাব না।"

ছেলেটি নরেনের গোপনীয় কথা আর একটি ছেলের কাছে বলিল। সে আবার সাহেবের কাছে বলিয়া দিল। সাহেবই বোর্ডিংএর অধ্যক্ষ। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া নরেনকে কঠিন শাস্তি দিলেন; কহিলেন—

"তুমি নিজে ত অন্যায় কাজ করেছই; আবার আর একটী ছেলেকে ফুসলায়ে তোমার দলে টান্‌বার চেষ্টা করেছিলে। এজন্য কিছুতেই তোমাকে ক্ষমা করা যায় না। তোমার এই শাস্তি হল আজ থেকে সাতদিনের ভিতর তুমি বোর্ডিংএর প্রাচীরের বাইরে যেতে পারবে না; ঐ কয়েক দিন অন্য ছেলেদের সঙ্গে তোমার কথা বলাও বন্ধ হইল।"

নরেন সমস্ত সময় ছেলেদের সঙ্গে কথা কহিয়া কাটাইতে চায়, তাহার পক্ষে এ কঠিন শাস্তি। সে ক্রমাগত সাতদিন ছেলেদের সঙ্গে কথা না কহিয়া কেমন করিয়া দিন কাটাইবে? নরেন বোর্ডিংএর উপর হাড়ে চটিয়া গেল। কিন্তু সে দেখিল তাহর রাগের জন্য কাহারও বিশেষ কিছু লোকসান হয় নাই। তখন নরেন আরও রাগিয়া গেল এবং একদিন বোর্ডিং হইতে পলাইয়া লাহোর চলিয়া গেল। কেহই তাহাকে ধরিতে পারিল না।

নরেনের সঙ্গে একটী ঘড়ি একটী সোণার চেইন এবং একটি আংটি ছিল। উহা বিক্রী করিয়া দুইশত টাকা সংগ্রহ করিল। কিন্তু সংগ্রহ করিলে কি হইবে? অল্প বয়স এবং নূতন লোক দেখিয়া এক জুয়াচোর তাহার পশ্চাতে লাগিল। সে কহিল—

"বাবু সাহেব, তুমি বুঝি বাঙ্গলা মুলুকের লোক? আমিও অনেক দিন বাঙ্গালা দেশে ছিলাম। পাতিয়ালার নাম শুনেছ? সেখানে এক শিখ রাজা আছেন। সেই রাজার রাজ্যে আমি বাস করি। ঘরে টাকার কোন অভাব নাই, তাই দেশ দেখ্‌তে বেরিয়েছি। লাহোর অমৃতসর ঘুরে শিমলা যাব, তার পর বোম্বাই মান্দ্রাজ যাওয়ারও ইচ্ছা আছে।"

নরেন ভাবিল তবে ত বেশ একজন সঙ্গী জুটিয়া গেল। লোকটি খুব চালাক। ইহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে পারিলে ধরা পড়িবার ভয়ও খুব কম। তা ছাড়া নূতন নূতন দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবারও খুব সুবিধা হইবে।

নরেন পঞ্জাবের পোষাক পরিয়া এবং মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া একজন পঞ্জাবী বালক সাজিল এবং নেহাল সিং নামক জুয়াচোরের সঙ্গী হইয়া অমৃতসর গমন করিল। সেখানে দুইজনই কয়েক দিনের জন্য একটি ঘর ভাড়া করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল।

এক দিন নরেন তাহার বাক্সে দেড়শত টাকার নোট রাখিয়া শিখদের স্বর্ণমন্দির দেখিতে গেল। জুয়াচোর নেহাল সিং সেই দিনই তাহার বাক্স ভাঙ্গিয়া নোট লইয়া পলায়ন করিল। নরেন বাসায় আসিয়া তাহার ভাঙ্গা বাক্স দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। "নেহাল সিং" "নেহাল সিং"—আর কোথায় নেহাল সিং? কে নরেনের ডাকে জবাব দিবে? নরেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইল, নেহাল সিংহের দেখা পাওয়া গেল না।

নরেন বালক হইলেও খুব চালাক ও সাহসী; তবুও ত তাহার বয়স এখন ষোল বৎসর। সে আজ আপনাকে একেবারে অসহায় মনে করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কতদিন পরে আজ মায়ের কথা মনে পড়িল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে দিদির স্নেহমাখা মুখখানিও মনে হইবে। নরেন চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিয়া উঠিল

"আমার দিদি কিরকম ভাল মেয়ে; আমি কেন, এত খারাপ হলেম? আমার কেন কুমতি হল? আজ মা আমার জন্য কত চোখের জল ফেলছেন তা কে বলবে?"

নরেনের হাতে অল্প কয়েকটি টাকা ছিল, তাহা খরচ হইয়া গেল। টাকার জন্য মায়ের কাছে চিঠি লিখিতেও সঙ্কোচ বোধ হইল। এদিকে অমৃতসরে প্লেগ আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিন বিস্তর লোক মারা যাইতেছে। নরেন যে কি করিবে কোথায় যাইবে কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আজ পাঁচদিন হইল নরেনের প্লেগ হইয়াছে। টেলিগ্রাম পাইয়া তাহার পিতা মাতা অমৃতসর আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নরেন রোগের ভয়ানক যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পিতাকে বলিতে লাগিল

"আমি আপনার অবাধ্য হয়ে যে অন্যায় কাজ করেছি, ঈশ্বর তার জন্যই আমাকে কঠিন শাস্তি দিচ্ছেন। এবার যদি সেরে উঠি, তা হলে আর আমি আপনার অবাধ্য হব না। আমাকে আপনি মার্জ্জনা করুন।"

নরেনের এই কাতরোক্তি শুনিয়া তাঁহার মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন

"ধন আমার, সর্ব্বস্ব আমার, তুমি সেরে ওঠ, তোমার শত অপরাধ মাপ করব।"

নরেন মায়ের দুখানি পায়ের উপর মাথা রাখিয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিল। একটু আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল "মা, তোমার মনে কতকষ্ট দিয়েছি', তোমার কাছে লক্ষ অপরাধ করেছি, ঈশ্বর কি আমাকে আর মার্জ্জনা করবেন?"

নরেনের পিতা হাজার হাজার টাকা খরচ করিলেন, বড় বড় ডাক্তারেরা চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নরেনের

মনে হইল সে আর বাঁচিবে না। এখন তাহার মুখে এক দিদি ছাড়া আর কোন কথাই নাই, সে বার বার বলিতে লাগিল

"মা, দিদিকে কি তার করেছ? কই? দিদি ত এল না? আমি কি একটি বার তাঁকে দেখতে পাব না? তাঁর কাছে জন্মের মত ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই।"

ভায়ের বাঁচিবার আশা খুব কম এই সংবাদ পাইয়া নলিনী অমৃতসরের দিকে যাত্রা করিল; দুই দিন পরেই নরেনের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী ভাইকে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না; চোখের জলে তাহার গণ্ড দুটি ভাসিয়া যাইতে লাগিল, নরেন কহিল,

"দিদি, আমাকে মাপ কর, আমার সকল অপরাধ ভুলে যাও। আর ত বেশিদিন তোমাকে দেখ্‌তে পাব না; কাছে এস, আমার আরো কাছে এস, একটিবার আদর কর, আমাকে ভালবাসা দাও, আমার প্রাণ জুড়িয়ে যাক।"

দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, নলিনী সমস্ত সময় ভায়ের পাশে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। শুধু কি শুশ্রূষা? নলিনী চোখের জলে ভাসিয়া ভায়ের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ঈশ্বরের কৃপায় নরেন কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিল। ডাক্তারেরা কহিলেন "নরেনের বাঁচিবার ত আশা ছিল না, কেবল ভগিনীর প্রাণপণ শুশ্রূষার জন্যই কঠিন রোগ হতে রক্ষা পেয়েছে। কোন বাঙ্গালীর মেয়ে যে এমন রোগীর শুশ্রূষা করতে পারে, আমরা ত আগে মনে করতে পারি নাই।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া আশুবাবুর মন পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন "শুধু শুশ্রূষা কেন, আমার লক্ষ্মী মেয়ে অনেক কাজই খুব ভাল করে করতে পারে।"

অসুখের পর নরেনের পরিবর্ত্তন হইল, সে খুব ভাল হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই নরেন প্রায় সকল বিষয়েই ভাল হইয়া উঠিল। তাহার পিতা মাতার সুখের আর সীমা রহিল না।

সমাপ্ত।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

পূজার ছুটি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যোগমায়া ভোগমায়ার মন্দির বহু পুরাতন। স্বাভাবিক পর্ব্বত গুহাতেই নানারূপ দেবদেবীর মূর্ত্তি পাথর হতে খুদে তোলা। এ মূর্ত্তিও তাই, তবে মুখে একখানি পিতলের মুখস পরান—সর্ব্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা। এ তাঁদের প্রতিদিনের আকার; উৎসবে যে দিন শৃঙ্গার অর্থাৎ সাজ সজ্জা হয় সেদিন অনেক হীরা মুক্তা মণি কাঞ্চনে শোভিত হয়ে সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করেন। নূতনের মধ্যে দেখিলাম এখানে মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পুরুষের হাতে নয়, মেয়েদের হাতে, তাঁরাই মূর্ত্তি দেখান, দক্ষিণা গ্রহণ করের, পূজাও করান বোধ হয়, তবে সে বিষয় কিছু জানিনে। মন্দিরের প্রাঙ্গনে, চারিদিকে, মন্দিরের মধ্যেও অনেক ব্রাহ্মণ বসে চণ্ডী পাঠ করছিলেন। তাঁদের গম্ভীর স্নিগ্ধ মধুর সমবেত কণ্ঠস্বর বড় হৃদয়গ্রাহী বোধ হয়ে ছিল। যোগমায়া ভোগমায়ার মন্দিরের আশে পাশে ছোট খাট মন্দির আরও আছে তাতে নানা প্রকারের বুদ্ধ মূর্ত্তি। সেই প্রশান্ত সুন্দর মূর্ত্তি গুলির প্রায় অঙ্গহানি করা হয়েছে, দেখে বড় কষ্ট হল। এ শুধু হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তি নাশক কালাপাহাড়ের কুকীর্ত্তি নয়, এর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মবিরোধী হিন্দু পুরোহিতদিগের অত্যাচারও প্রকাশ পাচ্ছে, কেন না মনসা শীতলা সবাই অখণ্ডরূপে বিরাজ করছেন কেবল করুণা অবতার বুদ্ধেরি দুর্দ্দশা।

এই মন্দির দেখে আমরা যে বনপথে কিছু দূর হেঁটে গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম সেখানে অসংখ্য বানরের বসবাস। তাদের ডেকে কড়াই মুড়কি দিলে কাছে এসে নিয়ে যায়। একটা বানরী এল তার বুকে ছোট্ট একটি বাচ্ছা

আঁকড়ে জড়িয়ে আছে—মাতা মুড়ি মুড়কি খাচ্ছে দেখে সেও ঘাড় নাড়তে মুখ নাড়তে লাগল—ভঙ্গী যেন সেও কিছু খাচ্ছে। আমাদের একজন সঙ্গীর কাছে বন্দুক ছিল, দু একটা বানর সেটা ধরে টানাটানি করতে লাগল। এদের উপর সবাই দয়া করে, তাই এরা ভয় শেখেনি; ছোট ছেলের মত আদর পেলে আনন্দ করে কাছে আসে!

যোগমায়া ভোগমায়া দেখতে পর্ব্বত বেয়ে উপরে উঠতে হয়, তার পর পর্ব্বতের গায়ে কাটা সুন্দর সিড়ি দিয়ে নেমে এসে গুহার মধ্যে মন্দির। চারিদিকের দৃশ্য পুরাণ আশ্রমের যেমন বর্ণনা পড়া যায় তেম্নি পবিত্র,—সুন্দর গাছপালা, লতা ফুল পাখীর গানে বড় মনোরম, আর এমন প্রগাঢ় নীরব নির্জ্জনতা যে সমস্ত মন শান্তিতে ভরে ওঠে। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির গঙ্গাতীরে, সহরের ভিতর দিয়ে গিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরের অধিকারী মোহন্তের অনেক ঐশ্বর্য্য। চারি পাঁচটি হাতী, অনেকগুলি উট বাঁধা আছে দেখিলাম। মন্দিরে যাবার পথে—এখানকার কালীঘাটে যাবার পথের মত দুধারে বাজার আর দোকান। এখানে দোকানীরা তীর্থ যাত্রীদের নিয়ে যেমন টানাটানি করে পাণ্ডারাও তেমনি। বেচারী যাত্রীরা কোনদিকে যাবে, কার কথা শুনবে বুঝতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। যাই হোক আমরা বুদ্ধি ও পথ দুইই ঠিক রেখে মন্দিরে পৌঁছিলাম। মন্দিরটিও কালীঘাটের মত, মূর্ত্তিটি তবে ভাল. এখানে পুরোহিতের উপদ্রব নেই, তবে ভিখারী বড় ভয়ানক। একেবারে অস্থির করে তোলে—হাতে করে দেবার অবসর পর্য্যন্ত দেয় না, ছোঁমেরে নিতে চায়। এই জন্যে আমাদের মধ্যে একজন বিরক্ত হয়ে তাদের লাঠি নিয়ে তাড়া করে গিয়েছিলেন—মারেন নি বোধ হয়। যাই হোক মন্দিরে এসে গরীবকে মারতে যাওয়া, তাঁর এ পাপের শাস্তি হাতে হাতে পেলেন। খানিক পরে দেখিলেন তাঁর সখের রূপা বাঁধা লাঠিখানির রূপা কোথায় অন্তর্ধান! আমরা যখন মন্দিরে প্রবেশ করলাম তখন আরতি আরম্ভ হয়েছে চারিদিকে; ধূমের আর পূজা পুষ্পের সুগন্ধ একটি নীলাভবাষ্পে সমস্ত মন্দিরটি আচ্ছন্ন, তার মধ্যে আরতি প্রদীপগুলি দূর আকাশের তারার মত দেখাচ্ছিল—শঙ্খঘণ্টা ডঙ্কা একত্রে বাজছিল। যাত্রীদের ভক্তি উজ্জ্বল মুখগুলি সব চেয়ে দর্শনীয় বোধ হয়েছিল। এই আদিম কালী মন্দির—বিন্ধ্যাচল দস্যুদের প্রথম আবাস, বেদে যাদের দস্যু বলে অর্থাৎ এদেশের পূর্ব্বতন অসভ্য পার্ব্বতীয় বন্য মানব সমূহের বাসস্থান। তবে এখানে পূর্ব্বে নরবলি হত যে একটা অপবাদ শুনেছিলাম সে কথা এখানকার সকলেই অস্বীকার করলেন। মন্দির হতে আমরা নদীপথে বাড়ী ফিরিলাম। এমন সুন্দর নদীর ঘাট, এমন প্রশস্ত অল্প উচ্চ সরল সিঁড়ি অতি কমই দেখেছি। কত দিনের পুরাণ ঘাট এখনও অটল, এখনও প্রায় নূতনের মতই সুন্দর, দেখে আশ্চর্য্য মনে হল। সে দিন শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী, তার পর দিন হতে মন্দিরে দুর্গাপূজার আয়োজন হবে। নৌকা হতে দূরে মন্দিরের আরতিবাদ্য এমন গম্ভীর সান্ত্বনা পূর্ণ মনে হল—নির্ম্মল আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের আলো, বাতাসটী স্নিগ্ধ, স্রোতের ঈষৎ দোলা, জলের কলগান, আমরা বড় মনের আনন্দে বাড়ী ফিরলাম।

চুণার যেতে হলে মির্জ্জাপুর হতে বাড়ী ফির্বার পথে দু'ষ্টেশন পূর্ব্বের দিকে উজান ফির্তে হয়। আমরা সবাই সেখানকার দুর্গ দেখবার জন্য একদিন দুপর বেলা গিয়েছিলাম।

চুণারের এই দুর্গ গঙ্গানদীর একটি বাঁকের পাশে নির্ম্মিত। এখানকার লোকে বলে মহাভারতের কালে অর্থাৎ দ্বাপর যুগে মগধরাজ জরাসন্ধ এ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। একথা কিন্তু বিশ্বাস হয় না; দুর্গটি কোন হিন্দুরাজার কীর্ত্তি সন্দেহ নাই, পরে মুসলমানেরা অধিকার করেছিল। যখনি নির্ম্মিত হোক না কেন বহু পুরাতন হয়েও এখনও জীর্ণ হয় নি। কালের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। এখনও দুর্গ প্রাকার অভগ্ন। প্রাচীন হিন্দু রাজাগণ যেখানে বসে দোষীর বিচার কর্ত্তেন সে জায়গাটি দেখলাম। অনেক গুলি সিঁড়ি বেয়ে

উঠে একটি প্রকাণ্ড ঘরে যেতে হয়, তার ছাদ আছে দুয়ার জানালা নেই। চারিদিক অবারিত, আর সম্মুখে গঙ্গা স্রোত প্রসারিত হয়ে একেবারে দিগন্তে মিশিয়ে গিয়েছে। এই দুর্গ প্রাঙ্গণের আর এক জায়গায় আমাদের একটি বেদিকা দেখিয়ে বলে, সেখানে উজ্জয়নীরাজ বিক্রমাদিত্যের কবি ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি জীবনের শেষে সন্ন্যাসী হয়ে এসে বাস করেছিলেন। একদিন পূর্ণিমা রাতে কোথায় যে অন্তর্ধান হয়ে যান আর তাঁকে কেউ খুঁজে পায়নি। এখানকার লোকের বিশ্বাস দেবতারা স্বর্গ হতে আপনারাই এসে তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন; মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা কর্‌তে হয় নি। আমাদের এদেশে রাজা প্রজা যে যেমন লোকই হোক না কেন জীবনের কিছু কাল অতিবাহিত হয়ে যাবার পর বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই রাজভ্রাতা কবি ভর্ত্তৃহরি যে এখানে এসে জীবনের শেষ ভাগে শান্তির আরাধনা করেছিলেন তা কিছু আশ্চর্য্য মনে হ'লনা। উপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে যেমন বিচারালয় দেখেছিলাম—নীচে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে তেম্নি কারাগার দেখ্‌লাম। সে কি অন্ধকার ঘর, দিনের বেলায় ও সেখানে প্রগাঢ় অন্ধকার। হাঁৎড়ে হাঁৎড়ে সিঁড়ি ওঠা নামা কর্‌তে হয়। বন্দীরা দিনের পর দিন মাসের পর মাস সেখানেই থাক্‌ত, একটি বার শুধু দিনে আলোর মুখ দেখ্‌তে পেত, যখন প্রহরী একটি ছোট্ট দুয়ার খুলে তাদের খাবার দিয়ে যেত। সে অন্ধকূপে লোক অধিক দিন বেঁচে থাক্‌ত না এই যা সান্ত্বনা। এখন সেখানে পেঁচা বাদুড় চামচিকা বসবাস করছে; আমাদের দেখে তারা ভয়ে অস্থির হয়ে চারিদিক উড়ে বেড়াতে লাগল। উপরে উঠে এসে যখন চোখের উপর আলো এবং সর্ব্বাঙ্গে বাতাসের স্পর্শ অনুভব কর্‌লাম তখন মনে হ'ল নতুন করে যেন বেঁচে উঠ্‌লাম। সে কারাগারের বাতাসও কেমন হিম—ঠিক মনে হয়েছিল মৃত্যু যেন চারিদিকে ঘিরে ধরেছে। এখানে একটি বড় সুন্দর ঘর আছে ঠিক যেন পদ্মফুলের গড়নের—ছাদ খিলান করা আর চারিদিকে পল তোলা। এখানকার লোকেরা বল্লে সেখানে আলাউদ্দীনের সঙ্গে কোন হিন্দু রাজ কন্যার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু এখন সেখানে জেলের কয়েদীরা থাকে। চুনার দুর্গের বিশেষত্ব মনে হ'ল তার চারিদিকের সুন্দর দৃশ্য আর তার অজেয় কাঠিন্য। কত যুগ যুগান্তর বহে গিয়েছে এখনও কোথাও তার একখানি পাথরও খসে পড়েনি। কাশীর রাজা চেৎসিংহ ওয়ারেন হেষ্টিংসকে কিছুদিন এখানে বন্দী করে রেখেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই দুর্গ তাদের বিশেষ আশ্রয় স্থান ছিল। এখন ইংরাজ রাজের হাতে পড়ে জেলখানা হয়েছে, এখানে যত চোর বাটপাড় বাস করে। আর যে সব ছেলে অল্প বয়সে মন্দ হয়ে যায় তাদেরও এখানে আটক করে রেখে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

গুরু ভক্তি।

১

শান্তিপুরে বাস তার, নামে হরু তাঁতি
মনে ভাব'ত বিদ্বান সে, গণ্ডমূর্খ অতি।
ভাব'ত সে তার মুখের কথা সব শাস্ত্র সিদ্ধ,
যা কিছু লেখে সবই যেন দিগ্‌গজ কৃতবিদ্য।

২

এক দিন তার দাদা, লোকটা কিছু ভোঁদা,
গেছে কোথায় বিদেশে, হুগলী কি বাদা।
হরু বসে দাওয়ার উপর তামাক খায় কসে
বাড়ীতে আছে বুড়ি মা, তার তোয়াক্কা রাখে কিসে?

৩

এমন দিনে এলেন বুড়ো গুরু ঠাকুর তথায়,
সঙ্গে লয়ে বৃদ্ধ ভৃত্য উঠলেন গিয়ে দাওয়ায়।
সাষ্টাঙ্গ প্রণমি হরু, পাদ্য অর্ঘ দেয়
"আছেন ভাল? শীর্ণ দেহে!" নানা কথা কয়।
(আহা! সে যে ভক্ত অতিশয়)

৪

ভুলেছি আমি বলতে, হরুর ছিল একজোড়া জুতা—
লম্বা চওড়ায় সওয়া দু হাত, দুটো আস্ত মোষের মাথা!
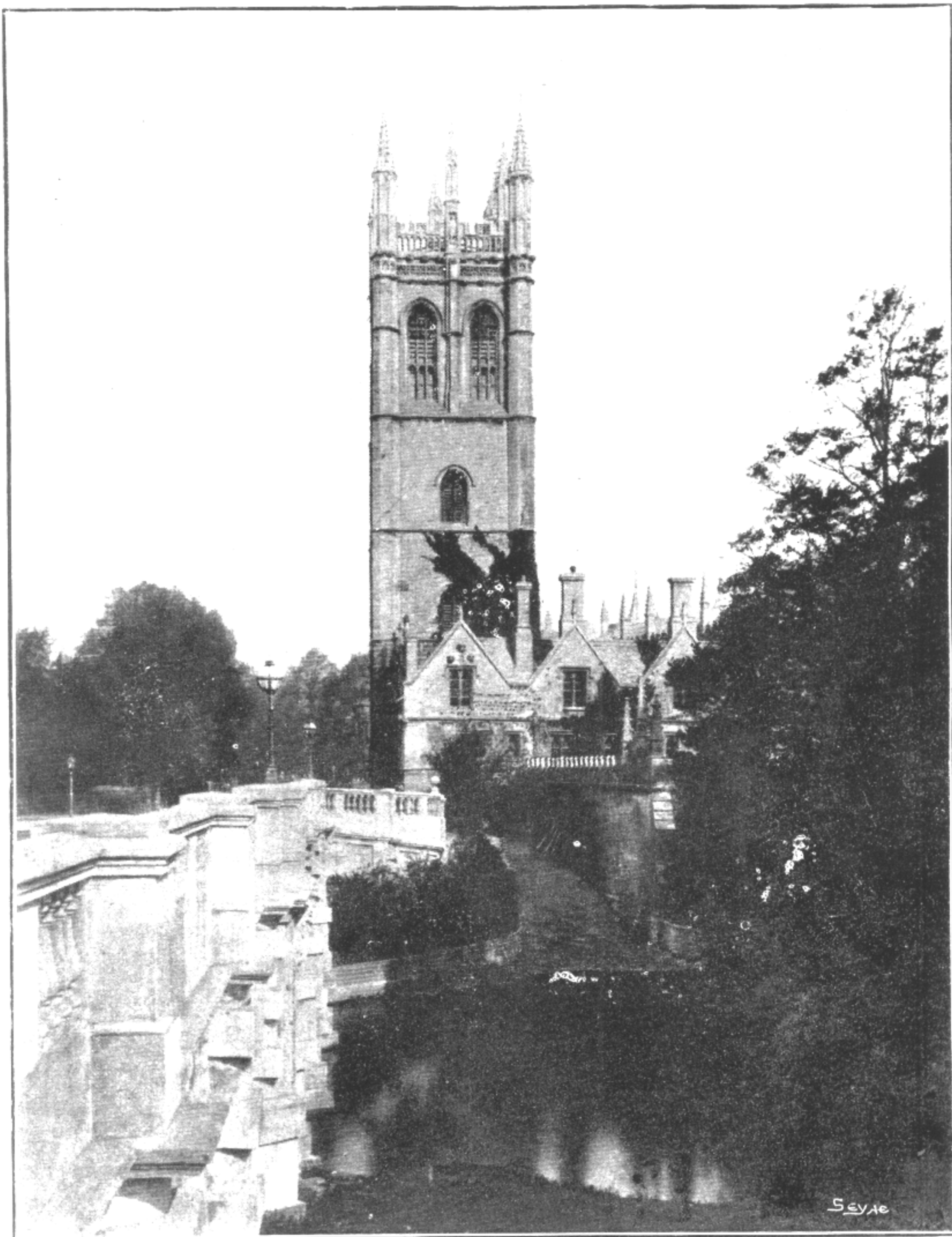
মডলীন কলেজ, অক্সফোর্ড।

হো'লে কি হয়? তা'তেই হল গুরুঠাকুরের লোভ,
না পারেন বাগাতে যদি, মনে থাকবে মহাক্ষোভ।

৫

নানা বাজে কথা তুলে, শেষে বল্লেন তা'রে ডা'কি
"হরু, তোমার ভক্তির কথা বলব আমি কি—
"বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ তুমি,
"তোমার জন্মে পবিত্র এ নদীয়া ভূমি।

৬

একটুখানি কেশে,ও অতি নম্র হাসি হেসে
বল্লেন হরু,—"যা বল্লেন,—তা, সেটা বেশী কি আর এ।"
"বৎস হরু, ভক্ত আমার, বিনয়ী তুমি বটে
"আচ্ছা, বলত হরু, জুতা জোড়াটী কাহার পায় ওঠে?"

৭

বল্লেন হরু—"ঠাকুর মশায়, ও আমার পায়ের জুতা
হ্যাঁ,—অ্যাঁ, আপনি যদি ইচ্ছা করেন-তা-তা-তা—
"নিতে পারেন, বলব আমি দাদা জিজ্ঞাসিলে
"নিয়ে গেছে জুতা আমার কুকুরে কি শেয়ালে।"

৮

গুরু সেবার পরাকাষ্ঠা হ'ল জুতা দান;
(গুরু) কুকুর শেয়াল খেতাব পেয়েও জুতা ল'য়ে যান।
গুরু ভক্তি শিখে নাও, যেয়ো না'ক ভুলে
তাঁতি বুদ্ধি আশী বৎসরে প্রকাশ "মুকুলে।"

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

তারামণি।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে তোমাদিগকে এক 'তারার' কথা বলিয়াছিলাম, আজ আর এক তারার কথা বলিব। সে তারা আর এই জেঠতুত ভাইবোন। সে ছোট ভাই এ দিদি। ১৮৯৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ইহার জন্ম। বাল্যকালে একবার বড় অসুস্থ হইয়াছিল। দেওঘরে যাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়া এমনি হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া উঠে, যে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাকে 'পুতলী বাই' বলিয়া ডাকিতেন। সেই হইতে সুস্থ শরীরে দিন দিন বড় হইয়া লোরেটো কন্‌ভেন্টে পড়িত। সেখানে পাঠের উন্নতি সহ চিত্রাঙ্কন, নানাবিধ সৌখীন শিল্পকার্য্য, গীত বাদ্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে। তাহার ন্যায় সুকণ্ঠ গায়িকা অতি অল্পই দেখা যায়। "কত শত আছে দীন অভাগা আলয় হীন" এমন সুললিত তানলয় সহ গাইত যে শ্রোতার চক্ষে ভক্তির স্রোত ধারা বহিয়া যাইত। সমস্ত দিনের শ্রম ক্লান্তি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য সন্ধ্যার আলোকে পরিজন সকলে একত্র হইয়া তাহার সুন্দর মুখের মধুর গান শুনিয়া জীবন মন জুড়াইতেন। সে কখনো "আর পারিনা" বলে নাই। যিনি যখন যাহা ফরমাশ করিয়াছেন তখনি তাহাই হাসিমুখে গাহিয়াছে। পারিবারিক ভালবাসা তাহাদের বংশের ধর্ম্মবিশেষ; তাহা শিক্ষার জন্য কাব্য ইতিহাস বেদ বেদান্ত পাঠ করিতে হয় নাই, তাহা ভগবান দত্ত অসীম দান। সে দান তাহাদের বংশের অস্থি মজ্জা স্বরূপ।

তারামণির এই ঊনবিংশ বৎসরের দৈনিক জীবনের ইতিবৃত্তি যদি একে একে বলিতে পারিতাম তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিতে এই ক্ষুদ্র তারকার কি পবিত্র জ্যোতি ছিল। গৃহাকাশে দীপ্তি পাইয়াছিল, আবার সেই গৃহই অন্ধকার করিয়া পিতামাতা ভাইভগিনী স্বজন বান্ধব ও পুরাতন দাস দাসীর জীবনের সমগ্র সুখ শান্তি অপহরণ করিয়া অকালে অস্ত গিয়াছে, এক্ষনে তাহার অবিনশ্বর স্মৃতি ইহলোকের নিত্য সম্বল।

তারামণি লোরেটো কন্‌ভেন্টে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়িয়া পরিনীতা হয়। বিবাহের দুইমাস পরে দারুণ রোগগ্রস্ত হইয়া এক বৎসরের অধিক কাল শয্যাগত থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। সুদক্ষ সব চিকিৎসক, তাহার পিতা স্বয়ং সুবিজ্ঞ ডাক্তার, কেহই তাহার কষ্টের তিলমাত্র লাঘব করিতে পারেন নাই। কত দীর্ঘ দিন মশুরী পাহাড়ে সকল ছাড়িয়া কেবলমাত্র

মাতাসহ জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ছিল। সে এক কঠিন পরীক্ষা,—দীর্ঘ সাত আট মাস কাল দিনের পর দিন ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে অত্যন্ত দৈহিক কষ্ট, রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া মাকে সান্ত্বনা দিত ও উপাসনায় সময় অতিবাহিত করিত। তাহার রোগের সঙ্গে এই মহাসমর নিত্যই দেখিয়া একজন ইংরাজ ডাক্তার, Major Milne বলিয়াছিলেন, এমন বীরবালিকা, এমন ঈশ্বর-বিশ্বাস কখনও দেখি নাই। তারামণির মৃত্যুভয় ছিল না; প্রত্যহ উপাসনার সময় বলিত—'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'। মা যদি বলিতেন আরোগ্য কামনা কর, হাসিয়া বলিত, "সেত স্বার্থপর প্রার্থনা, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, তুমি আমি কে? মৃত্যুকে ভয় করিনা, আমিত মরিবনা, ১৯ বৎসর এখানে ছিলাম, এবারে লোকান্তরে যাইব—এই বইত নয়।"

তাহার স্বদেশ ভক্তি, মানসিক দৃঢ়তা, সরল বালিকা ভাব বড় হৃদয়গ্রাহী ছিল। লোরেটো অধ্যয়ন জনিত বিলাতি ধরণ ধারণ তাহাকে একেবারেই স্পর্শ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালার মাটীতে গড়া সে বঙ্গ প্রতিমা, তেমনি স্নেহময়ী, বিশ্বাস-দৃঢ়, ভক্তি নম্র কোমল-প্রাণা বাঙ্গালীর মেয়ে। ১৬ই অক্টোবর রাখীবন্ধনের দিন সে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া চাকর দাসীর হাতে পর্য্যন্ত রাখী বাঁধিয়া দিত। চাকর দাসীর উপর তাহার বড় দয়া ছিল, রোগে শরীর যখন অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, কোনরূপ অলঙ্কার ধারণে কষ্ট বোধ হইত বলিয়া সবই খুলিয়া ফেলিয়া ছিল। এই সময় তাহাদের বাড়ীর বহুপুরাতন ভৃত্য মেথর দুখানি রাঙা চুড়ি আনিয়া দেয়। তারা আদর করিয়া তাহা হাতে পরিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাহা হাত হইতে খোলে নাই। মা যদি বলিতেন "তোমার হাতে ব্যথা লাগে খুলিয়া ফেল," সে বলিত "না মা থাকুক জমাদার হয়ত মনে করিবে ও নীচজাত বলিয়া পরিলাম না, ওর মনে কষ্ট হইবে, আমি পরিয়াই থাকি।"

ইংরাজী শিক্ষার যে টুকু সার ও প্রীতিকর তাহাই সে গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙ্গলা ইংরাজী ভাল জানিত; ফরাসী ও কতক দুর শিখিয়া ছিল। মাতৃভাষার গ্রন্থাবলী, রামায়ণ মহাভারত তাহার নিকট বড় আদরের ছিল। মহাভারতের উপাখ্যান সব সে পড়িয়া এমনি আয়ত্ব করিয়াছিল, অনেক বৃদ্ধ তাহার কাছে হারিয়া যাইতেন। গৃহকার্য্যে দিব্য নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিল, প্রায় সব অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে পারিত। দান করিতে বড় ভাল বাসিত; সৌখীন বিলাসিতার অভ্যাস ছিলনা, সকল বিষয়েই বড় সুন্দর সংযম ও নির্লোভ ভাব ছিল। বিবাহের বস্ত্রালঙ্কার যাহা পাইয়াছিল, তাহার অনেক জিনিস ভাগ করিয়া ছোট বোন ও ভাই দুটিকে দিয়া ছিল। কেহ বলিলে, বলিত আমার অত হইল অথচ এদের কিছু থাকিবে না সে কেমন করিয়া হয়? আমার ভাবিতে কষ্ট বোধ হয়। ওদেরও দিই আমারও কিছু থাকুক। তাহার বাহ্য ব্যবহার যেমন সুন্দর ছিল মনের উদার মহৎভাব আরও মনোহর ছিল। তাহার নিঃস্বার্থ ভাব, ঈশ্বর প্রীতি, স্বজন বাৎসল্য, সেবানিষ্ঠা ছোট বড় সকলেরি অনুকরণ যোগ্য। স্বর্গের তারা বলিয়াই পৃথিবীতে অধিক দিন থাকিল না; তাহার শোকসন্তপ্ত পিতামাতা আত্মীয় বন্ধুর মনে দয়াময় শান্তি বিধান করুণ।

গৃহশিক্ষা।

(৬)

মালতী স্কুল হইতে আসিয়া আহার সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার খেলনা ও টেবিল ইত্যাদি শৃঙ্খলা করিয়া রাখিতে লাগিল। তাহার শয্যার পার্শ্বে আর একজনের শয্যা করিয়া রাখিল; তাহার মুখে হাসি আর ধরে না। সে সেদিন বিকালে আর বাগানে খেলা করিতে গেল না, তাহার প্রিয় জিনিষগুলিকে পরিস্কৃত করিয়া একটী ছোট আলমারীতে সজ্জিত করিয়া রাখিল। কাল স্কুলের ছুটীর পর তাহার বন্ধু কমলা তাহাদের বাড়ীতে আসিবে ও দুই তিন দিন তাহার সঙ্গে থাকিবে, সেজন্য এত আনন্দ ও এত পরিশ্রম করিতেছিল। রাত্রিতে

শুইতে যাইবার সময় এই কথা স্মরণ করিয়া শুইল যে কাল তাহার সমপাঠী আসিবে। পরদিন অতি প্রত্যুষে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে তাহার পড়িবার ঘরে যখন যাইতেছে তখন মাতা গম্ভীর স্বরে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "বিনয়ের খুব জ্বর হয়েছে ও সমস্ত শরীরে ব্যথা হয়েছে, তার জন্য খুব ভাবছি; তুমি তার জন্য বার্লি তৈয়ারী করে আনত!"

মালতীর মুখখানিও গম্ভীর হইয়া গেল, সে মাতার আজ্ঞা পালন করিল। সকালে স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল "মা, দাদা কেমন আছে?"

মাতা বলিলেন "তার খুব জ্বর হয়েছে। ডাক্তার এসেছিলেন, তিনি বল্‌লেন কিছু ভয়ের কারণ নেই।"

মালতী বলিল "না, মা, তুমি কোন ভয় কোরোনা, দেখো এই ক'দিনের মধ্যেই দাদা ভাল হয়ে যাবে।"

মাতা বলিলেন "আমি সব বুঝি কিন্তু শুধু যে ওর অসুখ হয়েছে বলে দুঃখ হচ্ছে তা' নয়, তোমাকেও যে নিরাশ কর্‌ব সেজন্য খুব কষ্ট হচ্ছে।"

মালতী বলিল "আমায় নিরাশ করবে কি করে? দাদার জ্বর হয়েছে সেজন্য?"

মাতা বলিলেন "ডাক্তার বলেছেন যে ওর হাম কি জলবসন্ত কিছু বেরোতে পারে; আর তুমি জান যে ওসব রোগ সংক্রামক, কাজেই আমার ইচ্ছা যে যতদিন না বিনয় সেরে উঠে ততদিন তোমার বন্ধু এ বাড়ীতে না আসে।"

ইহা শুনিয়া মালতীর মুখ বিমর্ষ হইয়া গেল ও চক্ষু দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইল। তখন মাতা সস্নেহে তাহার মস্তকে তাঁহার হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন "আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি যে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে; কিন্তু কি করবে বল, দাদা ভাল হলেই তাকে নিয়ে আস্‌বে কেমন?"

মালতী কিছুক্ষণ ক্রন্দন করিবার পর, চক্ষু মুছিয়া বলিল "কতদিনে দাদা ভাল হবে?"

মাতা বলিলেন "আমি কি করে বল্‌ব, যদি হাম কি বসন্ত বের হয় তবে কয়েক সপ্তাহ লাগ্‌বে।"

মালতী বলিল "মা, কমলা আর আমি দাদার কাছে যাবনা, তা' হলে কি হবে? কাল আমার সব জিনিস পত্র তাকে দেখাব বলে সব সাজিয়েছি, আর আমার পাশে তার বিছানা করে রেখেছি। এত আশা করেছিলাম আমি এ কষ্ট কি করে সহ্য করব?"

মাতা বলিলেন "যদিও তোমার মনে হচ্ছে এ কষ্ট সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না কিন্তু চেষ্টা কর, দেখো পার্‌বে। আচ্ছা, এস তোমার দাদা এখন ঘুমাচ্ছে, আর আমি যখন এ ঘর থেকে তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তবে একটী গল্প বলি শোন। একটী স্কুলে একজন গরীব বুদ্ধিমান পরিশ্রমী ছেলে পড়্‌ত। তার এমন বুদ্ধি, লেখাপড়ায় এমন অনুরাগ দেখে শিক্ষক তাকে বল্‌লেন 'যদি তুমি বরাবর এমন সুন্দর পড়া করে আন আর পরীক্ষায় ও যদি ভাল কর তবে তোমার পড়ার খরচ আমরা দেব।' এ কথা শুনে তার খুব আনন্দ হ'ল; সে ভাবল তার বাবার কষ্ট একটু কমাতে পার্‌বে। তার বাবা খুব গরীব, অতি কষ্টে ছেলেদের লেখাপড়ার খরচ দিতেন।"

মালতী বলিল "ঠিক্ আমাদের বাবার মতন, না? আচ্ছা গল্পটা বলে যাও।"

"পরীক্ষার সময় কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল। সে বৃত্তি পাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। মাকে সব কথা বলেছিল, কিন্তু বাবাকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আনন্দ দিবার উদ্দেশ্যে তাঁকে ও বিষয় কিছু বলে নাই। আর দুই দিন পরেই পরীক্ষা, সে মনে অনেক আশা ও উৎসাহের সঙ্গে পড়া করে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার পরদিনই খুব জ্বর হ'ল, আর পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না। সব আশা কোন্ অন্ধকারে মিশে গেল।"

মালতী বলিল "আহা! তার কি দুঃখই না হ'ল, তারপরে সে কি করল?"

মাতা বলিলেন "আমি জানি না কি হ'ল, আমি ত তাকে সে কথা এখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। বেচারার কি কষ্ট! তার বন্ধুদের তাকে এই কষ্ট সহ্য কর্‌তে সাহায্য করা উচিত।"

মালতী বলিল "মা, তবে তুমি সেই ছেলেটীকে জান? সে কে?"

মাতা বলিলেন "সে ওই ঘরে খাটে শুয়ে আছে, সে হ'ল তোমার দাদা।"

মালতী কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিয়া উঠিল "তবে এটা সত্য গল্প? আর দাদার এমন কষ্ট? মাষ্টার মহাশয় বুঝি দাদার বিষয় তোমাকে বলেছেন? আহা, তবে তার কি কষ্টই হ'বে, যদি আজ জ্বর ছেড়ে যায় তবে কাল স্কুলে যেতে পার্‌বে?"

মাতা বলিলেন "না জ্বর ছা'ড়লেও কাল গিয়ে পরীক্ষা দিতে ত পার্‌বে না, তার এমন মাথা ধরেছে, এ নিয়ে যদি আবার পড়ে, তবে শরীর একেবারে ভেঙ্গে যাবে, আর বৃত্তিত এবারে পাবেই না। সে কত আশা করেছিল যে তার বাবাকে সুসংবাদ দিয়ে কত সুখী করবে তাও পার্‌বেনা। তোমার বন্ধুকে আজ এখানে না আন্‌তে পেরে তোমার যেমন কষ্ট হয়েছে তার সে রকম হবে।"

মালতী বলিল "আমাদের দুজনকেই কষ্ট সহ্য কর্‌তে হবে। দাদার জন্য এত কষ্ট হচ্ছে, তার মনে যেমন বল আছে সে এ দুঃখ সহ্য কর্‌তে পারবে, আমিও তাই কর্‌ব। আমাদের দুজনেরই যখন প্রায় একই অবস্থা তখন দুঃখ সহ্য করা সহজ হবে।"

মাতা বলিলেন "তুমি যা বল্‌লে তা বিনয়কে বলব, কিন্তু এখন আর ওসব কথা বলে তাকে দুঃখের কথা মনে করিয়ে দেবোনা। যখন সে নিজে এ বিষয়ে বল্‌বে তখন আমি বলব; এখনত প্রায় সব সময়ই সে জ্বরে বেহুঁস হয়ে শুয়ে থাকে। আমি কমলার মাকে একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। আর তুমি কমলাকে বোলো যে বিনয় ভাল হলেই সে আস্‌বে। দেখ কাহার কেমন স্বভাব তা জান্‌বার জন্যই ভগবান দুঃখ কষ্ট পাঠান। যদি সব সময়েই আমরা সুখ পাই তবে, যে ছোট ছেলের সব ইচ্ছাই পুর্ণ হয় সে যেমন আবদারে মনুষ্যত্ব-বিহীন হয়, আমরা ও যে সেই রকম হব; ঈশ্বরের নিয়ম কি সুন্দর!"

মালতী বলিল "আমাদের স্কুলে দুটী মেয়ে আছে, তারা প্রায় সব সময়ই মিষ্টি খাচ্ছে, তারা খেলবার সময় একটু লাগলেই কাঁদে; আর যেই মিষ্টি ফুরিয়ে যায় আবার খাবার জন্য কাঁদে, তখন তাদের মা আবার পয়সা দেন তবে থামে।"

মাতা বলিলেন "আমরা যা চাই ঈশ্বরত তা দেন না; তিনি যাহা আমাদের পক্ষে ভাল মনে করেন তাহাই দেন। আর যদি দুঃখ কষ্ট আমরা সহ্য কর্‌তে পারি তবে দুঃখই সুখের সোপান হয়।"

"আজ অনেক কথা হয়েছে, আমি এখন তোমার দাদার কাছে যাই। তুমি এখন স্কুলে যাও।"

মালতী বলিল "আমি কি সব কথা কমলাকে বল্‌তে পারি?"

মাতা বলিলেন "হাঁ, বল্‌তে পার।"

মালতী স্কুলের ছুটীর সময় কমলাকে সব বলিল কমলা যখন ঐ ছেলেটীর নিরাশার গল্প শুনিল তখন মালতী বলিল "জান, ও ছেলেটী কে? আমার দাদা।" তখন দুই বন্ধুতে বলাবলি করিতে লাগিল যে তাহাদের ত তবু কম কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, কিছুদিন অপেক্ষা করিলেইত চলিবে, কিন্তু বিনয়ের বৃত্তি পাওয়া আর হইবেনা।

মালতী বিকালে ফিরিয়া আসিয়া শুনিল বিনয় জ্বরে প্রায় সব সময়ই বেহুঁস হইয়া আছে, সে কোন কথাই প্রায় বলেনা। তাহার দাদার জন্য খুব দুঃখ করিতে লাগিল। দাদার কিছু সেবা করিয়া সে নিদ্রা গেল।

শ্রীবাসন্তী মিত্র।

খোকার অভিমান।

এতক্ষণ কেঁদে কেঁদে ঘুমায়ে পড়েছে বাছা
আদরের খোকাটী আমার।
আহা মরি! অভিমানে স্বপনে উঠিছে কেঁপে
এখনো সে ঠোঁট দুটী তার।
সারাটা দুপুর ধরে, করেছিল দুষ্টপনা,
বই ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে কালী,
হাতে মুখে কালী মেখে সেজেছিল বহুরূপী
আমি তাই দিয়াছিনু গালি;

মেরেছিনু রাগ ভরে একটী চাপড় আহা !
বাছার সে কোমল পিঠেতে ;
খোকা মোর ফুলে ফুলে উঠেছিল কেঁদে, তারে
কিছুতেই পারিনি ভুলাতে।
হাতে দিনু চুষি কাটি, ঝুমঝুমী খেলা ফুল,
খোকা সব দিল ছুঁড়ে ফেলে।
সোহাগে সে চাঁদমুখে চুমো খেনু শতবার,
বুকে তারে নিনু আমি তুলে;
দুধ দিনু মুখে তার মুছে দিনু আঁখি জল,
তবু নাহি গেল অভিমান।
বুকেতে মাথাটী রেখে কেঁদে কেঁদে শেষে যাদু
নিদ্রাবেশে মুদিল নয়ান।
ঝাঁ ঝাঁ করে দ্বিপ্রহর নিরবিলি পথ মাঠ ;
নিঝুম সে ছোট গ্রাম খানি ’
মাঝে মাঝে আসে শুধু উতলা বাতাসে ভেসে
ঘুঘুর সে অশ্রান্ত রাগিণী।
মেজেতে আঁচল খানি বিছায়ে রয়েছি শুয়ে,
বুকে খোকা ঘুমে অচেতন ;
কোন কাজ হাতে নাই চোখে মোর নাহি ঘুম
কোন কাজে নাহি বসে মন।
আজি সারা বক্ষ জুড়ি কি যেন বেদনা বাজে ঃ
কে যেন গো কাঁদিছে সেথায় !
কি স্নেহ পীযুষ ধারা লুকায়ে রেখেছে বিধি
জননীর কোমল হিয়ায় !
কি সুধা দিয়েছে ঢেলে, শিশুর কোমল মুখে,
মরি একি স্নেহের বাঁধন !
হেরিলে সে চাঁদ মুখ, ভুলে যাই স্বর্গমর্ত্ত,
ভুলে যাই জীবন মরণ।

শ্রীনীহারবালা দেবী।

ঠগী-ইতিহাস।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঠগী নামক এক সাম্প্রদায়িক দস্যুর উৎপীড়নে ভারতবর্ষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, একথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। সে সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা রাজত্ব করিতেছিল। তখন ভারতবর্ষে বৃটিশ শক্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্টিত হয় নাই। ইংরাজেরা কেবল দেশের পর দেশ জয় করিয়া আপনাদের শক্তি পুঞ্জীভূত করিতেছিলেন।

এই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুরা লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া প্রত্যহ যে কত নিরীহ পথিকের প্রাণ সংহার করিয়া আপনাদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিত, তাহার সংখ্যা নাই। তখন পর্য্যন্ত তাহাদের প্রতি কাহারও বড় একটা দৃষ্টি পড়ে নাই। কিন্তু ক্রমশঃ যখন তাহাদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন আর কেহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। ইংরাজ রাজ পুরুষগণ ঠগী দলনের জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তখন ভারতবর্ষের রাজ প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ঠগীবৃত্তি নিবারণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

অবশেষে অনেকদিনের অবিচ্ছিন্ন উদ্যম ও চেষ্টায় এই ঠগীর উপদ্রব নিবারণ হইল। যে সমস্ত ঠগী ধরা পড়ে, রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদিগের প্রথমে ধরিয়া ফাঁসি দেন নাই। কাহারও কাহারও জীবন রক্ষার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাদের সহচরগণকে ধরাইয়া দিতে বলিলেন। জীবনের অপেক্ষা প্রিয়বস্তু কিছুই নাই। সুতরাং অনেকেই সরকারী পক্ষ অবলম্বন করিল। ইহাতে বেশ সুফল ফলিল। তাহারা ইংরাজদিগকে এত সুপ্রসিদ্ধ ও অপরিচিত দস্যুর নাম ধাম ও সন্ধান বলিয়া দিতে লাগিল, যে তৎশ্রবণে সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। যেখানে ঠগী ছিল বলিয়া কেহ কোনকালে সন্দেহ করে নাই, এমন সকল স্থান হইতেও অনেক ঠগী ধরা পড়িল। এইরূপে ইংরাজেরা সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে ঠগী উপদ্রব দুর করিয়াছিলেন।

অনেক লোক লইয়া এক একটি ঠগী সম্প্রদায় গঠিত হইত। এই ঠগীদের দলে তিন শ্রেণীর লোক থাকিত। প্রথম ফাঁসিদার, দ্বিতীয় ভিলওয়ান্দে অর্থাৎ কবরখননকারী, তৃতীয় বুণিজওয়ালে অর্থাৎ শিকার-সন্ধানকারী।

ঠগীরা এক প্রকার ভাষায় কথা কহিত, তাহার নাম রামাসি ভাষা। নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তার সময় তাহারা উক্ত ভাষা ব্যবহার করিত, যাহাতে অন্যে তাহাদের গুপ্ত মন্ত্রণা জানিতে না পারে। "ফাঁসিদার," "ভিলওয়ান্দে" ও "বুণিজওয়ালে" এই সকলই রামাসি ভাষা।

প্রথমোক্ত দল পথিকের গলায় ফাঁস লাগাইয়া মারিত। তাহাদের রুমালের এক কোণে একটা বিষাক্ত রৌপ্য মুদ্রা বাঁধা থাকিত। কোন পথিকের সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছে এমন সময় রুমাল ঘুরাইতে ঘুরাইতে হঠাৎ সেই পথিকের গলায় ফাঁস লাগাইয়া দিত। তৎক্ষণাৎ রুমালের সঙ্গে যে বিষাক্ত রৌপ্য-মুদ্রা বাঁধা থাকিত, তাহা পথিকের গলায় লাগিয়া সমস্ত শরীরে বিষ সঞ্চালিত হইত, এবং নিমেষের মধ্যেই তীব্র বিষের প্রভাবে পথিক প্রাণ হারাইত। সাধারণতঃ বলশালী লোকদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত।

দ্বিতীয়োক্ত দল সেই নিহত পথিকের জন্য পূর্ব্বেই কবর খনন করিয়া রাখিত এবং মৃত্যু হইবামাত্র কবর দিত। তাহারা এরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ও গোপনে সেই সকল কার্য্য করিত যে কোন পথিকের দল সেখান দিয়া গেলে তাহাদিগকে ঠগী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিত না। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন পথিক ঠগীদের আড্ডার নিকটবর্ত্তী স্থান দিয়া গমনকালে তাহাগিকে ঠগী বলিয়া সন্দেহ করিত এবং ঠগীরা যদি ইহা জানিতে পারিত, তবে আর সেই পথিকের নিস্তার থাকিত না। পাছে তাহাদের সন্ধান বলিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় ঠগীরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিত।

তৃতীয়োক্ত দল নানারূপ সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শিকারের সন্ধান করিতে বাহির হইত। যাহাদের আকৃতি সুশ্রী ও গলার স্বর সুমিষ্ট সাধারণতঃ তাহাদিগকেই এই দলে ভর্ত্তি করা হইত। কারণ অনেক সময়েই অনেকে তাহাদের গলার সুমিষ্ট স্বরে অভিভূত হইয়া পড়িত, এবং তাহাদের সহিত মিশিতে ইচ্ছা করিত। হয়ত কোন সুবৃহৎ পথিকের দল একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেছে, তখন এই সুমিষ্টভাষী লোকদিগকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করা হইত।

তাহারা প্রথমে পথিকেরা কোথায় যাইতেছে, কোথা হইতে আসিয়াছে, ইত্যাদি বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া বলিত "আমরাও অমুক স্থানে গমন করিব, তবে চলুন আমরাও আপনাদের সহিত একত্র হইয়া গমন করি।" তখন পথিকেরা তাহাদের এই প্রকার সুমিষ্ট আলাপে একেবারে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সহিত গমন করিত।

ঠগীরা নিজেদের সুবিধামত সেই পথিক দলের প্রত্যেকের পশ্চাতে এক জন কিম্বা প্রয়োজনানুসারে কখনও কখনও দুই জন করিয়া ঠগী নিযুক্ত করিত। যখন সমুদায় বন্দোবস্ত সম্পূর্ণরূপে স্থির হইত, তখন ঠগী দলপতি একটা সঙ্কেত করিত। অমনি ঠগীরা একত্রে উক্ত দলস্থ প্রত্যেক পথিকের গলায় ফাঁস লাগাইয়া দিত এবং নিমেষের মধ্যে প্রাণ সংহার করিয়া মৃত ব্যক্তির পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইত। তৎপরে কবরখননকারীরা মৃতদেহগুলি তাহাদের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কবরেব স্থান সমূহে লইয়া গিয়া পুতিয়া ফেলিত।

ঠগীদের বিশ্বাস ছিল, যে স্বয়ং কালী তাহাদের সহায়তা করেন। প্রতি বৎসর বিজয়া দশমীর দিন সমস্ত ঠগী একত্রিত হইয়া উৎসব এবং আমোদ প্রমোদ করিত। ঠগীদের সেই দিন একটা সভা হইত এবং সেই সভায় কে কোথায় গিয়াছে, কতগুলি নরহত্যা করিয়াছে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিত।

পরদিন তাহারা নূতন বৎসরের ঠগীবৃত্তি করিতে যাত্রা করিত। যাত্রার সময় যদি ভবানীর শুভ ইঙ্গিত সমূহ দেখা যাইত, তবে তাহারা বুঝিত, যে এবার তাহাদের ব্যবসায় অনেক লাভ হইবে। যাত্রাকালে তাহারা কতক্ষণ ভবানীর স্তোত্র করিত, পরে যদি গর্দ্দভ অথবা পক্ষীর ডাক শ্রবণ করিত, তবে তাহারা মনে করিত যে ভবানীর ইঙ্গিত শুভ হইয়াছে। যাত্রার সময় ঠগী দলপতি দাঁত দিয়া একটা জলপূর্ণ ঘটি কামড়াইয়া ধরিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিত। যদি হঠাৎ তাহার দাঁত হইতে ঘটিটা পড়িয়া যাইত, তবে তাহারা সমূহ বিপদের আশঙ্কা করিত।

ঠগীদের মধ্যে আরও কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। ভ্রমণকালে সম্মুখে শশক চলিয়া যাইতে দেখিলে মনে করিত, যে তাহাদের কোন না কোন বিপদ উপস্থিত হইবেই।

যাহারা ঠগীব্রতে দীক্ষিত হইত, তাহাদিগকে প্রথমে রামাসি ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। উক্ত ব্রতে দীক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদিগের হস্তে প্রথমে একখানা রুমাল দেওয়া হইত, সেই রুমালের উপর কুঠার স্থাপন করিয়া তাহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে সে সারাজীবন ধরিয়া ঠগীবৃত্তি করিবে এবং উক্ত ব্যবসাকেই সে একমাত্র তাহার জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে এবং বিশ্বস্ততা হইতে কখনও বিচ্যুত হইবে না ইত্যাদি। ঠগী দলপতি তাহাকে সাবধান করিয়া দিত, যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহাকে পরকালে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

ঠগীদের বিশ্বাস ছিল, যে তাহারা জীবনে এই কার্য্য করিলে পরকালে স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়া অতুলনীয় সুখ সম্ভোগ করিবে। তাহারা ঠগী ব্যতীত জগতের সমগ্র লোককে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিত। এইরূপ প্রবাদ আছে, যে, কালীর আদেশে ঠগীরা ভাট, ধোপা, নাপিত, নর্ত্তক, বাদক ও বিকলাঙ্গ, এই শ্রেণীর লোকদিগকে হত্যা করিত না।

যাহা হউক, যখন অনেক ঠগী ধরা পড়ে তখন এই কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল, যে অনেক জমিদার ও রাজা ঠগীদিগকে সাহায্য করিত। ঠগীদের নিকট হইতে অপরিমিত কর আদায় করিয়া তাহাদিগকে নিজের রাজ্যে বাস করিতে দিত ও তাহাদের সঞ্চিত অর্থাদির অংশ গ্রহণ করিত। জমিদার এবং রাজারা অর্থলোভেই ঠগীদের সহিত যোগদান করিত।

ঠগীরা কখনও সন্ন্যাসী বেশে কখনও বা সৈনিক বেশে, বা অপর কোনও বেশ করিয়া ধারণ বিচরণ করিত। কালক্রমে ইংরেজদের চেষ্টায় ঠগী উপদ্রব তিরোহিত হইয়াছে; এখন আর ভারতবর্ষের কোন অংশেই ঠগীর উপদ্রবের কথা শোনা যায় না।

শ্রীখগেন্দ্রকুমার সরকার।

বন্য বালক।*

(সত্য ঘটনা)

অনেকদিনের কথা, হানোভারর এক রাখালের একটী গাভী হারইয়াছিল। বেচারা মাঠ ঘাট এদিক্ ওদিক্ নানা যায়গা পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে' কোথাও তার সন্ধান না পেয়ে শেষে এক বনে গিয়ে ঢুকল। বনের মাঝে দুচা'র পা যেতেই সে দেখতে পেল যে গাভীটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর দশ বারো বছরের উলঙ্গ বালক বাছুরের ন্যায় বাঁট চুষে তার দুধ খাচ্ছে। বালকটীর চুল এলো মেলো হয়ে কাঁধের উপর পড়েছে, গায়ে লোম, বাঘের মত লম্বা লম্বা ধারালো নখ, এই জনমানুষ শূন্য গভীর অরণ্যে এই বালকটীকে দেখে সে শিউরে উঠল। ছেলেটাও চম্‌কে উঠে' তার দিকে খানিক চেয়ে রইল।

রাখাল ছেলেটিকে দুএকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তার উত্তরে সে গলা ছেড়ে একটা কর্কশ আওয়াজ তুলে' বানরের ন্যায় লাফিয়ে একটী গাছে উঠ্‌লো। এসব কাণ্ড কারখানা দেখে লোকটী তো ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি গাইটা তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ী চল্‌লো। গ্রামে এসে পাড়াপড়শীদের ডেকে বনের কথা সব তাদের কাছে খুলে বল্‌লে। দেখতে দেখ্‌তে এ খবর সহরের মেজিষ্ট্রেটের কানে পর্য্যন্ত উঠল। তিনি ছেলেটীকে ধরবার জন্যে অনেক লোক পাঠালেন। তারা বনে গিয়ে সত্যই সেরূপ একটা বালক দেখ্‌লে। যেই দেখা অম্‌নি বন্য বালক তাদের উঠার অসাধ্য প্রকাণ্ড এক গাছের আকাশ-ঠেকা সুদূর আগায় লাফিয়ে উঠে বসে' দাঁত খিঁচিয়ে, মুখ ভেঙ্গিয়ে ও গাছের ডাল ছুড়ে তাদেয় ভয় দেখাতে লাগলো। এদিকে বালককে নামিয়ে আন্‌বার কত মতলব আঁটা হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই আর তাকে ভুলানো যায় না। তারপর একজন কতক-গুলো বাদাম গাছের তলায় ছড়িয়ে দিলে, বালক সোৎসুক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাতে লাগল। সকলে একটু আড়াল হ'তেই সে গাছথেকে নেমে মনের

* ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

আনন্দে সেগুলো খেতে আরম্ভ করে দিল। অমনি সকলে ছুটে এসে তাকে ধরে সহরে নিয়ে গেল। ছেলে বুড়ো হাজার হাজার লোক এ আজগুবি তামাসা দেখ্‌তে দিন দিন এসে জড় হতে লাগ্‌লো। বালকের সম্বন্ধে নানালোকে নানা কথা রটনা কর্‌লে। জানা গেল, পিতা মাতার মৃত্যুর পর অনেকদিন ধরে একটি শিশুর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই; অনেকে সেই হারানো শিশু বলে এ-কেই দাবি কর্‌লে।

বালকটি নিযুক্ত রক্ষকের হস্তে খুব যত্নের সহিত খাওয়া পরা পেয়ে বড় হ'তে লাগলো। পোষ মেনে ও তার প্রকৃতির সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটেছিল। সে পোষাক পরত, সব ভাল জিনিষ খেত; কিন্তু চীনে বাদাম ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। সে জীবনে কখনো কথা বল্‌তে পারে নাই, তবে নিজের নামটি মাত্র উচ্চারণ কর্‌তে শিখেছিল। গানবাদ্য শুনে সে আনন্দে লাফালাফি করত।

কিছুদিন পর বালকটীকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সেখানেই তার জীবনের বাকী ক'দিন কেটে যায়।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

ধাঁধার উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল,

১। চশমা

২। ঘড়ি

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীজ্যোতিভূষণ সেন, শ্রীপ্রীতীন্দ্র-কুমার হালদার, শ্রীবিপিনচন্দ্র দাস, শ্রীপ্রফুলকুমার ঘোষ, শ্রীমতী গিরিজাসুন্দরী রায়, শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী জাহ্নবী দেবী, শ্রীখলিলুর রহমান সরকার, শ্রীবিপুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীপ্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশিশিরকুমার দত্ত, শ্রীসরোজকুমার বসু, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুধা শর্ম্মা, শ্রীমতী পুষ্পমালা চন্দ্র, শ্রীজিতেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীদানেশউদ্দিন আহাম্মদ, শ্রীসোচ্চিন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত, কুমারী সুষমা রায়, শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, শ্রীসুধাকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীললিতকুমার দে, শ্রীমতী অনুশীলা দাস, শ্রীহিমাংশু কুমার বসু, শ্রীমতী মমতাময়ী দেবী, শ্রীমতী রেণুকা মল্লিক, শ্রীদেবীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ বসু, শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ, শ্রীহেমন্তকুমার বসু, শ্রীকমলেশ্বরীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী লীলা গুপ্ত ও শ্রীইন্দ্রভূষণ বৌদ্।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন।

শ্রীবঙ্কিমবিহারী বসু, শ্রীখগেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, Mrs. D. Islam. শ্রীমতী অরুণবালা বন্দোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র জানা, শ্রীপ্রকৃতি মোহন বন্দোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশি, শ্রীতুষাররঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, শ্রীহিমাদ্রিকুমার শর্ম্মা,

---

নূতন ধাঁধা।

১। ১ হইতে ৪০ টাকাকে এমন চারিটী কৌটাতে বিভক্ত কর যে কোন লোক ১ হইতে ৪০এর মধ্যে যে সংখ্যার টাকা চাহিবে উহা ঐ চারিটী কৌটার টাকার মধ্যে যোগ বা বিয়োগের দ্বারা ঐ সংখ্যক টাকা তাহাকে দেওয়া যাইবে।

২। মধু হতে মধুময় আমি এ সংসারে
পশু পাখী নারী নর আমার ভিতরে।
শির মোর দাও কাটি হইব নবনী,
পুচ্ছ ছাট—নররূপ ধরিব অমনি।
তিন অক্ষরে নাম মোর, কভু থাকি একা
আমি ছাড়া এ সংসারে নাহি যায় দেখা।
সকলেরই ছিল কিম্বা অনেকেরই আছে,
আমি কেবা কাণে কাণে কহ মোর কাছে।

লর্ড হার্ডিঞ্জ, বামে তাঁহার পত্নী ও পার্শ্বে দণ্ডায়মানা কন্যা।

মুকুল

১৮শ বর্ষ। | চৈত্র, ১৩১৯। | ১২শ সংখ্যা।

বর্ষ-বিদায়

পুরাতন যাহা কিছু
বিদায়ের লাগি,
করুণ হৃদয় তলে
উঠিতেছে জাগি।
আবেষ্টিয়া শত পাকে
ওগো যে হৃদয় ডোরে,
আমার পুরাণ স্মৃতি
বাঁধিয়া রেখেছি তোরে;
মুক্ত করি দিয়ে যাও
এই বিদায়ের দিনে;
ক্ষীণের শরণ ঠাঁই
আজি মুক্ত কর দীনে।
যুক্ত-করে পুণ্যময়
আসিয়াছি দ্বারে,
ক্রটী যাহা হয়ে গেছে,
সুপ্তি অন্ধকারে
বিলীন হইয়া যাক।
নব প্রভাতের সাথে
নবীন আশার গান
হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজি
ভরিয়া উঠুক প্রাণ।

স্থির চিত্ততা।

বিপদ এবং উত্তেজনার সময়ে মনের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারা মহৎ এবং উদার প্রকৃতির চিহ্ন। সাধারণতঃ আমরা সামান্য উত্তেজনাতে অধীর হইয়া পড়ি; ভয়ের কারণ আসিলে বুদ্ধি হারাই, বিপদে হা হুতাশ করি, কেহ অপকার করিলে অপকারীর প্রতি ক্রোধে উন্মত্ত হই। কিন্তু মহৎ লোকেরা সকল প্রকার উত্তেজনার মধ্যে স্থির ধীর থাকিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। সম্প্রতি আমাদের দেশের শাসনকর্ত্তা, লর্ড হার্ডিঞ্জ এই স্থিরচিত্ততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন আমাদের দেশে আগমন করিয়াছিলেন তখন আমরা আশা করিয়াছিলাম, যে তিনি একজন সহৃদয় এবং কর্ত্তব্য পরায়ণ শাসন কর্ত্তা হইবেন। আমাদের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে। বিগত দুই বৎসরে লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং সহৃদয়তার অনেক প্রমাণ দিয়া ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি দারুণ বিপদ এবং প্রবল উত্তেজনার মধ্যে তিনি যে স্থিরতা এবং ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কেবল লর্ড হার্ডিঞ্জ একাকী নহেন, তাঁহার পত্নী এবং পরিবারের সকলেই এই বিপদের সময়ে প্রশংসনীয় সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

তোমরা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছ, যে গত ২৩শে ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন হস্তীপৃষ্ঠে মহাসমারোহে নূতন রাজধানী দিল্লী প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন দুষ্ট লোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে বোমা লর্ড হার্ডিঞ্জের গায়ে না পড়িয়া তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া ফাটিয়া যায়। তিনি প্রাণে রক্ষা পাইলেও গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। বোমা নিক্ষিপ্ত লৌহখণ্ড সকল তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যে চোপদার তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়াছিল, সে হতভাগ্য ত সেই মুহূর্ত্তেই প্রাণ হারাইয়াছিল। কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও লর্ড হার্ডিঞ্জ স্থির ছিলেন। লেডী হার্ডিঞ্জ তাঁহার পাশেই ছিলেন; সৌভাগ্যক্রমে তিনি কোনও আঘাত পান নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে যখন সমুদয় ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, তখন লেডী হার্ডিঞ্জ জিজ্ঞাসা করিলেন "কোনও আঘাত লাগে নাই ত?" যদিও দারুণ আঘাত পাইয়া ছিলেন, তথাপি লর্ড হার্ডিঞ্জ "আঘাত বেশী নয়" এই কথা বলিয়া সকলকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু আঘাতের বেদনায় পরমুহূর্ত্তে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অতি সাবধানে তাঁহাকে হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে লওয়া যাওয়া হইল এবং এই দুই মাস চিকিৎসার পর এখন তিনি সুস্থ হইয়াছেন।

এই ঘোর বিপদের মধ্যে লর্ড হার্ডিঞ্জ যে স্থিরচিত্ততা এবং মহদ্ভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হয়। শুনা যায়, সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রথমেই তিনি যে চোপদার তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিয়া ছিল, তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরিবারের সাহায্যের জন্য অর্থ প্রেরণ করেন। তাঁহার অসুস্থতার জন্য রাজকার্য্যের কোনও ক্ষতি না হয় তিনি সে আদেশ ও প্রদান করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই দুই মাস বিশেষ ধৈর্য্যের সহিত বেদনার সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত এবং গভীর ক্ষত হইয়াছিল; তাহার জন্য তাঁহার শুইবার উপায় ছিলনা; এই দুই মাস তাঁহাকে চেয়ারে বসিয়াই প্রায় কাটাইতে হইয়াছে। চূর্ণ লৌহখণ্ড বাহির করিবার জন্য একাধিক বার ক্ষত স্থানে অস্ত্র করা হইয়াছিল; এই সকল যাতনা তিনি অম্লান মুখে সহ্য করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরিবার এবং আত্মীয়েরা কি দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাইয়াছেন তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়।

লর্ড হার্ডিঞ্জের মহত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা এই স্থানে যে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াই তিনি আদেশ করিলেন, যে কোনও নির্দ্দোষ লোককে যেন অকারণ কষ্ট দেওয়া না হয়। আমাদের দেশের পুলিসের লোকেরা কোথাও কোনও অন্যায় ঘটনা ঘটিলে দোষী কে ধরিতে না পারিলে অনেক সময় কতকগুলি নির্দ্দোষ লোককে ধরিয়া কিছুদিন তাহাদিগের লাঞ্ছনার একশেষ করে। লর্ড হার্ডিঞ্জ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সেই জন্য তিনি বিশেষ ভাবে আদেশ করিয়াছিলেন যেন তাঁহার জন্য কোন নির্দ্দোষ লোককে কষ্ট না দেওয়া হয়। ইহাতে মহাকল্যাণ হইয়াছে, নতুবা এতদিন হয়ত কত নিপরাধীলোকের কষ্টের একশেষ হইত। সাধারণতঃ সামান্য একজন কর্ম্মচারীর প্রতি আক্রমণ হইলেই পুলিসের লোকেরা যে অত্যাচার করে, আর রাজপ্রতিনিধির প্রাণনাশের উদ্যোগ! ইহার জন্য নিশ্চয় দেশের লোককে অস্থির করিয়া তোলা হইত। লর্ড হার্ডিঞ্জের সদাশয়তার জন্যই লোকে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তিনি নিজে মৃত্যুর মুখে পতিত হইয়াও যাহাতে প্রজাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে তাঁহার প্রতি এই আক্রমণে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা এবং সহানুভূতির হ্রাস হয় নাই। তিনি এতদিন যেমন এদেশের কল্যাণের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন', এখনও তেমনি করিয়া যাইবেন। ইহাতেই তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণের এবং ন্যায় বিচারের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঘোর যন্ত্রণাতে তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের উদয় হয় নাই; প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য তাঁহার মন একবারও উত্তেজিত হয় নাই। বরং যাহাতে কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার না হয় সে জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

ভারতবাসীগণ তাঁহার মহত্ব এবং ন্যায় বিচারের কথা কখনও ভুলিবেনা। কোন ভারতবাসী এ প্রকার সহৃদয় এবং উদারচিত্ত শাসন কর্ত্তার প্রাণহাণির চেষ্টা করিয়াছিল একথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। সকল ভারতসন্তান এ প্রকার নীচ এবং জঘন্য কার্য্যকে সর্ব্বান্তকরণে ঘৃণা করেন। দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং তাঁহার পরিবারবর্গের যাতনা এবং দুশ্চিন্তার জন্য দুঃখিত হইয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহারা এ দুর্ঘটনার কথা ভুলিয়া যাইবেন এবং দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বাস করিয়া সুস্থদেহে আনন্দে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের ন্যায় বিচার এবং স্থিরচিত্ততার স্মৃতি বহুদিন ভারতবাসীদের মনে জাগরূক থাকিবে।

আমি চোর

কোন গ্রামে এক চোর বাস করিত। সে যে চুরি করিতে ভাল বাসিত তাহা নহে, কিন্তু দারিদ্র্যের তাড়নায় চুরি করিতে বাধ্য হইত। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও পুত্র কন্যাদের মুখে এক মুষ্টি অন্ন দিতে সমর্থ হইত না; সন্ধ্যার সময় গৃহে আসিয়া তাহাদের মলিন মুখ, স্ত্রীর বিষন্ন বদন দেখিয়া অধীর হইয়া পড়িত, এবং অন্য উপায় দেখিতে না পাইয়া, রজনীর অন্ধকারে দূরস্থ গ্রামে যাইয়া কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ও বস্ত্র চুরি করিয়া আনিত। অনন্যোপায় না হইলে সে চুরি করিত না, এবং অপহৃত দ্রব্য গৃহে অবশিষ্ট থাকিতে আর চুরি করিত না। এইরূপে তাহার দিন যাইত। কিন্তু তাহার মনে সুখ ছিল না, মুখে সর্ব্বদাই বিষাদের কালিমা লক্ষিত হইত। সে প্রায়ই লোকসমাজে যাইত না; নীরবে, নিভৃতে মনের দুঃখে দিন কাটাইত। হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে কি এক ধ্বনি নিয়তই তাহার কাণে আসিত; সে ধ্বনি শুনিয়া সে স্থির থাকিতে পারিত না, আপনাকে শত ধিক্কার দিত, আর সেই জঘন্য বৃত্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু তখন ইচ্ছা করিলেও পরিত্যাগ করা সহজ ছিল না, চুরি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল; কু অভ্যাস পরিত্যাগ করা যে কত কঠিন তাহা আমরা সকলেই জানি। মন বলে "ছি! অমন কাজ আর করিব না", কিন্তু অভ্যাস গলায় দড়ি দিয়া টানিয়া সেই কার্য্যে লইয়া যায়। কি শাস্তি!

যাহা হউক, অবশেষে সে একদিন স্থির করিল, এই কু অভ্যাস পরিত্যাগ করিতেই হইবে, এবং তাহার উপায়ও চিন্তা করিতে লাগিল।

গ্রামখানি নিভৃত, চারিদিকে দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর, মাঝে মাঝে এক একটি বিশাল বটবৃক্ষ শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত, আতপসন্তপ্ত পথিক দিগকে যেন বিশ্রামার্থ আহ্বান করিতেছে। একপ্রান্তে এক উন্নত শৈল, তাহার পাদমূলে একখানি পর্ণকুটীর। কুটীরের প্রাঙ্গনে এক লতামণ্ডপ, প্রাতঃকালে নানাজাতীয় ফুল ফুটিয়া স্থানটি সুশোভন করে, ও তাহাদের সুগন্ধে তত্রত্য বায়ুমণ্ডল সুবাসিত হয়। বৃক্ষোপরি পক্ষিকুল বিচিত্র স্বরলহরী তুলিয়া কর্ণে অমৃত সেচন করে। এই কুটীরে এক ফকির বাস করেন। তিনি অতি পুণ্যশীল ব্যক্তি, সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। তাঁহার তপঃপ্রভাবে সে ভূমি পুণ্যতীর্থ হইয়াছিল, প্রতিদিন শত শত লোক আসিয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিত, এবং তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে হৃদয় মন পবিত্র করিয়া গৃহে ফিরিত। চোর তাঁহার কাছে যাইতে স্বতঃই সঙ্কুচিত হইত, ভাবিত, "আমি কিরূপে উঁহার সন্নিহিত হইব!" একদিন সে ভাবিল, "আমাকে উঁহার নিকট যাইতেই হইবে, নতুবা আমি কোন ক্রমেই এই অতি ঘৃণ্য অভ্যাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব না।"

সন্ধ্যা সমাগত। পক্ষিগণ বিষাদসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কুলায়ে ফিরিতেছে, গাভীসকল হাম্বারবে বৎসের উদ্দেশে গৃহে ফিরিতেছে, রাখাল বালক উদাস সুরে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া মনের আনন্দে পথ চলিতেছে। সান্ধ্যগগনে এক একটি করিয়া তারা ফুটিতেছে। সাধু নিবিষ্টচিত্তে প্রকৃতির অনুপম শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। এমন সময়ে চোর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত

হইল, কিন্তু পাদস্পর্শ করিল না, অশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে বলিল, "ভগবন্ আমি অতি নিকৃষ্ট অধম মানব, আমি আপনার পূত দেহ স্পর্শ করিবার অযোগ্য; আপনি কৃপা করিয়া আপনার চরণের কিঞ্চিৎ ধূলি আমার সর্ব্বাঙ্গে নিক্ষেপ করুন।" সাধু কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তখন তাহার হৃদয়ের পাপভার যেন অর্দ্ধেক হইয়া গেল। সাধু বলিলেন, "কি হইয়াছে বাবা! আমাকে সব বল. ভগবান্ তোমার মনের ক্লেশ দূর করিবেন।" সে বলিল. "আমি মহা পাপী, চৌর্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি, এখন আমার প্রাণ এই জঘন্য বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছে, কিন্তু অভ্যাস আমার গলদেশে রজ্জু দিয়া টানিয়া লইয়া যায়, আমি কিছুতেই উহাকে অতিক্রম করিতে পারি না। আপনাকে এমন কোন উপায় বলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে আমি উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি।"

সাধু বলিলেন, "বাবা, বস, আমার কুটীরে কিঞ্চিৎ আহারীয় আছে, তুমি আহার করিয়া সুস্থ হও, তৎপর আমি তোমাকে প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া দিব।" আহারান্তে সাধু বলিলেন, "তোমাকে দুইটি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা হইলেই তুমি উদ্ধার পাইবে। প্রথম ধনী লোকের বাড়ী চুরি করিবে; দ্বিতীয় সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে।"

চোর উপদেশ লইয়া গৃহে ফিরিল, এবং অপহৃত ভদ্র বেশ পরিধান করিয়া রাজবাটীতে চুরি করিতে চলিল। একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া প্রহরী বলিল, "মহাশয়, আপনি কে?" সে বলিল, "আমি চোর"। প্রহরী ভাবিল, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই উপহাস করিতেছে, যে চুরি করিতে আইসে সে কি কখনও বলে "আমি চোর", সুতরাং সে তাহাকে বাধা দিল না। চোর দ্বিতীয় দ্বারে উপস্থিত হইল। প্রহরী বলিল, "আপনি কোথায় যাইতেছেন?" সে বলিল আমি রাজার শয়নগৃহে রাণীর অলঙ্কার চুরি করিতে যাইতেছি। প্রহরী ভাবিল "সে কি কখনও হয়, এ ব্যক্তি চোর নহে, নিশ্চয়ই রাণীর কোন নিকট আত্মীয়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছে।" সুতরাং সে বাধা দিল না, চোর অবাধে যাইয়া রাজার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া। দেখিল, রাজাও রাণী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন, রাণী গাত্রাভরণ উন্মোচন করিয়া শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছেন। সে অলঙ্কারগুলি লইয়া দুই দ্বার পার হইয়া বাহিরে আসিল। রজনী ঘোর তমসাচ্ছন্ন, জনমানবের শব্দ নাই, দূরে ফেরুপাল কোলাহল করিতেছে, চোর সন্ত্রস্ত মনে ধীরপদবিক্ষেপে গৃহে ফিরিল।

পরদিন প্রভাতে সে অলঙ্কার লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে গেল, এবং কোন এক স্থানে সেগুলি রাখিয়া লোকদিগকে কিনিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এসব অলঙ্কার কোথায় পাইলে?" সে বলিল. "রাজভবন হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছি।" সমবেত জনবৃন্দ তাহার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল, ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না। এদিকে প্রভাতে রাজবাটীতে মহাকোলাহল পড়িয়া গিয়াছে, রাণীর সমস্ত গাত্রাভরণ অপহৃত হইয়াছে। রক্ষকগণ চারিদিকে ছুটিয়াছে, তাহারা বাজারে যাইয়া দেখে চোর অলঙ্কারগুলি লইয়া বিক্রয়ের জন্য বসিয়া আছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এসব কোথায় পাইলি?" সে বলিল, "রাজবাটী হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছি।" রক্ষকগণ তাহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাজসভায় লইয়া গেল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চুরি করিয়াছ?" সে বলিল, "হাঁ, মহারাজ, করিয়াছি।" "কেন করিলে?" "আমি অতি দরিদ্র, অন্নবস্ত্রের ক্লেশ, সেই জন্যই করিয়াছি।" "স্বীকার করিতেছ কেন?" "সাধু বলিয়াছেন, আমাকে সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতে হইবে, সুতরাং স্বীকার করিতেছি, না করিলে যে মিথ্যা বলা হয়!"

রাজা সে ব্যক্তির সত্যপরায়ণতা দেখিয়া অলঙ্কার গুলি সকল তাহাকে দিলেন, এবং এক শত মুদ্রা তাহার মাসিক বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন। সভাসদ্‌গণ রাজার বিচার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ! এ কিরূপ বিচার? যাহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত,

তাহাকে ঈদৃশ পুরস্কার!" রাজা বলিলেন, "এরূপ সত্যপরায়ণতা যদি পুরস্কৃত না হয়, তবে রাজধর্ম্ম রক্ষা পায় না, জগতে সত্য পরায়ণতাও থাকিতে পারে না।"

দরিদ্র ব্যক্তি তদবধি চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুজীবন যাপন করিতে লাগিল, দুঃখী দরিদ্রদিগকে অন্ন, বস্ত্র দান করা তাহার নিত্য ব্রত হইল।

দয়েল।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলে কত রকমের পাখীর ডাক আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছে। কাকের কা, কা, শালিকের কোটর কোটর, বুলবুলের প্যাকর প্যাকর, পায়রার বাকুম বাকুম এইরূপ আরো কত রকমের ডাক কাণে আসিয়া আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া দেয়। তারপরে দিনের বেলায় কাজের গোলমালে এই হাজার হাজার ডাকের প্রতি আমরা তেমন মনযোগ দিতে পারিনা, কিন্তু একটি ডাক যেন সমস্ত দিনের কাজের মধ্যেও কাণে লাগিয়া থাকে। শালিক, ফিঙ্গে, বুলবুল ইহাদের সকলের গানই ভুলিয়া যাই কিন্তু দয়েলের গান কাণের মধ্যে যেন বাজিতে থাকে।

সত্যই দয়েলের কণ্ঠের মত এমন মধুর কণ্ঠ অতি অল্প পাখীরই আছে। গলা ছাড়িয়া মনের আনন্দে সে যখন গান জুড়িয়া দেয় তখন মনে হয় কোথাও যেন বাঁশি বাজিতেছে! দয়েলের কণ্ঠস্বর বাঁশীরই ন্যায় কোমল এবং মধুর। আমাদের দেশের অন্য কোন পাখীই গানে দয়েলের সমকক্ষ নহে। বিলাতী পাখী অধিক দেখি নাই ও তাহাদের গানও শুনি নাই; কাজেই তাহাদের কথা বলিতে পারি না। পাখী সম্বন্ধে একজন সাহেবের একখানি পুস্তক পড়িয়াছিলাম। তিনি দয়েলের গানের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে একমাত্র নাইটিঙ্গেল পাখী ব্যতীত কোন বিলাতী পাখীই দয়েলের মত এমন মিষ্ট গান করিতে পারে না। এই সাহেবের কথার উপর নির্ভর করিয়া আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, আমাদের দয়েল গানে অনেক বিলাতী পাখীকেও হারাইয়াছে। ইহা আমাদের দেশের পাখীদের নিশ্চয়ই খুব গৌরবের কথা। গলা মিষ্ট নয় বলিয়া আমাদের দেশের পাখীদের একটা অপবাদ আছে, দয়েল এই অপবাদ দূর করিয়া আমাদের দেশের পাখীদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে।

দয়েল একমাত্র গুণেই যে দেশ বিখ্যাত হইয়াছে তাহা নয়, রূপও ইহার কম কি! সাধারণতঃ যে পাখীর কণ্ঠস্বর কোমল এবং মধুর হয় তাহাদের বর্ণের তেমন শোভা হয় না। কাকাতুয়া ময়ূর প্রভৃতি দেখিতে কেমন সুন্দর! কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিলে দুই কাণে হাত দিয়া পলায়ন করিতে হয়। নন্দন পাখী দেখিতে যেমন সুন্দর ইহার কণ্ঠস্বর তেমন কর্কশ। এইরূপ আরও অনেক পাখীর নাম করা যায়। আর আমরা সচরাচর যে সকল পাখী দেখিতে পাই, তাহারা ময়ূর প্রভৃতির ন্যায় দেখিতে তেমন সুন্দর না হইলেও কণ্ঠস্বর উহাদের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অনেক মিষ্ট। দয়েলের কণ্ঠস্বর যেমন মধুর আকারও তেমন সুশ্রী। আকার আয়তনে এবং বর্ণে দয়েল সত্য সত্যই সুন্দর। উহার দেহের পালকের কতক অংশ শুভ্র এবং কতক অংশ কাল হওয়ায় দেখিতে সুন্দর হইয়াছে। পৃষ্ঠের এবং মস্তকের কাল পালকগুলি কেমন চিক্কণ এবং মসৃণ! পাখার দুই ধারে দুইটি সাদা রেখা! বুকের নিম্নভাগ শুভ্র পালকে ঢাকা, আবার উপরিভাগ ঠিক ঠোঁট পর্য্যন্ত উজ্জ্বল কাল পালকে আবৃত। লম্বা অধিক নয় প্রস্থ অধিক নয় আকারের তেমন কোন অসামঞ্জস্য ঘটায় নাই। এই জন্য সকল দিক দিয়াই দয়েল একটি সুন্দর পাখী বলা যায়।

দয়েলের প্রকৃতি শান্তিপ্রিয়। গলার স্বর মিষ্ট বলিয়া সে যখন তখন সমস্ত দিন চীৎকার করিয়া গলা ফাটায় না এবং দেহের পরিচ্ছদ এমন সুন্দর বলিয়া বাহাদুরী দেখাইবার জন্য সে বনে বনে মাঠে মাঠে উড়িয়া বেড়ায় না। দিবসের অধিকাংশ সময় নিভৃতে অন্ধকারপূর্ণ স্থানে কাটায়। গান করিতেও ইহাদের খুব অল্পই শোনা যায়। নির্জ্জনে প্রভাতে ঘুম হইতে জাগিয়া ইহারা একবার গান করে, তারপর

সমস্ত দিন নীরবে থাকে, আবার সন্ধ্যার সময় বাসায় আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে ইহাদের গান করিতে শোনা যায়। অন্যান্য পাখীরা যেমন সময়ে অসময়ে যখন তখন ডাকে, দয়েল তেমন করে না। সেইজন্য সমস্ত দিনের মধ্যে দয়েলের গান খুব অল্প শোনা যায়। তবে নাকি সুরে এক রকম ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করিতে ইহাদের সর্ব্বদাই শোনা যায়। কিন্তু এই নাকি সুরকে তোমরা দয়েলের গান মনে করিও না। দয়েলের গান শুনিতে হইলে প্রত্যূষে উঠিয়া দয়েল যেখানে থাকে সেখানে কাণ পাতিয়া বসিয়া থাকিবে। একদিন শুনিতে পাইলেই বুঝিতে পারিবে এ গান কেমন সুন্দর।

এক একজোড় দয়েলের নিজের একটি বিশেষ স্থান আছে। ইহারা সাধারণতঃ সেই স্থানটির পার্শ্বেই ঘুরিয়া বেড়ায়। খাদ্য অন্বেষণের জন্য বুলবুল, শালিক প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায় না। নিকটে যে খাদ্য পায় তাহাতেই ইহারা সন্তুষ্ট থাকে। চারিদিক ঝোপেঝাপে ঢাকা, উপর হইতেও রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে না, এমন ছায়াবৃত অন্ধকারময় স্থানে সাধারণতঃ ইহারা দিবসের অধিকাংশ সময় কাটায়। পেঁচার ন্যায় বোধ হয় ইহারা রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না, ইহারা রৌদ্র ভীরু।

দয়েলের একমাত্র কীট পতঙ্গ খাদ্য। বুলবুল শালিক প্রভৃতি পোকা যেমন খায় তেমন নানা বন্য ফলও ইহাদের প্রিয়;—পোকার অভাব হইলে বন্য ফলের দ্বারা সে অভাব পূরণ করিয়া লয়। কিন্তু দয়েল প্রাণ গেলেও ফল মুখে দেয় না। বরং উপবাস করিয়া থাকিবে, কিন্তু পোকা ভিন্ন অন্য কোনখাদ্যই ইহারা মুখে তুলিবে না। এই পোকা ধরিবার জন্যই সম্ভবতঃ ইহারা ছায়ায় ঢাকা অন্ধকারময় শীতল স্থানে থাকিতে ভাল বাসে। কারণ তেমন স্থানেই আর্দ্র অধিক পরিমাণ পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণ হইবে। লতায় পাতায় ঢাকা স্থান হইতে কেমন ইহারা পোকা খুঁজিয়া বাহির করে! গাছের পাতায় কিম্বা ডালে যে পোকা থাকে তাহাও ইহাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

পোকা ধরিবার জন্য মাটির উপর দিয়া ইহারা সাধারণতঃ লাফাইয়া চলে। ইহারা মাটির উপর দিয়া তেমন সহজভাবে হাঁটিতে পারে না, এই জন্য ইহারা মাটিতেও বড় একটা নামে না। পোকা খুঁজিতে মাটিতে নামিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাও অধিকক্ষণের জন্য নহে, পোকাটিকে ঠোঁটে ধরিতে পারিলেই উড়িয়া গিয়া ডালে বসে। ডালে বসিয়া পোকাটিকে ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া মারিয়া ফেলিয়া শীঘ্র গিলিয়া ফেলে।

মানুষকে ইহারা তেমন ভয় করে বলিয়া মনে হয় না। মানুষের প্রতি ইহাদের তেমন ভয় থাকিলে লোকালয়ে ইহারা বড় একটা আসিত না—কিন্তু অনেক সময় বাড়ীর উপরে বেগুণ কিম্বা লঙ্কা ক্ষেতের ইহাদিগকে মধ্যে পোকা খুঁজিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। তবে মানুষ একটু নিকটে আসিলে ইহারা পলায়ন করে।

দয়েল সংখ্যায় অধিক নয়। বুলবুল শালিক প্রভৃতির ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে দয়েল দেখা যায় না। সহরে খুঁজিতে খুঁজিতে দুই চারিটি দয়েল আমাদের চক্ষে পড়ে। ইহারা যে সংখ্যায় এত অল্প, তাহার একটি কারণ এই মনে হয়, একমাত্র পোকা ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। পোকা বেশী খাইতে পায় না বলিয়া ছানাও ইহাদের অধিক হয় না। একস্থানে পোকা না পাইলে যে নানাস্থানে পোকার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবে তাও ইহাদের অভ্যাস নয়। কাজেই পোকার অভাবে ছানা তত বেশী হইতে পারে না। ঘন ঘন এবং অধিক ছানা হইলে তাহাদের খাওয়াইবে কি? ইহাদের ছানা গাছের কোটরে হয়। বুলবুল প্রভৃতির ন্যায় ইহারা ঝোপে কিম্বা ডালের উপর বাসা নির্ম্মাণ করে না। কাঠঠোকরা কিম্বা অন্যান্য পাখীর পরিত্যক্ত কোন একটি কোটরে খড়কুটা দ্বারা বাসা প্রস্তুত করে। কখন কখন পুরাতন দালানের কোট-রেও ইহাদের বাসা করিতে দেখা যায়। কাঠ-ঠোকরার ঠোঁটের ন্যায় ইহাদের ঠোঁট তেমন দৃঢ় এবং ধারাল নহে; কাজেই বাসা নির্ম্মাণের জন্য ইহাদের

দালানের গর্ত্ত কিম্বা অন্যান্য পাখীর কোটর খুঁজিয়া বাহির করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই?

বাল্য অবস্থায় দয়েলের দেহের পালক তেমন মসৃণ থাকে না। বড় হইলে ইহাদের দেহের চিক্কণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বড় হইলেও স্ত্রী দয়েলের পালক অনেকটা ফেকাসে থাকিয়া যায়। দুইটি দয়েল একত্রে থাকিলে স্ত্রী দয়েলের ফেকাসে বর্ণ দেখিয়া দুইটির মধ্যে কোনটি স্ত্রী এবং কোনটি পুরুষ তাহা তোমরা সহজেই চিনিতে পারিবে।

আমাদের দেশে অনেকে অনেক রকমের পাখী পালন করিয়া থাকে, কিন্তু অল্প লোককেই দয়েল পালন করিতে দেখা যায়।

দয়েল যে শুধু বাঙ্গালা দেশেরই পাখী তা মনে করিও না। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই দয়েল দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বাহিরে সুদুর আন্দামান দ্বীপে, নাকি বহু সংখ্যক দয়েল দেখা যায়। বাঙ্গালা-দেশের কয়েদীদের এই দয়েলের ডাক শুনিয়া সেই সুদুর স্থান হইতে তাহাদের নিজের দেশের কত কথাই না জানি, মনে হয়। পাহাড়ে পর্ব্বতে কিম্বা শীতের দেশে ইহাদের প্রায়ই দেখা যায় না।

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।

গৃহশিক্ষা।

পরদিন মালতী স্কুলে যাইবার পর বিনয় জাগিয়া উঠিল। তাহার মাতা দেখিলেন, সে শয্যার উপর বসিয়া চক্ষু রগড়াইতেছে। মাতাকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "মা, কটা বেজেছে? স্কুলে যাবার সময় যে হল। আমারত আজ বড় দেরী হয়ে গেল, আমাকে ত আজ সবার নীচে বস্‌তে হবে। তুমি আমায় আগে জাগাও নাই কেন?"

মাতা বলিলেন "তুমি ও সব ভেবোনা, তোমার অসুখ বলে তোমায় জাগাইনি।"

বিনয় বলিল "মা, ওঃ আমারত এবারে পরীক্ষা দেওয়া হলনা, মা—কি হবে?"

ইহা বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। মাতা তখন ধীরে তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া বলিলেন তুমিত শান্ত ছেলে, কাঁদিওনা সোনা. আমি তোমার খাবার আনি তার পরে ও বিষয়ে কথা হবে। আমি জানি যে এ কষ্ট সহ্য করা বড় কঠিন, কিন্তু তুমি ধৈর্য্য ধরিবে।

বিনয় এত দুর্ব্বল বোধ করিতেছিল, যে আর কিছু না বলিয়া নীরবে শুইয়া রহিল ও অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিল! মাতা খাদ্য দ্রব্য লইয়া আসিলে পর বিনয় জিজ্ঞাসা করিল "কটা বেজেছে।"

মাতা বলিলেন "এগারটা বেজেছে, এখন কি একটু ভাল বোধ করছ?

বিনয় বলিল "হাঁ, বেশ ভাল বোধ কর্‌ছি। আমি কি বিকালে ও স্কুলে যেতে পার্‌বনা? একদিন ত বৃথায় গেল, এখনও যদি খুব কঠিন পরিশ্রম করি হয়ত পরীক্ষা দিতে পারি।"

মাতা বলিলেন "ডাক্তার এখন পরিশ্রম কর্‌তে বারণ করেছেন। কয়েক দিন তুমি বিশ্রাম কর।"

"ডাক্তার এসেছিলেন? আমিত কাল তাঁকে দেখি নাই, কালত আমি স্কুলে ছিলাম।"

"না, তুমি কাল স্কুলে যাওনি, তোমার বুঝি কাল-কার কথা কিছুই মনে নাই! আমরা ভয় পেয়েছিলাম যে তোমার বসন্ত কি হাম কিছু হবে, কিন্তু এখন সে ভয় কেটে গেছে, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

তখন বিনয়ের চক্ষু পুনরায় অশ্রু পূর্ণ হইল; সে বলিল, "ও! এবারে আমার পরীক্ষা দেওয়া হলনা; বাবাকে সুখী কর্‌ব বলে কত আশা করেছিলাম, কিছুই হলনা।"

"তোমার এবং আমাদেরও খুব দুঃখ হয়। কিন্তু কি কর্‌বে বল। যদিও এবারে পরীক্ষা দিতে পার্‌লেনা কিন্তু জ্ঞান লাভ করেছত।"

"মা, তবুও মনে হয় যে পরীক্ষাই যদি দিতে পার্‌লাম না. তবে জ্ঞানলাভ ও পরিশ্রম করে আর কি হল?"

"হাঁ, আমাদের সকলেরই এই কথা মনে হয়;

কিন্তু ঈশ্বর চান্‌ যে এ ভাবটা, আমরা মন থেকে দূর করে দিই।"

"মা, আমি কি করে যে আবার স্কুলে যাব, তাই ভাবছি।"

"বিনয়, শোন,—আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমারই মত এক দরিদ্র বালিকা আমার বন্ধু ছিল। তাহারা ভাই বোনে অনেক গুলি ছিল। তাহারা পিতৃহীন; বড় ছেলে রমেশের উপরই সংসারের সমস্ত ভার পড়িল। তার উপর দ্বিতীয় ভাইটী বহুদিন নানারোগে কষ্ট পেয়ে মারা গেল; আর ছোট ভাইটী ভাল ছিল না। রমেশ তাদের সকলের ভার নিয়েছিল। সে সারাদিন খাটিত। দারিদ্র্যের কষ্টে তাহার মার শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া গেল, রমেশ ভাবিল একাজ করেত বেশী টাকা পাই না, তবে কোন রকমে প্রতিমাসে যদি কিছু জমাতে পারি, তবে একটী ক্ষুদ্র ব্যবসা করিতে পারি। একটা বাগান করি, নানারকম ফল ও তরকারী করিয়া যদি বিক্রী করি ও সহরে চালান দিই তবে কিছু লাভ হতে পারে;আর মাকে কোন স্বাস্থ্যকর দেশে রাখি, মার এই কষ্ট ত সহ্য করতে পারিনা। এই কথা মনে করে সে অতি কষ্টে টাকা জমাতে লাগল। বেশী টাকা হইলে তখন সে এক ব্যাঙ্কে জমা রাখল। আর এক মাস পরেই তার প্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তার মনে আনন্দ ধরেনা। সে দূর দেশে কাজ করিত, মাকে লিখিল,—'মা, শীঘ্রই তোমার কষ্ট দূর করব এই কথা মনে করে যে কি আনন্দ বলতে পারি না। তোমাকে যদি সুখী করতে পারি তবেই আমার জন্ম সার্থক" কয়েক দিনের জন্য ছুটী লইয়া সে বাড়ী আসিল। একদিন এক সংবাদপত্র পড়িতেছিল, তাতে দেখ্‌লে যে যে ব্যাঙ্কে সে টাকা রাখিয়াছিল, ক্ষতি হওয়াতে সে ব্যাঙ্ক উঠিয়া গিয়াছে। তাহার মাথায় যেন বজ্র পড়িল; এক মুহূর্ত্তে সকল আশা চূর্ণ হয়ে গেল। ভাবল যে এই ক' বছরের পরিশ্রম সব বৃথা হ'ল; আবার কত বছরে সেই টাকাটা জমাবে, তা' কে জানে?

ইহা শুনিয়া বিনয়ের চক্ষে জল আসিল; সে জিজ্ঞাসা করিল "মা, আবার সে উৎসাহের সঙ্গে কাজ কর্‌তে লাগ্‌ল? আর শেষে তার ইচ্ছা কি পূর্ণ হইল? কি ধৈর্য্য!"

মাতা বলিলেন "হাঁ, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে কত কষ্ট পাইতে ও কত কি পরিশ্রমই করিতে হইয়াছিল। ঈশ্বরের অসীম করুণায় বিশ্বাস ছিল বলেই সব কষ্ট সহ্য করতে পার্‌ল।"

বিনয় বলিল "যাক্‌, তবুও তার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। আমার ত আর হইবে না। আর আমিত অত ভাল নই।"

মাতা বলিলেন "এবারে তুমি পার্‌লে না, কিন্তু আর একবার চেষ্টা কর। প্রথমে অবশ্য খুব কষ্ট লাগে কিন্তু ক্রমে দেখিবে পড়িতে আনন্দ হইবে।"

বিনয় বলিল "মা, তুমিই ভাল বোঝ।" ইহা বলিয়া সে হস্ত দুইখানি একত্র করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরবে শুইয়া রহিল। তাহার মাতা বুঝিলেন, যে সে ঈশ্বরের নিকট বল ভিক্ষা করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে মাতা বলিলেন "একটী ছোট মেয়ে খুব আশা করেছিল যে তার বন্ধু তার সঙ্গে ক'দিন থাক্‌বে ও তাহারা নানা রকম আমোদ করিবে; কিন্তু হঠাৎ তার দাদার পীড়া হ'ল কাজেই তার দাদা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিতে হইল। সে মনে করেছিল যে সে এ কষ্ট সহ্য কর্‌তে পার্‌বেনা, কিন্তু যখন শুনিল যে তার দাদাকে তার চেয়ে শতগুণে বেশী কষ্ট সহ্য কর্‌তে হইবে তখন সে আনন্দে দুঃখ সহ্য করিল।"

তখন বিনয় তাহার মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "ওঃ আমি বুঝেছি মালতীর এ কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়েছে। আহা মালতী, তাহার জন্য আমার দুঃখ হয়।"

মাতা বলিলেন,"তাহার খুব দুঃখ হইয়াছিল কিন্তু তুমি ভাল হলেই তার বন্ধু আস্‌বে। তুমি তার জন্য ব্যস্ত হইও না।"

বিনয় বলিল "আজ আমি বাবাকে সকল কথা বলিব। আমি ভেবেছিলাম ভাল খবরটা হঠাৎ দিয়ে তাঁকে চমকে দেব, কিন্তু তা' আর হল্লে না।"

সেদিন সন্ধ্যার সময় বিনয়ের পিতা কর্ম্মান্তে বাটী ফিরিয়া আসিলে পর বিনয় সব বলিল। পিতার সুমধুর উপদেশ শুনিয়া তাহার দুঃখ অনেক পরিমাণে লঘু হইল ও সে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গেল।

শ্রীবাসন্তী মিত্র।

মহত্ত্ব।

সপার্ষদ নৃপমণি বাহিরিলা পথে,
উঠে ঘন জয়ধ্বনি আকাশে গভীর,
স্থবির ভিক্ষুক এক আসি কোথা হতে
নরেন্দ্রে প্রণাম করে নোয়াইয়া শির।
চকিতে থামায়ে অশ্ব নামিয়া ত্বরায়
ভিখারীর পদে নমে রাজ রাজেশ্বর;
স্তম্ভিত বিস্মিত সবে চিত্রপট প্রায়!
শুধায় অমাত্য এক করি যোড় কর
"নগণ্য কাঙ্গালে কেন করিলে বন্দনা?"
উত্তরিলা মহামতি—(স্বর্গ মর্ত্ত্য জুড়ি'
পলকে খেলিল যেন ত্রিদিব মূর্চ্ছনা!)—
"সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আমি মন্ত্রী, সত্য বটে তাই,
কেনবা বিনয়ে বড় হবে ভিক্ষু ভাই!"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কুলমর্য্যাদা।

গৌরী বাবু এটওয়ায় কাজ করেন। রুড়কি কলেজ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেই চাকরী করিতেছেন। অনেক দিন দেশে যান নাই। সম্প্রতি কন্যার বিবাহ উপলক্ষে দেশে যাইতেছেন। তাঁহার বাড়ী নদীয়া জেলার এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামে। গৌরী বাবুর পিতা নিজ গ্রামে তহশীলদারী কাজ করিতেন; সামান্য বেতন হইলেও কোনও প্রকারে পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। এখন অবস্থার খুব উন্নতি হইয়াছে। গৌরী বাবু মোটা বেতন পান; তদ্ভিন্ন অন্য প্রকারেও যথেষ্ট পাওনা আছে। গ্রামে পাকা দোতালা বাড়ী করিয়াছেন; কিছু জমিদারীও কিনিয়াছেন। গৌরী বাবু কচিৎ দুই পাঁচ বৎসর অন্তর বাড়ী আসেন; বাড়ীতে তাঁহার পিতা থাকেন এবং তিনিই বাড়ীর সমুদয় কাজ কর্ম্ম দেখেন। বয়স ষাট বৎসরের উপর হইলেও, এখনও বেশ সবল আছেন; সুপুত্র বলিয়া গৌরী বাবুর খুব সুখ্যাতি। পিতা যাহা বলেন, তিনি সর্ব্বদাই তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লন; পিতার যখন যত টাকার আবশ্যক হয় তৎক্ষণাৎ তাহা পাঠাইয়া দেন। অবশ্য তাঁহার পিতার দ্বারা বৈষয়িক লাভ ভিন্ন ক্ষতি হয় নাই। তিনি সেই টাকা অধিক সুদে খাটাইয়া, বা সুবিধামত সস্তায় সম্পত্তি খরিদ করিয়া আপনাদের অবস্থার বেশ উন্নতি করিয়াছেন। গৌরী বাবুর চাকরী হওয়ার দশ পনর বৎসরের মধ্যে তাঁহারা সেই অঞ্চলে একটী বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। পনর বিশখানি গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। সকলে তাঁহার পিতাকে ভয় করিত এবং একটু সম্মানও করিত।

গৌরী বাবু সস্ত্রীক এটওয়াতে বাস করেন; তাঁহার একটী কন্যা এবং তিনটী পুত্র। কন্যাটীই সকলের বড়। বয়স বার তের বৎসর হইয়াছে; দেশে থাকিলে এত দিন বিবাহ হইয়া যাইত। গৌরীবাবু কন্যাটীকে বড় ভাল বাসেন, তাই পিতার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আজ কাল করিয়া এতদিন কন্যাকে অবিবাহিত রাখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন আর বিলম্ব করা সম্ভব নহে। দুই তিন মাস পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী ছেলে মেয়েদের লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা বিবাহের দিন স্থির করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন, তাই তিনি এক মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছেন।

বিবাহের সমুদায় আয়োজনের ভার পিতার হাতেই রাখিতে হইয়াছে। গৌরীবাবু মেয়েটীকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, একটী শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন; কিন্তু তাঁহার পিতা কোনও কুলীন পরিবারে পৌত্রীকে সমর্পণ করিয়া বংশমর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই জন্য সে

অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা কুলীন পরিবারের একটী ছেলের সঙ্গে সুশীলার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। ছেলেটীর বয়শ বাইশ বৎসর, তাহাদের অবস্থা মন্দ নহে; কিন্তু ছেলেটী অল্প বয়সেই লেখা পড়া ছাড়িয়া দিয়াছে। গৌরীবাবু এ সম্বন্ধ বিশেষ পছন্দ করেন নাই; কিন্তু পিতা স্থির করিয়াছেন, তাহার উপর কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। দানে ও পণে প্রায় তিন চারি হাজার টাকা দিতে হইবে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোনও দুঃখ নাই, বরং যদি আরও দুই চারি হাজার টাকা খরচ করিয়া একটী মনের মত পাত্রের সঙ্গে সুশীলার বিবাহ দিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি আনন্দের সহিত তাহা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা সে কালের লোক, বংশ মর্য্যাদার উপরেই তাঁহার ঝোঁক। গৌরীবাবু বংশমর্য্যাদায় তিল মাত্র বিশ্বাস করিতেন না, ইহাকে ভ্রান্ত কুসংস্কার মনে করিতেন, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করিবার সাহস নাই।

বিবাহের দিনের সাত আট দিন পূর্ব্বেই গৌরীবাবু বাড়ী পৌঁছিলেন। ইতি মধ্যেই বাড়ীতে ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। বরপক্ষেরা অনেক লোকজন লইয়া আসিবেন; গৌরীবাবুদেরও অবস্থার উন্নতির পরে এই প্রথম অনুষ্ঠান; অনেক কুটুম্বসাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। খুব সমারোহে ক্রিয়া হইবে। কোথাও কাঠ কাটান হইতেছে, কোথাও দুধ দইয়ের বায়না দেওয়া হইতেছে, কোথাও জিনিষ পত্রের ফর্দ্দ হইতেছে। গৌরীবাবুর পিতা এই সব লইয়া মহা ব্যস্ত। গৌরীবাবু কোনও গোলমালের মধ্যে গেলেন না। তিনি দেশে থাকেন না; দেশের প্রথা পদ্ধতিও কিছু জানে না। সুতরাং কোনও কথা বলিতে সাহসও করেন না। এক দিন একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহাকে বলিল "বাবা, এবার আমি ছাড়িবনা, আমার বউয়ের জন্য একখানা শান্তিপুরে সাড়ী দিতে হইবে; আমি তোমার মায়ের আঁতুরের সব কাজ করিয়াছিলাম; আর বৌমারও কাজ করিয়াছি; এ মেয়ের বিয়েতে আমি অনেক পাব বলে আশা করিয়া আছি।" গৌরীবাবু বলিতে যাইতে ছিলেন "তা তাঁহার পিতা কোন দিক হইতে আসিয়া বলিলেন "কাকে কি দিতে হবে, সে সব আমি জানি, তোমরা এখন কিছু গোলমাল করিওনা।" গৌরীবাবু কিছু অপ্রস্তুত হইলেন; বৃদ্ধা দাই ভয়ে সরিয়া গেল।

ক্রমে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। গৌরীবাবুর পিতা প্রাতঃকালে হইতে নানা কাজে ব্যস্ত রহিয়াছেন। ষাটি বৎসরের বৃদ্ধ; কিন্তু তবু সকল কাজ নিজে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছেন। চারিটী পয়সা বাঁচাইতে চারি শ কথা বলিতেছেন। গৌরীবাবু দুই একবার বলিয়াছিলেন "বাবা আপনি এত গোলমালের মধ্যে যাইবেন না, শরীর খারাপ হইবে।" কিন্তু কোন ফল হইল না দেখিয়া নিরস্ত হইয়াছেন।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময়ে মহা সমারোহে বরযাত্রীরা আসিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সঙ্গে দুইটা হাতী, অনেক ঘোড়া, গাড়ী, বাদ্যভাণ্ড আলো; ঢাকের বাজনায়, বোমের আওয়াজে, তুবড়ীর ফোঁস ফোঁসানীতে ছোট গ্রামখানি একেবারে আলোড়িত হইয়া গেল। ছেলে বুড়ো কারো চক্ষে সে রাত্রিতে আর ঘুম নাই।

বরযাত্রীদের অভ্যর্থনার গোলমাল একটু মিটিয়া গেলে বর ও কন্যাকে বিবাহসভায় আনা হইল। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। গৌরীবাবুর পিতা কন্যা সম্প্রদান করিবেন; উভয় পক্ষের পুরোহিত ও কয়েকজন প্রধান লোক সভায় বসিয়াছেন; ক্রিয়া আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যে বরকর্ত্তা ছায়ামণ্ডপের খরচের একটী তালিকা দিলেন; বিভিন্নব্যয়ে তিনি ২৫০৲ টাকার তালিকা ধরিয়াছেন। গৌরীবাবুর পিতা সেখানি লইয়া পড়িয়াই রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি নিজে যে তালিকা করিয়া রাখিয়াছিলেন, পকেট হইতে তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ইহার অতিরিক্ত এক কানা কড়ি দিব না।" ইহা লইয়া দুই পক্ষে ক্রমে বেশ বিবাদ আরম্ভ হইল; উভয় পক্ষই খুব উত্তেজিত হইলেন; তাঁহাদের ঝগড়ার গোলমালে অনেক

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনাতে ব্যস্ত ছিলেন; বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগের যেরূপ সমাদর ও অভ্যর্থনা হওয়া উচিত মনে করেন, তাহা হইতেছেনা দেখিয়া দুঃখিত এবং বিরক্ত হইতেছিলেন, এবং নিজে যতদূর সম্ভব সকলকে মিষ্টবাক্যে সম্বর্দ্ধনা করিতেছিলেন· গোলমাল শুনিয়া গৌরীবাবু তাড়াতাড়ি ভিতরে আসিলেন; সেখানে উভর পক্ষের কলহ শুনিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। তিনি দেশে থাকেন না, বিবাহ সভায় সাধারণতঃ সামান্য বিষয় লইয়া যে প্রকার বিবাদ হয়, তাহা অবগত ছিলেন না। ব্যাপারটা কি তাহা জানিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। বিবাদের কারণ জানিতেই অনেক সময় গেল; সকলেই অবান্তর কথা লইয়া ঝগড়া করিতেছে, কি কারণে বিবাদ বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি তাহার উত্তর পাইলেন না। অবশেষে বিবাদের কারণ জানিতে পারিয়া দুইখানি তালিকা লইয়া দেখিলেন, যে উভয়ের মধ্যে ৩৫৲ টাকার পার্থক্য। গৌরীবাবুর পিতা যত দিতে প্রস্তুত আছেন, বরপক্ষীয়েরা তদপেক্ষা ৩৫৲ অধিক দাবী করিতেছেন। গৌরীবাবু তাঁহার পিতাকে বলিলেন "৩৫৲ টাকার কথা বইত নয়; কত টাকা কোথায় যাইতেছে; আর ৩৫৲ টাকা বেশী গেলই বা, ইহা লইয়া মনোমালিন্য করিবার প্রয়োজন কি?" গৌরীবাবুর পিতা তখন অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে ধমক দিয়া কহিলেন "তুমি এসব কিছু বোঝ না; ইহাতে আমাদের বংশের মর্য্যাদা হানি হইবে, আমাদের নিকট হইতে ইঁহারা এর বেশী পান না। আমি ২১৫৲ টাকার বেশী এক পয়সা দিবনা।" গৌরীবাবু বরপক্ষকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দেখিলেন তাঁহাদেরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। গৌরীবাবু তখন নিরুপায় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। উভয় পক্ষের কথা কাটাকাটি সমভাবে চলিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল, তখনও মীমাংসার কোনও লক্ষণ নাই দেখিয়া গৌরীবাবু আবার বিবাহ সভায় আসিয়া বলিলেন, "রাত্রি প্রায় শেষ হয়; ছেলে মেয়ে দুটী সারাদিন উপবাস করিয়া আছে; বিবাহটা হইয়া যাক; পরে আপনাদের দেনাপাওনার বিষয় স্থির করিবেন।" অনেক অনুরোধ উপরোধের পরে কোনওরূপে বিবাহ হইয়া গেল। সে রাত্রিতে অনেকের খাওয়া হইল না; কেহ কেহ রাগ করিয়া খাইলেন না; আবার অনেকে যেখানে একটু স্থান পাইয়াছিল সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বহু অর্থব্যয়ে যে সমুদয় উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই নষ্ট হইল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া আবার সেই বিবাদ আরম্ভ হইল। কোনও পক্ষই জিদ ছাড়িতে প্রস্তুত নন; অনেক বেলা পর্য্যন্ত উভয়পক্ষে বাদানুবাদ চলিল। অবশেষে বর পক্ষীয়েরা রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। গৌরীবাবু আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন "যে কাল রাত্রিতে আহার হয় নাই; আপনারা অনুগ্রহ করিয়া স্নানাহার করিয়া যান।" তাহাতে তাঁহারা মহাক্রোধে বলিলেন "এ বাড়ীতে জলস্পর্শ করিব না, নিকটে বাজার আছে সেখানে গিয়া খাওয়া দাওয়া করিব, এখানে আর তিলার্দ্ধ থাকা হইবে না; এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে; দুখানা ইট করিয়া বড় অহঙ্কার হইয়াছে।" গৌরীবাবুদের অতীত দারিদ্র্যের উল্লেখ করিয়া অনেক অভদ্র উপহাস করিতে করিতে বরযাত্রীদের মধ্যে যাহারা বেশী উদ্ধত তাহারা বাহির হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও বাহির হইতে হইল। গৌরীবাবু অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না; অবশেষে নিরুপায় হইয়া বর ও কন্যাকে বাহির করিয়া দিতে হইল।

সাতদিন পরে কন্যা আনিবার জন্য যখন লোক গেল, তখন তাহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইল। এই সাতদিনে সুশীলার লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছে। আর কাহাকেও না পাইয়া যত রাগ তাহার উপরে বর্ষিত হইয়াছে; তাহার পিতামহের উদ্দেশে তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া

কত কটু কথা, কত অভদ্র উপহাস চলিতেছে। সে কিছুই জানেনা; পিতার আদরে পালিত; কখনও একটু কর্কশ বাক্য সহে নাই, পিতামাতার নিকট হইতে কখনও দূরে যায় নাই। এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিতদের মধ্যে পড়িয়া তাহার প্রাণ অস্থির হইতেছিল; মনের কথা বলিবারও একজন লোক পায় না। এই সাতদিন কোনওরূপে অপেক্ষা করিয়াছিল; ভাবিতেছিল, সাতটা দিন কাটিয়া গেলেই পিতার নিকটে ফিরিয়া যাইব। যখন শুনিল যে তাহাকে লইতে যে লোক আসিয়াছিল, তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন সে একেবারে চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিল। বুকের ভিতর হইতে যেন কি একটা বেদনা উঠিতে লাগিল। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু সারাদিন সে কোনও মতে চুপ করিয়া থাকিল; রাত্রিতে যখন একাকী হইল, তখন কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইয়া ফেলিল; সারারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার জ্বর হইল। পরদিন কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না; জ্বরের উপরে স্নান করাইয়া দিল। বিকালে জ্বর খুব প্রবল হইল; তখনও কেহ গ্রাহ্য করিল না। বাড়ীতে কেহই তাহাকে স্নেহের চক্ষুতে দেখে না; সকলেরই তাহার উপরে রাগ। অযত্নে, অত্যাচারে এবং মনের যাতনাতে পীড়া অতিশয় বাড়িয়া গেল; তিন দিনের দিন ঘোর বিকার উপস্থিত হইল, এবং সে প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিকারের মধ্যে সে কেবল বাবা ও মার কথা বলিতে লাগিল। গ্রামের লোকদের মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ সুশীলার পিতাকে সংবাদ দিতে বলিলেন; কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহাতে সম্মত হইলেন না। নিকটবর্ত্তী এক খানি বড় গ্রামে এক জন সামান্য ডাক্তার ছিলেন; তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য আন হইল; তিনি দেখিয়াই বলিলেন, অবস্থা সঙ্কটজনক। তিনি যেমন পারিলেন চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া বাড়ী ফিরিয়াই তিনি গৌরীবাবুর নিকটে একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন; লিখিলেন তাঁহার কন্যার কঠিন পীড়া হইয়াছে; অবিলম্বে একজন ভাল ডাক্তার লইয়া যেন আসেন।

পত্র পাইয়াই গৌরী বাবু ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইলেন। তাঁহাদের গ্রাম হইতে ৮ মাইল দূরে একজন মেডিক্যাল কলেজের পাসকরা ডাক্তার ছিলেন; তিনি প্রথমে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রওনা হইলেন। তাঁহারা যখন রোগীর নিকট পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি ১২টা। শুনিলেন সারাদিন বাবাও মা এর নাম করিয়া ছটফট করিয়া সন্ধ্যা হইতে নিস্তব্ধ হইয়া আছে। ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, গৌরীবাবুও অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কোলের উপরে কন্যার মাথা তুলিয়া লইলেন। ডাক্তার বাবু ইতিমধ্যে একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া কষ্টে একটু তাহার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিলেন। গৌরীবাবু কন্যার কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া জোরে ডাকিয়া বলিলেন, "সুশীলা, মা, আমি আসিয়াছি, একবার তাকাও।" দুই তিন বার ডাকার পর সুশীলা আস্তে আস্তে একবার চক্ষু মেলিল; স্থির দৃষ্টিতে পিতার দিকে তাকাইল; তাহার মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল; তার পরে আবার আস্তে আস্তে চক্ষু নিমীলিত করিল। পিতার কোলে মাথা রাখিয়া বালিকা চিরনিদ্রায় মগ্ন হইল।

গৌরীবাবু সারারাত্রি সেই অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। কেহ তাঁহার নিকটে যাইতেও সাহস করিল না। পরদিন কন্যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি আপনার ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন। অনতিবিলম্বে সকল সংবাদই প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনদিনের দিন গৌরীবাবু উঠিয়া এটোয়া যাইবার জন্য রওনা হইলেন। তিনি সেই দিনই যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছেন; গ্রামের লোকেরা কেহ কেহ আসিয়া বলিলেন, দুই একটা দিন থাকিয়া যাও; কিন্তু তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। যাত্রাকালে তাঁহার পিতা আসিয়া বলিলেন "আমিও এখানকার বাস ত্যাগ করিব স্থির করিয়াছি। আমাকেও তোমার সঙ্গে লও।" গৌরী বাবু দেখিলেন তিনি তিনদিনে অশীতিবর্ষের বৃদ্ধের মত হইয়াছেন। উভয়ে উভয়ের মনের ভাব বুঝিলেন। পৈত্রিক

বাসস্থান, গ্রাম ও দেশ ছাড়িয়া পিতাপুত্র বাহির হইলেন। আর তাঁহারা কখনও দেশে ফিরেন নাই। গৌরীবাবুর পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন আর সংসারের কোনও বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ ও করিতেন না। তাঁহাকে সর্ব্বদাই হরিনামের মালা হাতে করিয়া থাকিতে দেখা যাইত।

পশুর ডাক্তার।

চশমা চোখে পশুর ডাক্তার
বসে আছেন ঘরে
নানা রঙের শিশি খাড়া
তাঁহার টেবিল পরে।
কম্পাউণ্ডার মশায় তাঁহার
হাতের আস্তিন টেনে,
ঢেলে ঢেলে করেন মিক্‌চার
নানা ঔষধ এনে।
বিনা পয়সায় ঔষধ দেন
ডাক্তার বড় দয়াল,
দিন রাত্তির সদাই সেথা
আসে রোগীর পাল।
আপন দোষে কারো কভু
অসুখ হলে ভারি,

ডাক্তারের গালি খেয়ে
যেতে হয় তার বাড়ী।
একটী রোগী এসে বড়
বসলো চেয়ার ঠেসে,
রোগের কথা করলো সুরু
কেশে কেশে কেশে।
“রাতের বেলা হয় না ঘুম
তেমন বড় গাঢ়,
ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় না মোটে
আজকে বছর বার।
শরীরটা মোর দেখুন কত
হয়ে গেছে সরু,
সাহস টাহস নাইক তেমন
হ’য়ে যাচ্ছি ভীরু।

বারোমেসে অরুচ আমার
রুচে নাক অন্ন,
বাতাবি আর কামরাঙ্গা
কাঁচা তেঁতুল ভিন্ন।
মাংস খেতে ইচ্ছা যায়,
সহ্য হয় না তাই,
এক দিন খেলে দশ দিন আমি
করি হাঁই ফাঁই।”
কথা শুনে ডাক্তারের
মেজাজ হ'ল কড়া,
বল্লেন খুলে—“যাবে তুমি
নিজের দোষেই মারা।
রাত্তির জেগে ছুটে ছুটে
পাহারা দিবে তুমি,
কুকুরের জাতের ধারা
এইত জানি আমি।
তা না করে তুমি কি না
এঁটে কোট প্যাণ্ট,
বসে আছ ভিতর শূন্য
যেন পোর্টম্যাণ্ট!
এ ব্যারামের ওষুধ বাপু,
নাইক আমার কাছে,
এখান থেকে পালাও তুমি—
অনেক কায আছে।”
এমন সময় এলেন সেথা
বিড়াল মহাশয়,
সঙ্গে নিয়ে ছেলে মেয়ে
গুটি পাঁচ ছয়।

ঠাণ্ডার ভয়ে সবাই আছেন
জড়সড় হ'য়ে,
গ্রীষ্মকালেও এত ভয়,
ছেলে পিলে ল'য়ে।
বিড়াল বলে—“ডাক্তার বাবু
ভারি বিপদ হলো,
অসুখ বিসুখ লেগেই আছে,
ছেলে পিলে মলো।

সকাল বেলা চা খায় তবু
ইাঁচে ফ্যাচ্ ফোঁচ্ ;
বিকাল বেলা কুইনাইন খায়
ওরা রোজ রোজ,
তবু ওদের গায়েতে জ্বর
ঘুস্ ঘুস্ করে,
যা খায় তা হয় না হজম
অম্বল হ'য়ে পড়ে।
ছোট ছোট ছেলে মেয়ে
চোখে দেখেনা কেউ,
চশমা চোকে নইলে খালি
করে "মেউ মেউ।"
ইঁদুর মূষিক মুখের কাছে
নেচে চলে যায়,
ছুটতে মোটে পারে না কেও
তাই না ধরতে পায়।
সাবধানে রাখি সবে
যত্ন করি কত,
হাড় কাঁটা দেই না খে'তে
ছোট লোকের মত।
বছরেতে দুবার ওরা
পুরী বৈদ্যনাথে
হাওয়া খেয়ে আসে, তবু
ছাড়ে ন'াক বাতে।"
ডাক্তার তখন চটে' বলে
"ওই দোষেতেই সারা,
কভু কারো হয় না ভাল
ছেড়ে জেতের ধারা।
ছুটাছুটি করতে দাওগে
মেখে ধুলা মাটি,
হাওয়া লে'গে ওদের গা বেশ
হবে পরিপাটি।
ধুলা মাটির সঙ্গে আছে
অনেক ঔষধ খাঁটি,
তাইতে আমরা অনেক সময়
খালি পায়েই হাঁটি।
যতই তুমি অসুখ বিসুখ
ভাবছ তোমার মনে,
ততই অসুখ বাঁধবে বাসা
তোমার ঘরের কোণে।"

শ্রীললিতকৃষ্ণ ঘোষ।

কাচ।

কাচ মানুষের অনেক কাজেই লাগে। আজ কাচের অদ্ভুদ কয়েকটী ব্যবহারের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি।

(১) আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কলরাডো (Colorado) নামে একটী স্থান আছে। সেখানে একটী পর্ব্বতের চূড়া হইতে অপর একটি পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত একটী সেতু আছে। ইহার নিম্ন দিয়া একটী নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই সেতুটী অর্দ্ধ মাইল উচ্চ হইবে। এই আশ্চর্য্য পোলের মেজে দেড় ইঞ্চি পুরু কাচে নির্ম্মিত এই কাচগুলি লোহার ফ্রেমে বসান আছে।

(২) ফ্রান্স দেশে লিয়ঁ (Lyons) সহরে কাচের মেজে অনেক দিন হইতেই ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ইহার চৌকা চৌকা ছাঁচ গুলি ৮ঞ্চি করিয়া লম্বা হয়; যখন এক একটী কে পরস্পরের সহিত জুড়িয়া মাটীতে বসান হয় তখন ইহা এতই কাপে কাপে বসে যে জোড় দিয়া জল জাইতে পারে না। ইহা দেখিতে বড়ই সুন্দর এবং পাথর অপেক্ষা মজবুত হয়। ইহার ভিতর দিয়া শীত ও তাপ প্রবেশ করিতে পারে না। এবং ইহা বীজাণু (Germs)কে মোটেই থাকিতে স্থান দেয় না।

(৩) জার্ম্মানির ফ্রাঙ্কফোর্টনগরের নিকট টেলিগ্রাফের থাম কাচে গঠিত হয়। এই থামগুলিকে মজবুত করিবার জন্য কাচের ভিতর দৃঢ় তারের সুতা থাকে। কাষ্ঠের থাম অপেক্ষা ইহাতে এক সুবিধা আছে যে ইহাতে উই পোকা ধরিতে পারে না এবং রৌদ্র বৃষ্টিতে ও কিছুই হয় না।

(৪) প্রতিভা সম্পন্ন জর্ম্মনরা জলে কলে "কাচের নল ও ব্যবহার করিতেছে। শীঘ্র যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় সে জন্য এক প্রকার সিমেণ্ট তাহা লেপিয়া দেওয়া হয়। এই নল জর্ম্মানীর অনেক স্থানেই ব্যবহৃত হয়। এই নল যে স্থানদিয়া লইয়া যাওয়া হয় সেখানকার মাটি কোন প্রকারে একটুও ভেজে না। (Acid) এসিড ও ইহার কিছু করিতে পারে না এবং কোন রকম গ্যাস ও ইহার ভিতর যাইতে পারে না।

৫। পোষাকের জন্য কাচের কাপড় ইউরোপের বাজারে অনেক দিন হইতেই বিক্রয় হইতেছে। রেশমের যেরূপ উজ্জ্বল প্রভা হয় এই কাপড়ের রঙ ও সেইরূপ উজ্জ্বল হয়। কাপড় ছাড়া কাচের অন্যান্য জিনিস ও তৈয়ার হইতেছে, যথা কাচের পর্দ্দা, কার্পেট, মেজ ঢাকা এবং তোয়ালে প্রভৃতি।

৬। তোমাদের মধ্যে বোধ করি কেহ কেহ কলিকাতার মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতাল দেখিয়াছ। যেখানে অস্ত্র টস্ত্র করা হয় সেখানে "কাচের মেজ আছে তাহার উপর রোগীকে শোয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া অস্ত্র করান হয়।

শ্রীমতী নির্ম্মলপ্রভা দেবী।

জয়মন্ত্র।

দিন ফুরুলে, সন্ধ্যা হ'লে,
যোড় করি দুই হাত,
সানুনয়ে তাঁর চরণে,
কোরো প্রণিপাত।
সারা দিনের কথা গুলি,
এক এক করি,
অকপটে তাঁহার কাছে,
দিয়ো সব ধরি,
ছোট, বড়, ভাল, মন্দ,
আশা, আকিঞ্চন,
সরল প্রাণে, সে চরণে
কোরো সমর্পণ।
দূরে যাবে চিন্তা ডর
দূরে যাবে ভয়।
অনায়াসে তাঁহার কৃপায়
হবে লাভ জয়॥

শ্রীঅতুচন্দ্র সিংহ।

ধাঁধা উত্তর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল,

১। ১, ৩, ৯, ২৭,
২। জননী,

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ দুইটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীকুমার বীরেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীকালিদাস মিত্র, শ্রীবিনয় ভূষণ দত্ত, শ্রীজ্যোতিভূষণ সেন, শ্রীমতী অনুশীলা দাস, শ্রীমতী পাঁচুরাণী দাসী, শ্রীমতী মলিনাময়ী দাসী, শ্রীইন্দ্র ভূষণ বীদ, শ্রীসারদা প্রসাদ রায়, শ্রীমতী বীনাপাণি পালিত, শ্রীমনিন্দ্র কুমার মিত্র, শ্রীগোপীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীসুধীর কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীরাসরঞ্জন বসু, শ্রীদেবীদাস চট্টোপাধ্যায় কুমারী শেফালিকা রায়।

নিম্নলিখিত গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ একটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন,

শ্রীসুকুমার ঘোষ, শ্রীসরোজকুমার বসু, শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, শ্রীবিপিনচন্দ্র দাস, শ্রীবিপুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতি সরযুবালা দেবী, শ্রীব্রহ্মবিহারী গিরি, শ্রীপ্রকৃতিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহিমাংকুমার বসু, শ্রীমতী প্রতিভাকুমারি ও বিভাবতী দাস গুপ্তা, শ্রীমতী মুক্তকেশী সিংহ শ্রীঅনিল-কৃষ্ণ সরকার, শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়, শ্রীতারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী নবদুর্গা দেবী, শ্রীহেমন্তকুমার বসু, শ্রীকমলেশ্বরী চক্রবর্ত্তী, শ্রীললিত কুমার দে, শ্রীবিমলচন্দ্র দাস গুপ্ত।

নূতন ধাঁধা।

(শ্রীললিতকুমার দে প্রেরিত।)

১। গ্রামে আছি, আছি আমি সহরেতে ভাই।
কত দেশে গেছি কিন্তু কভু নড়ি নাই॥
জন্ম মম সকলেরই উপকার তরে।
কিন্তু হায়! সবে মোরে পদাঘাত করে॥
কি নাম আমার বল জান যদি তুমি।
তব মুখে নাম শুনি ধন্য হব আমি॥

(শ্রীজ্যোতিভূষণ সেন প্রেরিত।)

২। কোন গাছ বড় হইলেও ছোট?